কিশোর ক্লাসিক

লরা ইঙ্গলস ওয়াইল্ডারের

# অন দ্য ব্যাঙ্ক্স্ অভ প্লাম ক্রীক

# লিটল টাউন অন দ্য প্রেয়ারি

রূপান্তর: কাজী আনোয়ার হোসেন

দুটি বই একত্রে

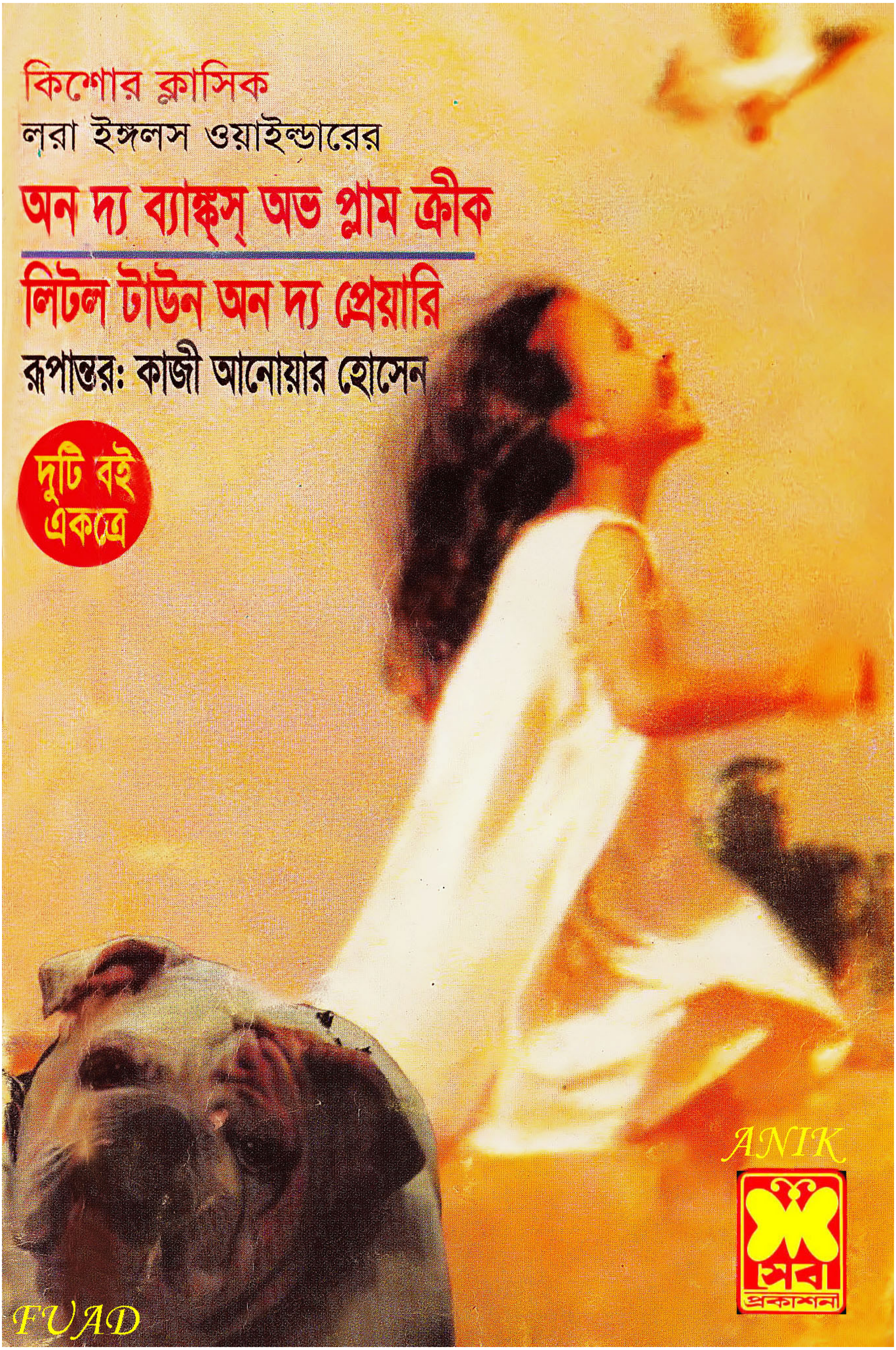

ANIK

সেবা প্রকাশনী

FUAD

# কিশোর ক্লাসিক

## অন দ্য ব্যাঙ্কস অভ প্লাম ক্রীক

**মূলঃ লরা ইঙ্গল্‌স্‌ ওয়াইল্ডার**

**রূপান্তরঃ কাজী আনোয়ার হোসেন**

প্লাম ক্রীকের তীরে বসতি গড়ল ওরা ইন্ডিয়ান
টেরিটোরি থেকে তাড়া খেয়ে ফিরে এসে।
কিন্তু এখানে আকাশ থেকে নামল শত্রু–কোটিকোটি
ঘাসফড়িং। সর্বস্বান্ত করে দিল বাবাকে।
জীবন থেমে থাকে না। আরও পশ্চিমে চলল ওরা।
শেষে কি পেল ওরা বাস করবার উপযোগী ঠিকানা?
লরা কি দেখা পেল আলমানযোর?

## লিট্‌ল্‌ টাউন অন দ্য প্রেয়ারি

ডাকোটার শীত কাকে বলে টের পাবে তোমরা
'দ্য লঙ উইন্টারে'। সাত মাস ধরে তুষার-ঝড়!
কল্পনা করা যায়? শহরের সব খাবার শেষ কয়লা নেই,
কাঠ নেই, কেরোসিন নেই, ট্রেন আসছে না,
রেল লাইন চাপা পড়েছে বরফে।
কী করে টিকে থাকবে ওরা ছয়জন?


**সেবা বই**

**প্রিয় বই**

**অবসরের সঙ্গী**



সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রূমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রূমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কিশোর ক্লাসিক

# অন দ্য ব্যাঙ্কস্ অভ প্লাম ক্রীক

# লিট্ল্ টাউন অন দ্য প্রেয়ারি

মূলঃ লরা ইঙ্গল্স্ ওয়াইল্ডার
রূপান্তরঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

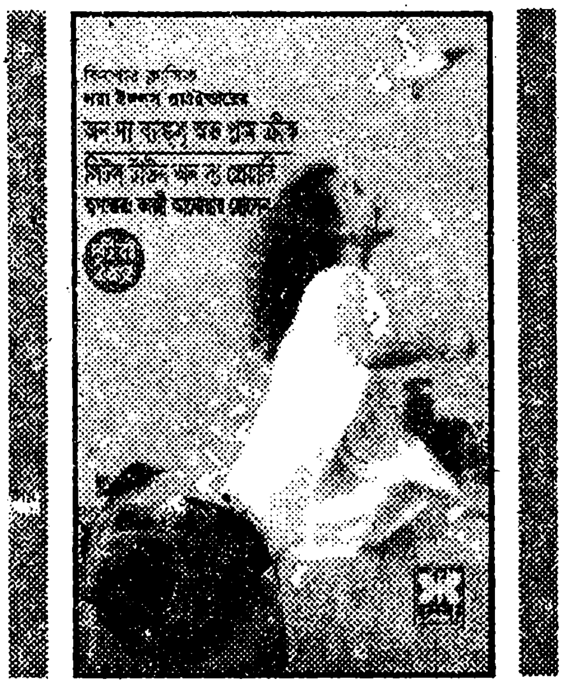

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-1528-2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯
দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০৪

প্রচ্ছদ আলীম আজিজ

**মুদ্রাকর**
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেগুনবাগান প্রেস**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল. ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি পি. ও বক্স. ৮৫০
E-mail. Sebaprok@citechco.net
Web Site. www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
**প্রজাপতি প্রকাশন**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

সেবা প্রকাশনী

আটত্রিশ টাকা

ON THE BANKS OF PLUM CREEK

LITTLE TOWN ON THE PRAIRIE
By: Laura Ingalls Wilder
Trans & Ed. By: Qazi Anwar Husain

| | |
|---|---|
| অন দ্য ব্যাঙ্কস্ অভ প্লাম ক্রীক: | ৫–৬৩ |
| বাই দ্য শোর্স্ অভ সিলভার লেক | ৬৪–৯৭ |
| দ্য লং উইন্টার | ৯৮–১৪০ |
| লিটল্ টাউন অন দ্য প্রেয়ারি | ১৪১–১৮৮ |
| দীজ হ্যাপি গোল্ডেন ইয়ার্স : | ১৮৯–২০৮ |

# অন দ্য ব্যাঙ্কস্ অভ প্লাম ক্রীক

## এক

চলছে তো চলছেই, পথ যেন ফুরোতেই চায় না। ইন্ডিয়ানদের এলাকায় তৈরি করা সেই লগ-হাউস ছেড়ে অনেকদিন হলো পথে নেমেছে ওরা। ক্যানসাস, মিসৌরি আর আইওয়া পাড়ি দিয়ে বহুদূর চলে এসেছে মিনেসোটার ভেতরে।

অবশেষে এক সময় থামল ওয়্যাগন্। বাবা বলল, 'সামনে আর তো কোন চাকার দাগ দেখা যায় না। নেলসনদের খামার থেকে আধমাইল এসেছি না? ওই তো ক্রীক দেখা যায়, মনে হচ্ছে এসে পড়েছি।'

লরা কোথাও ক্রীক দেখতে পেল না, তবে গাছের মাথা দেখে আন্দাজ করতে পারল, ওদিকটাতেই হবে খাঁড়িটা। আর সব দিকে শুধু অন্তহীন প্রেয়ারির ঘাস আর ঘাস।

'আস্তাবল মত দেখা যাচ্ছে, কিন্তু বাড়িটা কোথায়?' আপন মনে বলল বাবা।

হঠাৎ আঁৎকে উঠল লরা। সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন লোক! কেউ কোথাও ছিল না, হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হলো লোকটা বোঝা গেল না। ওয়্যাগনের নীচ থেকে চাপা গর্জন ছেড়ে লোকটাকে শাসাল জ্যাক।

'চুপ!' পাল্টা ধমক দিল বাবা ওকে, 'একদম চুপ!' লোকটার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনিই কি মিস্টার হ্যানসন?'

'ইয়াহ্,' সংক্ষেপে জবাব।

'শুনলাম, ঘর-বাড়ি বেচে দিয়ে আপনি পশ্চিমে যেতে চান?'

প্রথমে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওয়্যাগনটা দেখলেন মিস্টার হ্যানসন, পেট আর প্যাটিকে দেখলেন, তারপর আবার সেই একই শব্দ উচ্চারণ করলেন, 'ইয়াহ্।'

ওয়্যাগন থেকে নামল বাবা। লরা আর মেরিকে মা বলল, 'তোমরাও নেমে একটু হাঁটাহাঁটি করে নাওগে যাও।'

লরাকে নামতে দেখে উঠে দাঁড়াল জ্যাক, কিন্তু সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি পেল না বাবার কাছে। চেয়ে চেয়ে দেখল, একটা পায়ে চলা পথ ধরে চলে যাচ্ছে লরা।

একটু গিয়েই খাঁড়ির ধারে পৌঁছে গেল ও। রোদে ঝিলমিল করছে পানি, ব্যস্ত ভঙ্গিতে কুল-কুল শব্দ তুলে ছুটছে সামনের দিকে। ওপারে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অনেকগুলো উইলো গাছ। পথটা বাঁকা হয়ে নেমে গেছে নীচে। কয়েক পা নামতেই অদৃশ্য হয়ে গেল ওয়্যাগনটা। এখন শুধু ওপরে আকাশ আর নীচে আপন মনে কীসব বলছে খালের পানি।

আরও কয়েক পা নেমে লরা দেখল, নীচে কিছুটা চওড়া একটা সমতল জায়গায় গিয়ে থেমেছে পথ, ওখান থেকে সিঁড়ির মত কয়েকটা ধাপ নামলেই

খাঁড়ির পানি। আর এক পা এগিয়েই দরজাটা চোখে পড়ল ওর।

মাটির গায়ে বসানো দরজা। বন্ধ। মনে হচ্ছে, দরজার ওপাশে যাই থাকুক সেটা রয়েছে মাটির নীচে। ঠিক দরজার সামনেই শুয়ে ছিল মস্ত দুটো কুকুর, লরাকে দেখে ধীরে-সুস্থে উঠে দাঁড়াচ্ছে এখন।

এক দৌড়ে ওয়্যাগনে ফিরে এল লরা, ফিস-ফিস করে মেরিকে বলল, 'মাটির গায়ে একটা দরজা দেখলাম, তার সামনে মস্ত দুটো কু...' পিছনে ফিরে তাকাল ও। দেখল, আসছে ওরা।

ওয়্যাগনের নীচ থেকে জ্যাকের চাপা, গম্ভীর গর্জন ভেসে এল। নাক-মুখ কুঁচকে চোখা দাঁত দেখাচ্ছে ওদেরকে।

'কুকুরগুলো আপনার?' মিস্টার হ্যানসনকে জিজ্ঞেস করল বাবা।

পিছন ফিরে কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করলেন মিস্টার হ্যানসন, একটি শব্দও বুঝতে পারল না লরা। কিন্তু কুকুরগুলো ঠিকই বুঝল, খাঁড়ির ধার বেয়ে নেমে গেল ওরা চোখের আড়ালে।

কথা বলতে বলতে আস্তাবলের দিকে ধীর পায়ে এগোল বাবা আর মিস্টার হ্যানসন। আস্তাবলটা ছোট, দেয়ালে আর ছাদে ঘাস গজিয়েছে–দুলছে হাওয়ায়।

ওয়্যাগনের কাছাকাছিই থাকল লরা আর মেরি, যাতে প্রয়োজনে জ্যাকের সাহায্য পাওয়া যায়। বিশাল প্রেয়ারি প্রান্তর জুড়ে ঘাস আর ঘাস, বাতাসের চাপে দুলছে, নুয়ে পড়ছে। অসংখ্য হলুদ ফুল মাথা ঝাঁকাচ্ছে। ঘাসের ভিতর থেকে ফুড়ুত করে বেরিয়ে আসছে পাখির ঝাঁক, খানিকদূর উড়ে আবার হারিয়ে যাচ্ছে ঘাসের জঙ্গলে। অনেক, অনেক দূরে বাঁকা হয়ে মাটিতে মিশেছে আকাশটা।

মিস্টার হ্যানসনের সঙ্গে ফিরে এল বাবা, গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, 'ঠিক আছে, হ্যানসন, কাল শহরে গিয়ে কাগজপত্র ঠিকঠাক করে নেব আমরা – এই কথা থাকল তা হলে, কেমন? আজকের রাতটা বাইরেই ক্যাম্প করে থাকব আমরা।'

'ইয়াহ্, ইয়াহ্!' জবাব দিলেন মিস্টার হ্যানসন।

লরা আর মেরি উঠে পড়তেই ওয়্যাগন নিয়ে ঘাসের রাজ্যে ঢুকে পড়ল বাবা। মাকে বলল, পেট আর প্যাটির বিনিময়ে জমি আর বাড়িটা; আর বাচ্চা ঘোড়া বানি আর ওয়্যাগন-কাভারের বিনিময়ে পাওয়া যাচ্ছে খেতের ফসল আর বলদ দুটো।

পেট আর প্যাটিকে খুলে নিয়ে ক্রীক থেকে পানি খাইয়ে আনল বাবা, তারপর বাঁধল খুঁটির সঙ্গে। এখন মাকে সাহায্য করছে ক্যাম্পিঙের কাজে। ওদিকে কিচ্ছু ভাল লাগছে না লরার, একেবারে থম্ মেরে গেছে। খেলা তো দূরে থাক, খাওয়ার রুচি পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে যেন ওর, কিচ্ছু খেতে পারল না সাপারে বসে।

'খোলা জায়গায় আজই আমাদের শেষ রাত,' বলল বাবা খুশি-খুশি কণ্ঠে। 'কাল থেকে আবার শুরু হবে ঘর-সংসার, ওই ক্রীকের ধারের বাড়িটায়।'

'বাড়ি কোথায়, ওটা তো গর্ত একটা, চার্লস্!' বলল মা। 'আজ পর্যন্ত, আর যাই হোক, মাটির গর্তে বাস করতে হয়নি আমাদের।'

'আমার ধারণা, ঘর-দুয়ার খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাবে তুমি,' আশ্বাস দিল বাবা। 'নরওয়েজিয়ানরা ছিমছাম লোক হয়। তা ছাড়া, শীতের আর দেরি নেই,

শীতকালে দেখবে এসব বাড়িতে কী আরাম!'

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল মা। 'তুষার শুরু হওয়ার আগেই একটা ঠাঁই খুব দরকার।'

'একটা ফসল তুলে নিই, ক্যারোলিন,' বলল বাবা, 'তারপর সুন্দর একটা বাড়ি বানিয়ে দেব তোমাকে। ঘোড়াও কিনে নেব একজোড়া–চাই কী একটা বাগিও। গমের দেশ এটা, ক্যারোলিন, গাছ নেই, পাথর নেই, উর্বর সমতল জমি। তুমি দেখো, বড়লোক হয়ে যাব আমরা! ভাবছি, হ্যানসন লোকটা এত অল্প জমিতে এমন হাল্কা ভাবে গম বুনল কেন। খরা পড়েছিল বোধহয়, আর নয়তো চাষাবাদ বোঝে না লোকটা।'

ক্যাম্প-ফায়ার থেকে বেশ কিছুটা দূরে ঘাস খাচ্ছে পেট, প্যাটি আর বানি। কচর-মচর আওয়াজ আসছে চিবানোর। লেজ নাড়ছে শান্ত ভঙ্গিতে। জানে না, বিক্রি হয়ে গেছে ওরা।

লরার বয়স এখন অনেক–সাত বছর–তাই কান্না ওকে সাজে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারল না, 'আচ্ছা, বাবা, ওদের বিক্রি না করে পারা গেল না? করতেই হলো, বাবা?'

'ওরে আমার আধ বোতল মিষ্টি সাইডার, এইজন্যেই এত মন খারাপ?' ওকে কাছে টেনে নিল বাবা। 'পেট আর প্যাটি ইন্ডিয়ান ঘোড়া। ওরা ছুটে বেড়াতে পছন্দ করে। লাঙল টানতে হলে ওদের খুব কষ্ট হতো, মনটাই হয়তো ভেঙে যেত। ওরা এখন খুশি মনে দৌড়াবে পশ্চিমের পথে। আর এদিকে বলদ দুটো খুশি মনে টানবে জোয়াল। ওদের সাহায্যে অনেক জমিতে চাষ দিতে পারব আমি, তারপর আগামী বসন্তে তুলব ফসল। একটা ফসল তুলতে পারলেই, দেখো, লরা, বড়লোক হয়ে যাব আমরা। তখন আবার আমরা ঘোড়া কিনব, নতুন নতুন জামা-কাপড় কিনব, যা যা চাই সব কিনব।'

কিছুই বলল না লরা। ওর মনে হলো, পেট, প্যাটি আর বানিকে বিক্রি না করে যদি পারা যেত, সেটাই সবচেয়ে ভাল হতো।

# দুই

পরদিন সকালে বাড়ি খালি করে মালপত্র ওয়্যাগনে তুলতে সাহায্য করল বাবা মিস্টার হ্যানসনকে। তিনিও বাবাকে সাহায্য করতে চাইলেন, কিন্তু মা বারণ করল। বলল, 'না, চার্লস, শহর থেকে সব কাজ সেরে এসো, তারপর আমরা ঘরে উঠব।'

পেট আর প্যাটিকে মিস্টার হ্যানসনের ওয়্যাগনে জুতে দিল বাবা, বানিকে বেঁধে দিল পিছনে, তারপর চলে গেল তাঁর সঙ্গে শহরের দিকে।

চেয়ে চেয়ে দেখল লরা চুপচাপ। মনে হচ্ছে, গলার কাছে কী যেন আটকে

গেছে ওর, চোখদুটো করকর করছে, কেমন যেন হাঁসফাঁস করছে বুকের ভেতরটা। পেট আর প্যাটি কিন্তু কিছুই বোঝেনি, খুশি মনে ঘাড় বাঁকিয়ে, বাতাসে কেশর আর লেজ দুলিয়ে টগবগিয়ে চলে গেল—ওরা জানে না, আর এখানে ফিরবে না কোনদিন।

ক্যারিকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল মা। 'চলো, গর্তটা দেখে আসি গিয়ে।'

জ্যাককে বাঁধনমুক্ত করল লরা প্রথমে। খুশি হয়ে লাফিয়ে উঠে লরার গাল চেটে দেয়ার চেষ্টা করল ও, তারপর ছুটল সবার আগে আগে। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে লরার দিকে চাইল ঘাড় ফিরিয়ে, ভেতরে ঢুকবে কি না ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

দরজার আশেপাশে অসংখ্য ফুল ফুটে আছে; লাল, নীল, বেগুনি, গোলাপী, সাদা – জমজমাট আসর বসেছে যেন। হাওয়ায় দুলছে ওরা, এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে কানাকানি করছে নিজেদের মধ্যে।

সবার আগে ঘরে ঢুকল লরা। একটাই ঘর, দেয়ালগুলো ধবধবে সাদা চুনকাম করা। মাটির মেঝে শক্ত আর মসৃণ। দরজার পাশে জানালা একটা আছে বটে, কিন্তু দেয়ালটা এতই পুরু যে সামান্যই আলো আসে ভেতরে।

খালের পারে প্রথমে গর্ত খুঁড়ে ঘর তৈরি করেছেন মিস্টার হ্যানসন, তারপর প্রেয়ারি থেকে ঘাসের শিকড়সহ মাটির চাপড়া কেটে এনে পুরু করে তৈরি করেছেন সামনের দেয়াল। কোথাও একটু ফাঁক-ফোকর নেই যে শীত ঢুকবে।

দেখে-টেখে খুশি হলো মা। 'ছোট হলেও সুন্দর, ছিমছাম। ভাল।' ছাদের দিকে আঙুল তুলল, 'ওই দেখো।'

উইলো গাছের শাখা বুনে ঘরের সিলিং তৈরি করা হয়েছে, তার ওপর পুরু করে খড় বিছিয়ে তৈরি হয়েছে ছাদ, কোনও কোনও জায়গা দিয়ে খড় দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

আবার ঢাল বেয়ে উঠে বাড়ির ছাদে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। ঘাস গজিয়ে রয়েছে গোটা ছাদ জুড়ে। বোঝার উপায় নেই নীচে একটা ঘর আছে।

'চলো, ঘরটা পরিষ্কার করে ফেলি,' বলল মা। 'জিনিসপত্রও যতটা পারা যায় এনে রাখি তোমাদের বাবা ফেরার আগেই।'

মেরি আর লরা দুজন দুটো বালতি নিয়ে এল ওয়্যাগন থেকে। ঘরের দেয়াল আর মেঝে ঝাড়ু দিতে লেগে গেল মা। মেরির কোলে ক্যারি, তাই ছোট বালতিটা হাতে নিয়ে লরা ছুটল ঝর্না থেকে পানি আনতে। খালের ওপর একটা তক্তা বিছানো, ওপারে উইলোর জঙ্গল। সেই জঙ্গল ধরে অল্প দূর গেলেই ছোট্ট একটা ঝর্না, কুলকুল করে পরিষ্কার পানি এসে জমছে ছোট একটা ডোবায়, তারপর সেখান থেকে আঁকাবাঁকা নালা বেয়ে নেমে যাচ্ছে খালে।

বালতি ভরে নিয়ে তক্তার ব্রিজ পেরিয়ে ধাপ বেয়ে উঠে এল লরা ওপরে, বড় বালতিতে পানিটুকু ঢেলে দিয়েই ছুটল আবার আরও আনতে।

ঘরদোর ধোয়া-মোছা হয়ে গেলে মার সঙ্গে ছোটাছুটি করে ওয়্যাগন থেকে মালপত্রগুলো আনার কাজে লেগে গেল লরা। প্রায় সবকিছুই যখন চলে এসেছে, তখন একটা টিনের চুলো আর দুই টুকরো স্টোভ-পাইপ নিয়ে ফিরল বাবা।

'বাপ্‌রে, ওজন আছে!' বলে চুলোটা নামিয়ে রাখল বাবা মেঝেতে। 'ভাগ্যিস শহরটা মাত্র তিন মাইল দূরে, তা নইলে গেছিলাম! ভাবা যায়, ক্যারোলিন, মাত্র তিন মাইল দূরেই শহর? হাঁটা ধরলে বড়জোর একঘণ্টা। পশ্চিমের রাস্তা ধরেছে হ্যানসন, এইসব এখন আমাদের। কেমন? তোমার পছন্দ হয়েছে তো, ক্যারোলিন?'

'হ্যাঁ, পছন্দ হয়েছে,' বলল মা। 'তবে বিছানা কোথায় পাতব বুঝছি না। মেঝেতে তোশক পাততে ভাল লাগে না আমার।'

'সে কী, এতদিন কোথায় পেতেছ? মাঠে-ময়দানে ঘুমাইনি আমরা এতদিন?'

'সে তো বাড়িঘর ছিল না বলে,' জবাব দিল মা। 'ঘরের মধ্যে মাটিতে শুতে যাব কোন্ দুঃখে?'

'ও, এই কথা? ঠিক হ্যায়, পনেরো মিনিটে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি,' বলল বাবা। 'আজকের মত উইলোর ডাল কেটে আনি গোটা কয়েক, ওগুলো বিছিয়ে তার ওপর বিছানা করতে পারবে। কাল দুটো খাট তৈরি করে দেব তোমাকে। ঠিক আছে?'

কুঠারটা তুলে নিয়ে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেল বাবা। লরা ছুটল তার পেছনে। 'বাবা, আমি আসি তোমার সঙ্গে?'

'কে? আমার আধ বোতল মিষ্টি সাইডার নাকি? নিশ্চয়ই আসবে। তুমি সাহায্য করলে কাজ অনেক এগিয়ে যায় আমার।'

পাতাসহ বেশ কিছু চিকন ডাল কাটল বাবা, তারপর দুজন মিলে বয়ে আনল ওগুলো। তার ওপর সুন্দর করে বিছানা পাতল মা। বাবাকে আস্তাবলের দিকে এগোতে দেখে আবার পিছু নিল লরা।

গোয়ালঘরে গিয়ে বলদগুলোর সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলল বাবা, ওদের পানি খাইয়ে আনল খাল থেকে। আবার ওদের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফিরল বাবা লরার দিকে, 'কিছু বলবে, লরা?'

'আচ্ছা,' নরম গলায় আস্তে করে জিজ্ঞেস করল লরা, 'পেট আর প্যাটির কি সত্যিই পশ্চিমে যেতে ভাল লাগছে?'

'হ্যাঁ, লরা।'

'বাবা!' কাঁপছে লরার গলা, 'গরু আমার একটুও ভাল লাগে না।'

ওর একটা হাত নিজ হাতে তুলে নিয়ে সান্ত্বনা দিল বাবা। বলল, 'যেটা করতেই হয়, সেটা খুশি মনে করাই ভাল, লরা। মন খারাপ করতে নেই। একদিন আবার ঘোড়া হবে আমাদের।'

'কবে, বাবা?'

'ভালমত চাষ করে প্রথম ফসল যেদিন তুলব, সেদিন।'

শেষ-বিকেলে সাপার সেরে দরজার সামনে উঠান মত জায়গাটায় বসল ওরা সবাই। বাবা আর মা বসেছে দুটো বাক্সের ওপর, ঘুম-ঘুম চোখ করে গুটিসুটি হয়ে মা'র গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে ক্যারি, লরা আর মেরি বসেছে নীচে নামার সিঁড়িতে পা রেখে। কোত্থেকে জ্যাক এসে তিন পাক খেয়ে শুয়ে পড়ল পাশে, মাথাটা তুলে দিল লরার কোলে।

চুপচাপ বসে রয়েছে ওরা। প্লাম ক্রীকের ওপারে হাওয়ায় দুলছে উইলোর ডাল, দূর পশ্চিমে প্রেয়ারির শেষ প্রান্ত ছুঁই-ছুঁই করছে সূর্যটা। অদ্ভুত শান্ত, সমাহিত পরিবেশ।

লম্বা করে দম ছাড়ল মা। 'মনে হচ্ছে শান্তির দেশে চলে এসেছি! নেকড়ে নেই, ইন্ডিয়ানদের রণ-হুঙ্কার নেই। এত নিরাপদ বোধ করিনি আজ কতদিন!'

'ঠিক বলেছ, ক্যারোলিন। আমরা এখন নিরাপদ – বিপদের আর কোনও ভয় নেই।'

আকাশের মেঘে নানান রকম রঙ ধরল, শির-শির করছে উইলোর পাতাগুলো আর আপন মনে বকবক করছে খালের পানি। ধীরে ঘনিয়ে আসছে আঁধার। একটা-দুটো করে জ্বলে উঠছে তারাগুলো।

'এবার শুয়ে পড়োগে, যাও,' বলল মা। হেসে উঠল খিল-খিল করে, 'আজই জীবনে প্রথম আমরা গর্তে বাস করব।' বাবাও হাসল মা'র কথায়।

ঘুম আসছে না, শুয়ে শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত পানির কুল-কুল আর উইলোর ফিসফাস শুনল লরা চোখ বুজে, তারপর যখন চোখ মেলল, তখন সকাল।

## তিন

প্রত্যেকদিন সকালে উঠে বিছানা ঠিকঠাক করে, বাসন মেজে, ঘর ঝাড়ু দিয়ে চরতে বেরোয় ওরা দুই বোন। খেলা করো, বেড়িয়ে বেড়াও – যা খুশি; শুধু উজানের ওই গভীর পানির পুকুরটায় যেতে পারবে না। বাবার বারণ।

কাজেই নীল প্রজাপতি আর হলুদ ফড়িঙের পিছনে দৌড়ায় ওরা। পানিতে নেমে ছোট মাছের ঝাঁককে ভয় দেখিয়ে ছত্রভঙ্গ করে, পানির ওপর দৌড়ে বেড়ানো জল-পোকা ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করে। বিকেলে যখন ফিরে আসে তখন একেকজন কাদামাখা ভূত।

একদিন সবাইকে নিয়ে গেল বাবা উইলো উপত্যকার ওপাশের ওই গভীর পানির পুকুরে। ওখানে পরিষ্কার পানিতে কয়েক ঘণ্টা ঝাঁপাঝাঁপি করে খুব মজা করল ওরা। নিষেধ সত্ত্বেও গভীর পানিতে গেলেই পানির নীচ দিয়ে ডুবসাঁতার কেটে এসে ওদের পা ধরে টান দেয় বাবা, ভারসাম্য হারিয়ে হাবুডুবু খায় ওরা, বোঝে, ডুবে গেলে কী অবস্থা হবে। খেলা শেষ হলো বাবা, লরা আর মেরির মধ্যে প্রচণ্ড পানি ছিটাছিটি যুদ্ধের পর।

স্নানশেষে বাবা বলল, 'আবারও সাবধান করছি তোমাদের, পানিতে নামা দূরের কথা, আমি সঙ্গে না থাকলে তোমরা কেউ কোনদিন আসবে না এই পুকুরের ধারে, কিছুতেই না। বুঝতে পেরেছ?'

লরা জবাব দিল, 'হ্যাঁ, বাবা।'

কিন্তু ঠিক পরের দিনই একা খেলতে খেলতে ওর মনের ভেতর নানান কথা আসতে শুরু করল। মেরি মায়ের সঙ্গে আছে, বাবা বাড়িতে নেই–এমনি সময়ে

ওর মনের পর্দায় স্পষ্ট ভেসে উঠল গভীর পানির পুকুরটার ছবি। ওটার ধারে যেতে বারণ করেছে বাবা, কিন্তু ওর এপাশে যে উঁচু জায়গাটা আছে সেখানে তো যেতে বারণ করেনি। যা গরম পড়েছে, ওখানে খানিকক্ষণ বসলে আরাম হতো।

যেই ভাবা সেই কাজ। কর্কশ ঘাসের মধ্য দিয়ে ছুটল লরা, আঁচড়া-আঁচড়ি করে উঠে পড়ল উঁচু জমিতে। উঠে দাঁড়াতেই দেখতে পেল উইলোর ছায়ায় টলটলে পুকুরটা ওকে ডাকছে ইশারায়। কিন্তু না, বাবার আদেশ অমান্য করে ওখানে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু পিপাসা লেগেছে খুব। ভাবল, গভীর পানিতে না গেলেই তো হলো, কিনারে দাঁড়িয়ে এক আঁজলা পানি খেলে কী হয়! না হয় পারে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা পানির দিকে চেয়ে থাকবে – তাতেই পিপাসা দূর হয়ে যাবে।

যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। ছুটল লরা।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলো। আরে, কী ওটা! রাস্তার ঠিক মাঝখানে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা জন্তু! ও থামতেই ফোঁস করে উঠল। এক লাফে পিছনে সরে গেল লরা, এ রকম জানোয়ার আগে কোনদিন দেখেনি ও। লম্বায় জ্যাকের সমান হবে, কিন্তু পাগুলো ছোট। ধূসর রঙের লম্বা পশমে ছাওয়া। চ্যাপ্টা মাথা তুলে কটমট করে চেয়ে আছে লরার দিকে।

সাবধানে নিচু হয়ে উইলোর একটা মরা ডাল তুলে নিল লরা। এবার কিছুটা সাহস ফিরে এল। জন্তুটা সামনে বাড়ছে না দেখে সাহস আরও একটু বাড়ল। ভাবল, একটা খোঁচা দিয়ে দেখবে নাকি? কাঠিটা আস্তে করে সামনে বাড়িয়ে মৃদু একটা খোঁচা দিল সে ওর পেটে।

ফ্যাচ্ করে এক ভয়াবহ আওয়াজ ছাড়ল জন্তুটা। দু-চোখ থেকে যেন আগুন বেরোচ্ছে। দাঁত খিঁচিয়ে লাফিয়ে উঠে লরার নাকটা কামড়ে ধরার চেষ্টা করল।

ঘুরেই প্রাণপণে ছুটল লরা, বাড়ি না পৌঁছে আর থামল না।

'ইশ্, লরা! রোদের মধ্যে এ রকম ছোটাছুটি করতে হয় না,' বলল মা। 'অসুখে পড়বে।'

লরা দেখল, মার কাছে পড়তে বসেছে মেরি লক্ষ্মী মেয়ের মত। মেরি সব সময় ভাল। লরা জানে, ও নিজে ভাল না। যাও বা একটু ছিল, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে সেটুকুও নষ্ট করে ফেলেছে। যদিও কেউ দেখেনি ওকে পুকুরের দিকে যেতে, কিন্তু ও নিজে তো জানে। আর জানে ওই অদ্ভুত জন্তুটা। ও না বললে আর কেউ জানতে পারবে না। কিন্তু যতই সময় যেতে থাকল, ততই মনটা ছোট হয়ে যেতে থাকল লরার – কাজটা মোটেও ভাল করেনি সে। বিশ্বাস ভঙ্গ করা ভাল না।

মেরির পাশে শুয়ে এপাশ ওপাশ ফিরছে লরা, ঘুমাতে পারছে না। বাবা-মা দুজনেই দরজার বাইরে উঠানে বসে আছে। বেহালায় সুর বাঁধছে বাবা।

'ঘুমিয়ে পড়ো, লরা,' বলল মা ওখান থেকে।

সুন্দর একটা সুর তুলেছে বাবা বেহালায়, ওঠা-নামা করছে ছড়টা। রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে মিষ্টি সুর। পরম শান্তি সবখানে, কিন্তু পুড়ছে লরার মন। ও বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে বাবার, যা করেছে সেটা মিথ্যা বলার চেয়ে কম না। কাজটা না করলেই ভাল হত, কিন্তু করে তো ফেলেছে, বাবা জানলে শাস্তি দেবে। এখনও

জানে না বলে বাবা ভাবছে ও না জানি কত ভাল মেয়ে। আর সহ্য করতে পারল না লরা, খাট থেকে নেমে চোরের মত পা টিপে গিয়ে দাঁড়াল বাবার পাশে।

বাজনা শেষ হলে মিষ্টি করে হাসল বাবা, 'কী ব্যাপার, আধ-বোতল? সাদা কাপড়ে ভূতের মত লাগছে তোমাকে দেখতে।'

'বাবা,' কাঁপা গলায় ছোট্ট করে ডাকল লরা, 'আমি – আমি ওই গভীর পুকুরটার দিকে রওনা হয়েছিলাম।'

'বল কী!' অবাক চোখে চাইল বাবা, তারপর জানতে চাইল, 'তো গেলে না কেন? কে ঠেকাল?'

'ঠিক বলতে পারছি না। পশমগুলো ছাইরঙা, মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে ছিল। ধমক দিল আমাকে।'

'কত বড় ছিল?' লরা আকার-আকৃতির বর্ণনা দিলে বাবা বলল, 'নিশ্চয়ই ওটা একটা ব্যাজার (কিছুটা বেজি, আর কিছুটা ভালুকের মত দেখতে জন্তু) হবে।'

এরপর অনেকক্ষণ একটি টুঁ-শব্দ করল না বাবা, তারপর মস্ত এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'তোমাকে কী বলব বুঝতে পারছি না, লরা। তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম আমি। যাকে বিশ্বাস করা যায় না, তাকে মানুষ কী করে জানো?'

'কী-কী করে?'

'তাকে নজরবন্দী করে রাখে,' বলল বাবা। 'কাজেই আমার মনে হয় তোমাকেও নজরবন্দী রাখা দরকার। কাজটা তোমার মাকে করতে হবে, কারণ, আমাকে কাল কাজ করতে হবে নেলসনদের ওখানে। কাল সারাটা দিন তুমি তোমার মা'র চোখের আড়াল হতে পারবে না, এমন জায়গায় থাকবে যেন চোখ তুললেই দেখা যায় তোমাকে। সারাদিন যদি ভাল হয়ে থাকতে পার তা হলে আমরা তোমাকে আবার একটা সুযোগ দেব, যাতে আবার তুমি আমাদের বিশ্বস্ত ছোট্ট আধ-বোতল মিষ্টি সাইডার হতে পার।' মা'র দিকে ফিরল বাবা:

'তুমি কী বলো, ক্যারোলিন?'

'ঠিক আছে, চার্লস,' বলল মা, 'আমি নজর রাখব ওর ওপর। তবে আমি জানি, ও ঠিকই ভাল হয়ে চলবে কাল। ব্যস, এবার, লরা, ঘুমাতে যাও।'

ভাল হয়ে চলা বড় কষ্ট – পরদিন হাড়ে হাড়ে টের পেল লরা। জামা-কাপড়ে সেলাই আর তালি-পট্টি দিল মা সারাদিন, ঝর্না থেকে পানি আনতে গেল আজ মেরি, ক্যারিকে নিয়ে মাঠে হাঁটতে গেল মেরি, লরাকে বসে থাকতে হলো মা'র সামনে।

তাই বলে একেবারে বসে থাকল না ও, যতভাবে সম্ভব সাহায্য করল মাকে – থালা বাসন ধু'লো, বিছানা ঠিকঠাক করল, ঘর ঝাড়ু দিল, টেবিলে খাবার দিল। তারপর ছেঁড়া কাপড় সেলাই করতে বসল।

জ্যাক ঠেলা-ধাক্কা দিল ওকে, সামনের দু'পায়ে মুখ রেখে লেজ নাড়ল, একলাফে দরজার বাইরে গিয়ে পিছন ফিরে তাকাল, হাসি-হাসি ভঙ্গি করে ওকে বাইরে বেরনোর জন্য অনুরোধ করল। আজ হঠাৎ কী হলো লরার, কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না জ্যাকের।

লরার মনে হলো দিনটা বুঝি কোনদিন আর ফুরোবে না। সন্ধ্যার দিকে মা

সেলাই-ফোঁড়াই বন্ধ করে বলল, 'খুব ভাল হয়ে ছিলে সারাটা দিন, লরা। তোমার বাবাকে বলব সেকথা। আর কাল সকালে তুমি আর আমি যাব ওই ব্যাজারটাকে খুঁজতে। খুব সম্ভব ওটাই কাল ডুবে মরা থেকে বাঁচিয়েছে তোমাকে। ও বাধা না দিলে ঠিকই যেতে তুমি ওই পুকুরে, খেলতে খেলতে চলে যেতে গভীর পানিতে। দুষ্টামি মাথায় চাপলে ভয়ানক কিছু না ঘটা পর্যন্ত মানুষ থামতে পারে না।'

'হ্যাঁ, মা,' স্বীকার করল লরা। বুঝতে পেরেছে এখন।

পরদিন সকালে সেই ব্যাজারটাকে খুঁজতে গেল ও মা'র সঙ্গে। ওর গর্তটা পাওয়া গেল খুঁজে-পেতে। লরা অনেক ডাকাডাকি করল, একটা কাঠি দিয়ে খোঁচাল, কিন্তু বের হলো না ওটা কিছুতেই।

## চার

নেলসনদের ওখানে কাজ করে একটা গরু পেল বাবা। মা ওটার নাম রাখল স্পট। সবাইকে অবাক করে দিল লরা ওটার দুধ দুইয়ে।

প্লাম ক্রীকের দুই ধারে অসংখ্য কুলগাছ। এজন্যই এর নাম হয়েছে প্লাম ক্রীক। কুলবড়ই পেকেছে এখন, সুগন্ধে মৌ-মৌ করছে চারদিক।

বাবা মাঠে লাঙল দেয়ায় ব্যস্ত। সকালে নাস্তার পর বাসনগুলো ধুয়ে-মুছে রেখে টিনের বালতি নিয়ে কুল পেড়ে আনতে যায় লরা আর মেরি।

রোজই দেখা যায়, চষা খেতের পরিমাণ বাড়ছে। গম বোনার জন্য অনেক জমিতে লাঙল দিচ্ছে বাবা। বিরাট এলাকা জুড়ে গম বুনবে এবার। এই ফসল উঠলে আর কোনও অভাব থাকবে না ওদের। বাড়ি হবে, ঘোড়া হবে, গাড়ি হবে, ক্যান্ডি খেতে পারবে ওরা প্রত্যেকদিন।

বালতির পর বালতি বড়ই পেড়ে আনে ওরা, মা সেগুলো ঘরের ছাদে ঘাসের ওপর কাপড় বিছিয়ে রোদে শুকাতে দেয়। আগামী শীতে বড়ইয়ের আচার-মোরব্বা-টক যত খুশি খাবে ওরা।

শীত এসে গেল প্রায়, কিন্তু তুষারের দেখা নেই। সেটা লরার এক চিন্তা। তবে তার চেয়েও বড় চিন্তা এ-বাড়িতে ফায়ারপ্লেস নেই। কথাটা খেতে বসে এক ফাঁকে বলেই ফেলল ও।

'ফায়ারপ্লেস নেই মানে?' ভুরু কুঁচকে চাইল মা, 'কী বলছ?'

'সান্তা ক্লজের কথা। এ বাড়িতে ওর আসার উপায় নেই।'

'খাও তো এখন,' বকা দিল মা। 'নদী না আসতেই পেরোবার চিন্তা!'

মার পরামর্শে এবারের বড়দিনে ঘোড়া চাইল লরা আর মেরি। কারণ মাকে নাকি বাবা বলেছে, জমি চাষের ব্যাপারে বলদের চাইতে অনেক ভাল কাজে দেবে একজোড়া ঘোড়া। একটু অবাক হলেও বাবা মনে করল সত্যিই বুঝি ঘোড়া পেলে

ওরা খুব খুশি হবে। তাই আগের রাতে ওদের অবাক করে দেয়ার জন্য একজোড়া ঘোড়া কিনে এনে গোয়ালঘরে বেঁধে রাখল।

তাই বলে বড়দিনে ওরা কিছুই পেল না তা নয়, সকালে ঘুম থেকে উঠে ওরা দেখল ওদের একেকজনের মোজায় ছ'টা করে মজাদার ক্যান্ডি রয়েছে।

শীত গিয়ে বসন্ত এল ওদের চমকে দিয়ে। মাঝরাতে লাফিয়ে উঠে বসল লরা বিছানায়। দরজার বাইরে প্রচণ্ড আওয়াজ।

'বাবা! বাবা, কীসের আওয়াজ এটা?' চেঁচিয়ে উঠল ও।

'মনে হচ্ছে খালের পানি,' বলে একলাফে বিছানা ছাড়ল বাবা। দরজা খুলতেই কয়েকগুণ বেড়ে গেল ভীতিকর শব্দটা। 'ওরেব্বাপ্!' চেঁচিয়ে উঠল বাবা। 'এ যে প্রচণ্ড বৃষ্টি!'

মা কী যেন বলল শুনতে পেল না লরা।

'কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না!' ধারাভাষ্য দিচ্ছে যেন বাবা। 'সূচিভেদ্য অন্ধকার যাকে বলে। তবে কোনও চিন্তা নেই, খালের পানি এত ওপরে উঠবে না; ওপারের তীর ছাপিয়ে নেমে যাবে নীচের দিকে।'

দরজা লাগিয়ে দিল বাবা। সাথে সাথে অনেকটা কমে গেল আওয়াজ।

'শুয়ে পড়ো, লরা,' বলেই বিছানায় উঠল বাবা।

সকালে চোখ খোলার আগেই পানির গর্জন কানে এল লরার। দেখল, মা নাস্তা দিচ্ছে, বাবা বেরিয়ে গেছে। এক দৌড়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল লরা বাইরে। বাপরে! বরফ-শীতল বৃষ্টির পানি মুহূর্তে ভিজিয়ে দিল ওর সারা গা। কিন্তু পরোয়া না করে আরও দু'পা এগিয়ে খালের দিকে তাকাল লরা। ঠিক পায়ের কাছে উঠে এসেছে খালের পানি, প্রচণ্ড গর্জন ছেড়ে ছুটছে সামনে, পাক খাচ্ছে। সেই আপন মনে বক-বক করা খালের এই রুদ্রমূর্তি কল্পনাও করা যায় না।

অবাক হয়ে চারদিকে চাইছে লরা, দুচোখ ভরে গিলছে চারপাশের দৃশ্য, এমনি সময়ে এক টানে ওকে ঘরের ভেতর নিয়ে এল মা। বলছে, 'আমি যে ডাকছি, শুনতে পাওনি?'

'না, মা,' জবাব দিল লরা।

'তাই হবে,' বলল মা। 'শুনতে না পাওয়ারই কথা।'

ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে লরা। নাইট গাউন থেকে পানি নেমে মেঝেতে পুকুর তৈরি হচ্ছে। গায়ের সঙ্গে সেঁটে যাওয়া কাপড় টেনে ছাড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে ডলতে শুরু করল মা।

'এবার জলদি জামা পরে নাও, নইলে ঠাণ্ডা লেগে জ্বর আসবে।'

মেরি বলল, 'কোন্ আক্কেলে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এভাবে ভিজলে বলো তো?'

'খালটা একবার দেখা উচিত ছিল তোমার, মেরি!' বলেই মা'র দিকে ফিরল লরা, 'মা, নাস্তার পর আবার একবার দেখতে যাব খালটা।'

'না,' সোজা জবাব দিল মা। 'বৃষ্টি থামার আগে না।'

কিন্তু নাস্তা শেষ হওয়ার আগেই থেমে গেল বৃষ্টি। পরমুহূর্তে রোদ উঠল। বাবা ফিরে এসেছে। বলল, লরা আর মেরি ইচ্ছে করলে পানির তোড় দেখতে

খালের ধারে যেতে পারে তার সঙ্গে।

বাইরে টাটকা তাজা বাতাস, ঠিক বসন্ত কালের মত কেমন একটা সুগন্ধ। নীল আকাশে জোর হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে সাদা মেঘ। তুষারের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। খালের পানি নেমে গেছে অনেকখানি, কিন্তু ফোঁসফোঁসানি থামেনি ওর।

'এমন উদ্ভট আবহাওয়া জীবনেও দেখিনি আমি!' বলল বাবা।

উপরে উঠে চারপাশে তাকিয়ে দেখল ওরা। সবদিকে শুধু পানি আর পানি। প্লাম গাছগুলো প্রায় ডুবে রয়েছে, কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে উইলোর সারি। কিছুটা দূরে বাবার চষা জমি কালো আর ভেজা দেখাচ্ছে এখান থেকে।

'এবার বুনে ফেলব গম,' আপনমনে বলল বাবা, 'আর দেরি নয়।'

# পাঁচ

খালের পানি নেমে গেল। হঠাৎ করেই যেন গরম পড়ে গেল। রোজ সকালে নতুন ঘোড়া স্যাম আর ডেভিডকে নিয়ে প্রবল উৎসাহে কাজ করছে বাবা গম খেতে।

মা বলল, 'যা শুরু করেছ, মনে হচ্ছে জমিটাকে খুন করবে তুমি; আর সেটা করতে গিয়ে মারা পড়বে নিজেও।'

কিন্তু বাবা বলল যথেষ্ট তুষার না পড়ায় শুকিয়ে খটখটে হয়ে আছে মাটি। সেজন্যই গভীর করে লাঙল দিতে হচ্ছে, বারবার মই দিতে হচ্ছে। এখন যত শীঘ্রি গম বুনে দেয়া যাবে ততই ভাল ফসল হবে। তাই আঁধার থাকতে ধরছে কাজ, সন্ধের আগে আর থামছে না। রোজ সন্ধ্যায় কান পেতে অপেক্ষা করে লরা, স্যাম আর ডেভিড পানি খেতে খালে নামার সময় ঝপাৎ আওয়াজ করলেই এক দৌড়ে ঘর থেকে বাতিটা নিয়ে আস্তাবলে গিয়ে হাজির হয় বাবাকে আলো দেখাতে।

এ-সময় এতই ক্লান্ত থাকে বাবা যে কথা বলারও শক্তি থাকে না, চারটে খেয়ে ধপাস করে বিছানায় পড়েই তলিয়ে যায় গভীর ঘুমে।

অবশেষে গম বোনা হলো। তার পরপরই জই বুনলো বাবা। তারপর আলু।

এবার বাড়ির কাছাকাছি এক টুকরো জমিতে আচ্ছামত লাঙল টেনে মা'র জন্য বাগান তৈরি করে দিল। লরা আর মেরিকে নিয়ে মা সেখানে নানান রকম তরি-তরকারির বীজ বুনল। ক্যারিকেও এটা-ওটা আনার কাজ দেয়া হলো, যাতে ও মনে করে খুব সাহায্য করছে।

এখন শুধু অপেক্ষার পালা। যেদিন মাটি ফুঁড়ে ছোট্ট একটু অঙ্কুর বেরোল, সেদিন সে কী আনন্দ, খুশিতে তিড়িং-তিড়িং করে লাফাল মেরি আর লরা। বাবা-মার মুখেও হাসি ফুটল। এমন কী ক্যারিও হাত তালি দিল সবার খুশি দেখে।

পরদিন স্যাম আর ডেভিডকে নিয়ে শহরে গেল বাবা। কাছেই শহর। এক বেলাও লাগে না আসতে যেতে। তাই বাবার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষার দিন ফুরিয়েছে। গাড়ির শব্দ সন্ধ্যার আগে কানে এল লরার। এক দৌড়ে উঠে গেল সে ওপরে।

ওয়্যাগন সীটে বসে আছে বাবা। খুশিতে জ্বলজ্বল করছে সারা মুখ। ওয়্যাগন বক্স ঠাসা রয়েছে কাঠের তক্তায়। হাঁক ছাড়ল বাবা, 'এই যে, ক্যারোলিন, তোমার নতুন বাড়ি!'

'কিন্তু, চার্লস!' ঘর থেকে বেরিয়েই থ হয়ে গেছে মা, 'তা কী করে হয়? সবে অঙ্কুর বেরিয়েছে বীজ থেকে!'

এক দৌড়ে গিয়ে চাকা বেয়ে উঠে পড়ল লরা ওয়্যাগনে, আছড়ে-পাছড়ে চড়ে বসল তক্তাগুলোর উপর। এত মসৃণ তক্তা জীবনে দেখেনি ও। প্রত্যেকটি সুন্দর, সোজা করে মেশিন দিয়ে কাটা।

'তাতে কী হয়েছে,' হাসছে বাবা মা'র কথায়, 'ওরা সেধে দিল, গম বিক্রি করে শোধ করব টাকা।'

'তক্তা দিয়ে বানানো বাড়ি হবে আমাদের, বাবা?' জিজ্ঞেস করল লরা।

'হ্যাঁ, ছট্‌ফটি,' বলল বাবা, 'পুরো বাড়ি মেশিনে চেরা তক্তা দিয়ে তৈরি হবে। কাঁচের জানালা হবে!'

সত্যিই, লরা দেখল, পরদিন সকালে বাবাকে সাহায্য করবার জন্য এসে হাজির হলেন মিস্টার নেলসন। একটা টিলার উপর তল-কুঠুরির জন্য শুরু হলো মাটি কাটা।

লরা আর মেরির মন পড়ে থাকে নতুন বাড়ির পাশে, কিন্তু সব কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছাড়ে না মা। থালা-বাসন ধুয়ে-মুছে জায়গামত সাজিয়ে রেখে, বিছানা ঝেড়ে সাট করে, ঘর ঝাড়ু দিয়ে ঘরের কোণে সোজা করে ঝাড়ুটা রাখার পর ছুটি মেলে। পরমুহূর্তে উড়ে চলে যায় ওরা নতুন বাড়ির কাছে।

দ্রুত এগিয়ে চলেছে বাড়ির কাজ। কাঠামো দাঁড়িয়ে গেছে এখনই। চারদিকে ছোট-বড় কাঠের টুকরো, রাঁদা করার ফলে পাকানো চলটা, আর করাত দিয়ে কাটার ফলে সবখানে কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে রয়েছে। মিস্টার নেলসন আর বাবা ওপরে হাতুড়ি আর করাত নিয়ে ব্যস্ত, নীচে বসে দুই বোন টুকরো-টাকরা সংগ্রহ করে নিয়ে তৈরি করে নিজেদের খেলনা-বাড়ি।

বাড়িটা দোতলা। নীচতলায় একটা শোবার ঘর, আর একটা বসবার ঘর। দোতলাটা চিলেকোঠার মত—ওটা মেরি আর লরার শোবার ও খেলবার ঘর। কাঁচ বসানো জানালাগুলো সুন্দর। তক্তাগুলো এমন চমৎকার ভাবে বসানো হয়েছে যে সামান্যতম ঠাণ্ডা বা একফোঁটা বৃষ্টিও ঢুকতে পারবে না ভেতরে।

ক'দিন পর কাজ করতে করতে হঠাৎ বাবা ডাকল ওদের। 'তোমাদের যদি একটা কথা বলি, লরা-মেরি, তোমরা সেটা গোপন রাখতে পারবে?'

'পারব, বাবা,' বলল ওরা।

'মাকে বলে দেবে না, প্রমিজ?'

'প্রমিজ! প্রমিজ!'

বাবা তখন পিছনের দরজাটা খুলে ডাকল ওদের। ওরা গিয়ে দেখে দারুণ একটা চকচকে কালো কুকস্টোভ রাখা ওখানে। মাকে অবাক করে দেবে বলে বাবা ওটা কিনে এনে লুকিয়ে রেখেছে। এত সুন্দর স্টোভ জীবনে কখনও দেখেনি ওরা।

ভারি স্টোভটা দুইহাতে তুলে লিভিং রুমে এনে জায়গামত বসাল বাবা, তারপর স্টোভ-পাইপটা ফিট করল ওর সঙ্গে। ছাত ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল ওটা আরও ওপরে। 'ব্যস, কাজ শেষ!' বলল বাবা, 'কাল আমরা উঠে আসব এই বাড়িতে। আজই আমাদের গর্তে ঘুমানোর শেষ রাত।'

গম খেতের পাশ দিয়ে ফিরে চলল ওরা ওদের গর্তে। দেখল কলকলিয়ে বাড়ছে গমের চারাগুলো, আধহাত লম্বা হয়ে গেছে এখনই।

## ছয়

পরদিন রোদ ঝলমলে সকালে সমস্ত মালপত্র ওয়্যাগনে তুলতে বাবাকে সাহায্য করল লরা আর মেরি। গোপন কথাটা চেপে রেখেছে ওরা ঠিকই, কিন্তু পেট ফেটে মরবার দশা হয়েছে ওদের।

কিছুই সন্দেহ করেনি মা। টিনের চুলো থেকে গরম ছাই বের করে নিল, যাতে বাবা ওটা সহজেই বয়ে নিয়ে যেতে পারে। জিজ্ঞেস করল, 'ভাল কথা, চার্লস, স্টোভপাইপ কিনেছ তো বেশি করে?'

'হ্যাঁ, ক্যারোলিন,' শান্ত গলায় জবাব দিল বাবা। লরার হাসি পেয়ে গেল, সেটা চাপতে গিয়ে কাশি এসে গেল।

'কী হলো, লরা,' ভুরু কুঁচকে চাইল মা, 'ব্যাঙ ঢুকেছে তোর গলায়?'

ওয়্যাগন নিয়ে আগেই পৌঁছে গেল বাবা, বাকি সবাই টুকিটাকি জিনিস-পত্র হাতে হেঁটে আসছে। সবার আগে আগে টলোমলো পায়ে হাঁটছে ক্যারি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাবা, চুলোটা দেখে মা'র কী প্রতিক্রিয়া হয় দেখবে।

ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল মা। মুখটা খুলেই বন্ধ করে ফেলল। তারপর দুর্বল কণ্ঠে বলল, 'আরি, সর্বনা-শ!'

লরা আর মেরি চেঁচিয়ে উঠে নাচানাচি শুরু করল। ক্যারিও তাই করছে, যদিও জানে না কেন।

'তোমার, মা! ওটা তোমার নতুন স্টোভ!' একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে লরা আর মেরি। 'ওর মধ্যে একটা আভেন আছে, চারটে ঢাকনা, আরও কত কী!'

'এটা কেন কিনতে গেলে, চার্লস? এটা উচিত হয়নি।'

বাবা একহাতে জড়িয়ে ধরল মাকে। 'তুমি কিচ্ছু ভেবো না, ক্যারোলিন। কোনও দুশ্চিন্তা কোরো না।'

'তা করছি না, এই রকম আলিশান বাড়ি, কাঁচের জানালা, আস্ত একটা স্টোভ –বেশি হয়ে গেল না?'

'তোমার তুলনায় খুব কমই,ক্যারোলিন,' গাঢ় কণ্ঠে বলল বাবা। 'আর খরচের কথা ভাবছ? একবার শুধু জানালায় দাঁড়িয়ে গমখেতটার দিকে তাকাও!'

লরা আর মেরি হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল মাকে স্টোভটার ধারে, ঢাকনা তুলে তুলে দেখাল, আভেন খুলে দেখাল, হাতল ঘুরিয়ে ফ্যান চালিয়ে দেখাল।

'আরি-ই-ব্বাপ্!' সব দেখে শুনে তাজ্জব হয়ে গেল মা। 'এত সুন্দর একটা চুলোয় রান্না করব আমি, ভাবতেই ভয় লাগছে!'

মুখে ওকথা বলল বটে, কিন্তু চমৎকার ডিনার তৈরি করল মা। দরজা দিয়ে রোদ আসছে, জানালা দিয়েও আসছে আলো-বাতাস – এমন সুন্দর ঘরে বসে ডিনার খেতে কী যে ভাল লাগল ওদের!

জানালায় পর্দা টাঙাল ওরা। পুরনো চাদর কেটে পর্দা বানিয়েছে মা, তিন দিকে বর্ডার দিয়েছে কুঁচি দেয়া ছিটকাপড়ের। লিভিংরুম আর বেডরুম আলাদা করার জন্য দেয়ালে পেরেক ঠুকে ঝোলানো হলো কার্টেন। লরা আর মেরির চিলেকোঠাও সুন্দর করে সাজিয়ে দিল মা। যদিও কাপড়ের অভাবে জানালায় পর্দা দেয়া সম্ভব হলো না, দুজনের জন্য দুটো বাক্স বানিয়ে দিয়েছে বাবা–ওর ওপর ইচ্ছে করলে বসতে পারে ওরা, ভেতরে রাখতে পারে যার যার ধন-রত্ন, পুঁজি-পাট্টা।

সব চমৎকার, শুধু একটা ত্রুটি রয়ে গেল – জ্যাক বেচারাকে নীচে ঘুমাতে হবে, মইয়ের ধাপ বেয়ে ওর পক্ষে ওপরে ওঠা সম্ভব নয়।

সারাদিন ধকল গেছে খুব, সন্ধেরাতেই ঘুমিয়ে পড়ল লরা। কিন্তু বেশিক্ষণ ঘুমিয়ে থাকতে পারল না। নতুন বাড়িটা অসম্ভব চুপচাপ। খালের পানির কলকল শব্দটা যেন ঘুমের মধ্যেও শুনতে পেত ও, সেটা এখন নেই। নিস্তব্ধতা বার বার ভাঙিয়ে দিচ্ছে ঘুম।

ভোর রাতে আবার ভাঙলো লরার ঘুম। এবার শব্দ শুনে। কান পেতে শুনল ও শব্দটা। মনে হচ্ছে ছোট ছোট পা ফেলে কারা যেন দৌড়ে বেড়াচ্ছে ছাদের ওপর। কীসের শব্দ?

হঠাৎ মনে পড়ল, আরে, বৃষ্টি পড়ছে তো! বহুদিন কাঠের ছাদে বৃষ্টি পড়ার শব্দ শোনেনি বলে ভুলেই গিয়েছিল আওয়াজটা কেমন। বৃষ্টির টুপুর-টাপুর শব্দ শুনতে শুনতে আবার তলিয়ে গেল ও ঘুমের অতলে।

# সাত

সকালে খালিপায়ে বিছানা থেকে নেমে মসৃণ কাঠের মেঝে ঠেকল লরার পায়ের নীচে। বুক ভরে শ্বাস টেনে পাইন কাঠের মিষ্টি গন্ধ পেল।

পুব জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল ও। সবুজ মখমলের মত সুন্দর দেখাচ্ছে গমখেতটা, অল্প একটু দূরে জইখেত। অনেক, অনেক দূরে, ঘাস-প্রান্তরের শেষ সীমানায় সবে উঁকি দিচ্ছে সূর্য। উইলো ক্রীক আর মাটির নীচের ঘরটা মনে হচ্ছে যেন অনেক দূরের, অনেক আগের কথা।

নীচ থেকে নতুন স্টোভের ঢাকনি নাড়াচাড়ার খুটুর-খাটুর আওয়াজ আসছে। চৌকোনা গর্ত দিয়ে ভেসে এল মা'র কণ্ঠ, 'মেরি! লরা! আর কত ঘুমাবে? উঠে পড়ো।'

নাস্তা খেতে খেতে লরা জিজ্ঞেস করল খালের ধারে খেলতে যেতে পারবে কি না। বাবা বারণ করল।

'না, লরা। ওদিকটায় গভীর গর্ত আছে কয়েকটা। যদি যেতে চাও, ঘরের কাজ সেরে নেলসনদের ওদিকটায় গিয়ে দেখতে পারো কী আছে।'

হাত চালিয়ে দ্রুত কাজ সেরে বেরিয়ে পড়ল লরা আর মেরি। ঢাল বেয়ে সমতল জমিতে নেমে গেল ওরা, কিছুদূর গিয়ে আবার খানিকটা উঁচু জমি, তারপরেই–আরে, ওই তো খাল!

দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াল ওরা খালের ধারে। অবাক হয়ে গেল লরা, একই খাল, কিন্তু দেখতে সম্পূর্ণ অন্য রকম লাগছে! অনেক শান্ত, সরু আর অগভীর। মস্ত এক উইলো গাছের নীচে ওপারে যাওয়ার জন্য পুরু একটা তক্তা ফেলা আছে।

কিছুটা উজানে খালের দুপাশে অসংখ্য প্লাম গাছ, এমন ঘন হয়ে উঠেছে যে মনে হচ্ছে দুপাশ থেকে ছুঁয়ে আছে পরস্পরকে। ওগুলোর নীচে গাঢ় ছায়া। খালটা প্লাম ঝাড় থেকে বেরিয়ে এসে বালু আর কাঁকরের ওপর দিয়ে খিলখিল করে হাসতে হাসতে এগিয়ে দূরে গিয়ে পড়েছে একটা মস্ত জলাশয়ে।

হাঁটুপানিতে নেমে পড়ল ওরা দু-বোন। পরিষ্কার টলটলে পানি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বালির ওপর প্রতিটা কাঁকর। অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে 'মিনো'র ঝাঁক, ওরা দাঁড়ালে আস্তে করে ঠোকর দেয় পায়ে। হঠাৎ পানির নীচে অদ্ভুত এক জীব দেখতে পেল লরা।

পায়ের পাতার সমান লম্বা, রঙটা সবজে-খয়েরি। সামনের দিকে লম্বা দুটো দাঁড়া, তার আগায় শিকার ধরার জন্য সাঁড়াশির মত এক জোড়া নখ। দুপাশে ছোট ছোট কয়েকটা করে পা। লেজটা চ্যাপটা, চওড়া আর শক্তিশালী–মাছের মত আঁশ আছে। নাকের কাছে দুটো শুঁয়ো দেখা যাচ্ছে। চোখদুটো গোল, ঠেলে বেরিয়ে আছে বাইরে।

'কী ওটা!' ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল মেরি।

লরাও থমকে দাঁড়িয়েছে, এগোচ্ছে না। সাবধানে নিচু হলো ও ভাল করে দেখবে বলে। মুহূর্তে গায়েব হয়ে গেল জিনিসটা। জল-পোকার চেয়ে অনেক দ্রুতবেগে ছিটকে পিছিয়ে চলে গেছে ওটা একটা পাথরের নীচে–ধোঁয়ার মত খানিকটা কাদাপানি দেখা যাচ্ছে ওখানটায়।

একটু পরেই পাথরের নীচ থেকে একটা দাঁড়া বের করে চিমটি দেয়ার ভঙ্গি করল, তারপর একটা চোখ বের করল – দেখবে ওদের মতলব কী।

লরা এক পা এগোতেই, আবার সাঁৎ করে ঢুকে গেল আস্তানায়। কিন্তু যেই পানি ছিটিয়েছে, অমনি লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে লরার পা চিমটে ধরার জন্য দাঁড়া চালাল। তেড়ে আসতে দেখে চেঁচিয়ে উঠে দৌড়ে পালিয়ে এল ওরা ওটার আস্তানা থেকে দূরে।

এবার লম্বা একটা কাঠি নিয়ে ওর পেছনে লাগল দু'বোন। পরোয়া না করে কাঠিটাকে অনায়াসে ঘ্যাঁচ করে দু'টুকরো করে ফেলল ওটা দাঁড়া দিয়ে। আরও বড় একটা কাঠি নিল ওরা। এবার আর ভাঙতে পারল না বটে, কিন্তু একটা দাঁড়া দিয়ে আঁকড়ে ধরল ওটাকে যতক্ষণ না লরা ওকে পানির ওপর তুলে ফেলল। রাগী

দুই চোখ যেন গিলে খাবে ওদের, লেজটা গুটিয়ে রেখেছে নীচে, অপর দাঁড়াটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে খামচে ধরার চেষ্টা করছে ওদের। ধরতে না পেরে শেষে কাঠিটা ছেড়ে দিয়ে ঝুপ করে পানিতে পড়ল ওটা, পাথরের নীচে ঢুকে লক্ষ রাখল ওদের ওপর।

ওরা যতবার লাগতে গেল ওটার সঙ্গে, ততবারই তাড়া খেয়ে পালাতে হলো এলাকা ছেড়ে। উইলোর ছায়ায় সাঁকোর ওপর বসে খানিক জিরিয়ে নিল ওরা, কুল-কুল আওয়াজ শুনল পানির। তারপর আবার হাঁটুপানি ভেঙে চলল প্লাম ঝোপের দিকে।

কিছুদূর গিয়ে মেরি বলল ও আর যাবে না, ওদিকে পানি বেশি, তার ওপর কাদা। ও তীরে উঠে বসে থাকল, লরা একাই এগিয়ে গেল কাদার মধ্য দিয়ে। প্লাম গাছগুলোর নীচে পানি মনে হলো স্থির। পচা পাতা জমে আছে পারের কাছে। কাদা এতই বেশি যে পা খানিকটা ডেবে গিয়ে পিছলে মত যাচ্ছে, পা তুলতে গেলে কাদা যেন টেনে রাখতে চায়, ঘোলা হয়ে যায় বেশ খানিকটা জায়গার পানি। বাতাসেও কেমন একটা পচা, আঁশটে গন্ধ। ফিরে গেল লরা মেরির কাছে পরিষ্কার পানিতে।

দুই পায়ে কাদা মত কী যেন লেগে আছে লরার। ভাল পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করল, কিন্তু গেল না ওগুলো। হাত দিয়ে ডলা দিতেও গেল না। জিনিসটার রঙ ঠিক কাদার মত, তেমনি নরম, কিন্তু সেঁটে রয়েছে চামড়ার সঙ্গে, যায় না কিছুতেই।

ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল লরা, 'মেরি, অ্যাই মেরি! জলদি! জলদি এসে দেখো!'

মেরি এল, কিন্তু ওই বিচ্ছিরি, নোংরা জিনিস ও ছুঁতে পারবে না; পোকা দেখলে ওর বমি আসে। এদিকে লরার অবস্থাও কাহিল, ওরও খুব ঘেন্না লাগে; তবে এখন না ছুঁয়েও কোনও উপায় নেই, দু'আঙুলের নখ দিয়ে একটাকে চেপে ধরে টান দিল।

টান পড়ায় লম্বা হতে শুরু করল জিনিসটা, কিন্তু তবু কামড় ছাড়তে চায় না। আরও কিছুটা লম্বা হওয়ার পর পা থেকে খুলে এল ওটা। এক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে নামছে ওটা যেখানে সেঁটে ছিল সেখান থেকে। একে একে সবকটাকে টেনে টেনে ছাড়িয়ে আনল লরা পা থেকে। প্রতিটা ক্ষত থেকে এক ফোঁটা করে রক্ত গড়িয়ে নামল।

খেলার সাধ মিটে গেছে লরার। পরিষ্কার পানিতে হাত-পা ধুয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল মেরির সঙ্গে।

বাবাকে পাওয়া গেল দুপুরে খাওয়ার সময়। লরা জিজ্ঞেস করল: পানিতে থাকে, হাত নেই পা নেই, নাক-মুখ-চোখ নেই, কাদাটে রঙের রক্ত-চোষা ওই জিনিসগুলো কী।

সব শুনে বাবা বলল ওগুলোকে বলে জোঁক।

'জোঁককে আমি ঘেন্না করি,' ঘোষণা দিল লরা।

'বেশ, তা হলে কাদা-পানিতে আর যেয়ো না,' বলল বাবা।

মা বলল, 'খালে-বিলে দাপাদাপি করার সময়ও আর পাবে না বিশেষ। মাত্র আড়াই মাইল হাঁটলেই শহর, সোমবার থেকে স্কুলে যাবে তোমরা।'

'স্কুল?' পরস্পরের দিকে চাইল দুই বোন, কেউ কোনও জবাব দিতে পারল না।

# আট

স্কুলে যাওয়ার কথা শুনে মাথায় যেন বাজ পড়েছে লরার। সারাটা দিন খালের ধারে না গিয়ে কী করে থাকবে বুঝতে পারছে না ও কিছুতেই। বার বার করে মাকে জিজ্ঞেস করল, 'যেতেই হবে, মা? স্কুলে না গেলে হয় না?'

মা বলল প্রায় আট বছরের বুড়ি-ধাড়ি মেয়ের মুখে এ কী কথা! লেখাপড়া তো শিখতেই হবে।

'কিন্তু আমি তো পড়তে পারি, মা,' আকুল মিনতি লরার কণ্ঠে, 'আমাকে স্কুলে পাঠিয়ো না, মা, প্লীজ। আমি পড়ছি, তুমি দেখো।'

দৌড়ে গিয়ে প্রচ্ছদে 'মিলব্যাঙ্ক' লেখা একটা বই নিয়ে এল। বইটা মেলে ধরে ব্যাকুল নয়নে মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে পড়তে শুরু করল, 'মিলব্যাঙ্কের দরজা-জানালাগুলো সব বন্ধ ছিল। দরজার হাতল থেকে—'

'এ কী, লরা!' অবাক হয়ে বলল মা, 'তুমি তো পড়ছ না, মুখস্থ বলে যাচ্ছ। তোমার বাবাকে যা পড়ে শুনিয়েছি, তুমি মুখস্থ করে বসে আছো। এতে তো হবে না। অনেক কিছু শেখার আছে স্কুলে—অক্ষর পরিচয়, বানান, হাতের লেখা, অঙ্ক, আরও কত কী! স্কুলে গেলেই বুঝতে পারবে, এসব কঠিন কিছু নয়। স্কুলে যাব না একথা ভুলেও মুখে এনো না আর। ভাল মেয়েরা সবাই যায়। সোমবার সকালে মেরির সঙ্গে তুমিও যাবে স্কুলে।'

লক্ষ্মী হয়ে বসে সেলাই করছে মেরি, কোনও আপত্তি নেই ওর স্কুলে যেতে।

পিছনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাতুড়ি দিয়ে কী যেন ঠুকছে বাবা। এত দ্রুত ছুটে বেরিয়ে এল লরা যে আরেকটু হলেই বাড়ি পড়ত ওর মাথায়।

'ইশশ্-রে! এক্ষুণি দিয়েছিলাম! তোমার এত তাড়াহুড়ো কীসের, ছটফটি? কথা নেই বার্তা নেই, যখন তখন লাফিয়ে পড়ছ ঘাড়ের ওপর!'

'কী করছ, বাবা?' জিজ্ঞেস করল লরা। বেঁচে যাওয়া কাঠের টুকরো-টাকরা পেরেক দিয়ে ঠুকে কী যেন তৈরি করছে বাবা।

'মাছ ধরার একটা ফাঁদ বানাচ্ছি,' বলল বাবা। 'ধরো এই পেরেকগুলো। আমি চাইলেই একটা একটা করে দেবে আমার হাতে।'

মনের মত কাজ পেয়ে লরা মহা খুশি। কাঠের সরু ফালি দিয়ে ডালাহীন একটা বাক্সমত বানাচ্ছে বাবা, প্রতিটা ফালির মধ্যে কিছুটা করে ফাঁক।

'এটা দিয়ে মাছ ধরবে কী করে, বাবা?' অবাক হয়েছে লরা। 'এটা যদি খালে ডুবিয়ে রাখো, মাছ ঢুকবে ঠিকই, কিন্তু বেরিয়েও তো যাবে ফাঁক গলে।'

'দাঁড়াও, আগে বানিয়ে নিই, তারপর দেখো।'

পেরেক মারা শেষ করে ফাঁদটা কাঁধে তুলে নিল বাবা। 'চলো, লরা, ফাঁদটা পাতি গিয়ে।'

বাবার হাত ধরে নাচতে নাচতে চলল লরা। খালের পার ধরে প্লাম ক্রীক ছাড়িয়ে আরও উজানে চলে এল ওরা। খালটা এখানে অনেক সরু হয়ে গেছে, পানির আওয়াজও বেশি। ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল বাবা, লরাও চলল পিছু পিছু। হঠাৎ দেখতে পেল ও জলপ্রপাতটা। মাত্র কয়েক ফুট নীচে পড়ছে পানি, কিন্তু তাতেই এত জোর আওয়াজ! নীচে পড়েই আবার লাফিয়ে উঠছে পানি, পাক খেয়ে ছুটছে সামনে।

দুজন মিলে ফাঁদটা পাতল ঠিক জলপ্রপাতের নীচে। গোটা জলপ্রপাতটা পড়ছে এখন ফাঁদের ভেতর, কিন্তু লাফিয়ে উঠতে পারছে না, সরু কাঠের ফাঁক গলে বেরোতে হচ্ছে।

'এইবার বুঝলে?' বলল বাবা। 'ওপর থেকে মাছ এসে পড়বে এখানে, ছোটগুলো বেরিয়ে যাবে ফাঁক গলে, কিন্তু বড়গুলো? ওরা না পারবে পানি বেয়ে ওপরে উঠতে, না পারবে ফাঁক গলে বেরোতে। এই ফাঁদের মধ্যেই সাঁতার কাটতে থাকবে ওরা আমি না আসা পর্যন্ত।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই বড়সড় একটা মাছ নেমে এল ওপর থেকে। চিঁ করে ডাক ছাড়ল লরা, তারপর চেঁচাল, 'দেখো, দেখো! বাবা!'

পানি হাতড়ে খপ করে ধরল বাবা মাছটা, তুলে আনল ওপরে। মোটা তাজা রূপালি মাছটা কিলবিল করছে আর লেজ ঝাপটাচ্ছে। ফাঁদের মধ্যে ছেড়ে দিল বাবা ওটাকে।

বাবাকে ওপরে উঠে আসতে দেখে অস্থির কণ্ঠে বলে উঠল লরা, 'বাবা, আর কিছুক্ষণ থেকে সাপারের জন্যে কয়েকটা মাছ নিয়ে গেলে ভাল হতো না?'

'এখন কাজ আছে, লরা,' মাথা নাড়ল বাবা। 'আস্তাবলে কিছুটা মেরামতের কাজ আছে, বাগানে লাঙল দিতে হবে, তারপর একটা কুয়া –' একটু থেমে লরার দিকে চাইল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, আধ-বোতল, একটু অপেক্ষা করেই দেখা যাক। হয়তো বেশিক্ষণ লাগবে না।'

পারে বসে অপেক্ষা করছে ওরা, হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় জিজ্ঞেস করল লরা, 'বাবা, স্কুলে কি যেতেই হবে আমাকে?'

'স্কুল তোমার ভাল লাগবে, লরা।'

'এখানে এই খালের ধারেই তো আমার বেশি ভাল লাগে, বাবা।'

'আমি জানি, আধ-বোতল,' স্নেহ ঝরল বাবার গলায়। 'কিন্তু ভেবে দেখো, সবাই এই সুযোগ পায় না। তোমার মা'র সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হয়, তখন ও ছিল স্কুল-টীচার। পশ্চিমে যখন রওনা হলাম তখন তোমার মাকে আমি কথা দিয়েছিলাম, প্রথম সুযোগেই তোমাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করব। এইজন্যেই শহরের এত কাছে আমরা জমি কিনলাম। তোমার প্রায় আট, মেরির বয়স নয়–এখনই শুরু না করলে দেরি হয়ে যাবে। লেখাপড়ার সুযোগ যে পাওয়া যাচ্ছে, এজন্যে তোমার নিজেকে ভাগ্যবান মনে করা উচিত।'

'আচ্ছাহ্!' বলল লরা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ঠিক সেই সময় হড়াশ করে জলপ্রপাত বেয়ে নেমে এল আরও একটা মাছ। বাবা ওটাকে ধরার আগেই এসে হাজির আর একটা!

বড় দেখে চারটে মাছ নিয়ে ফিরে চলল ওরা বাড়ির দিকে। মাছ দেখে মা'র চক্ষু চড়ক গাছ। মাছগুলোর মাথা কেটে ফেলল বাবা প্রথমেই, তারপর নাড়ীভুঁড়ি বের করে লরাকে শেখাল কী করে মাছের আঁশ ছাড়াতে হয়। শেষ মাছটার আঁশ লরাই ছাড়াল। মা ওগুলো ময়দা মাখিয়ে চর্বি দিয়ে ভেজে নামাল। সেদিনের রাতের খাওয়াটা খুব জমজমাট হলো টাটকা মাছ-ভাজা থাকায়।

'সবসময় কিছু না কিছু বুদ্ধি তুমি বের করেই ফেল, চার্লস,' বলল মা। 'আমি যখন ভাবছি বসন্তকালটা তো তুমি শিকার করবে না, আমি চালাব কী করে, ঠিক তখনই অফুরন্ত মাছের ব্যবস্থা করে ফেলেছ!'

বসন্তকালটা সব জন্তু-জানোয়ার আর পাখির বাচ্চা দেবার সময় বলে বাবা কখনও এই সময়ে কিছু শিকার করে না।

প্রশংসায় খুশি হয়ে বাবা বলল, 'দাঁড়াও না, এবারের গমগুলো তুলে নিই, তারপর থেকে রোজ আমরা গরুর তাজা মাংস দিয়ে সাপার খাব।'

এর পর থেকে রোজ সকালে বাবা কাজে যাওয়ার আগে ফাঁদ থেকে মাছ এনে দেয়। নিজেদের খাওয়ার জন্য ঠিক যতটুকু দরকার তার চেয়ে একটা বেশি মাছ আনে না কখনও, বাকি সব মাছ ফাঁদ থেকে তুলে ছেড়ে দেয় ভাটিতে। একেক দিন একেক রকম মাছ আনে বাবা–কোনদিন পিকারেল, কোনদিন ব্ল্যাক বেস বা বুলহেড, কোনদিন শাইনার বা ক্যাটফিশ অথবা এমন মাছ, যার নাম বাবা নিজেও জানে না। সকাল-বিকেল-রাত তিন বেলা তিন ধরনের মাছ পায় বলে বিরক্তি লাগে না ওদের রোজ মাছ খেতে।

## নয়

সোমবার সকালে ঘরের কাজ সেরে ওরা যে যার রোববারের পোশাক পরে নিল। মেরির নীল জামা, লরার লাল।

চুল আঁচড়ে টাইট করে বেনী বেঁধে দিল মা ফিতে দিয়ে। দুজনের মাথাতেই রোদ ঠেকাবার টুপি। মা ওদেরকে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বাক্স থেকে বের করল তিনটে বই। মা নিজে ছোটবেলায় পড়েছে এই বই।

'আমার এই বইগুলো তোমাদের দুজনের হাতে তুলে দিলাম,' আবেগে একটু একটু কাঁপছে মা'র গলা। 'আমি জানি তোমরা এগুলো যত্ন করে রাখবে, আর মন দিয়ে পড়বে।'

'হ্যাঁ, মা,' বলল ওরা।

বই তিনটে মেরির হাতে দিল মা, লরার হাতে দিল টিফিনের বাটি – দুপুরের খাবার। 'যাও, ভাল হয়ে থেকো।'

দরজায় দাঁড়িয়ে ওদের বিদায় দিল মা আর ক্যারি। জ্যাক চলল ওদের পাশে পাশে। এই সাত সকালে ওদেরকে জামাকাপড় পরে বেরোতে দেখে কেমন যেন হকচকিয়ে গেছে ও। বাবার ওয়্যাগনের চাকার দাগ যে পর্যন্ত গেছে ততদূর লরার পিছু পিছু এল সে, কিন্তু ওরা যখন খাল পেরোবার উপক্রম করছে তখন বসে পড়ে কাতর কণ্ঠে ককিয়ে উঠল। ওদের সঙ্গে যাবে, নাকি বাড়ি পাহারা দেবে, কী করবে বুঝতে পারছে না বেচারা।

ওকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করল লরা যে ওর এখন ফিরে যাওয়া উচিত, মাথায় হাত বুলিয়ে দিল, উৎকণ্ঠায় কুঁচকে যাওয়া নাক-চোখ সমান করে দেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু ও বসেই থাকল পারে। ওর প্রবল আপত্তি ঠেলে যখন খাল পার হয়ে চলেই যাচ্ছে, তখন ওর আর কিছু করবার নেই, কিন্তু যতদূর দেখা যায় দেখবে ও, যেন ওদের কোনও বিপদ-আপদ না হয়।

আধ-হাঁটু পানি, খুব সাবধানে পা ফেলছে ওরা যাতে জামা ভিজে না যায়। নীল রঙা একটা বক ওদেরকে কাছে আসতে দেখে লম্বা ল্যাগব্যাগে ঠ্যাং ঝুলিয়ে উড়াল দিল, সরে গিয়ে বসল দূরে। খাল পেরিয়ে ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটল ওরা পা শুকাবার জন্য, নইলে ধুলো লেগে নোংরা দেখাবে পা।

থেমে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে চাইল লরা। বিশাল তৃণভূমির মাঝখানে ছোট্ট দেখাচ্ছে বাড়িটা। মা আর ক্যারি ভেতরে চলে গেছে। শুধু জ্যাক এখনও পারে বসে তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে।

চুপচাপ হেঁটে চলেছে মেরি আর লরা।

ঘাসের ডগায় চিকচিক করছে শিশির বিন্দু। লার্ক পাখি ডাকছে মনের আনন্দে। স্নাইপগুলো সরু, লম্বা পা ফেলে হাঁটছে পানির ধারে। প্রেয়ারি মুরগি ডাকছে কাছেই, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না ওদের, তবে বাচ্চাগুলো মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে ঘাসের ফাঁক দিয়ে। খরগোসগুলো হঠাৎ বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়াচ্ছে, কান খাড়া করে দুহাতে নাক চুলকাচ্ছে, চোখ গোল করে দেখছে ওদের।

বাবা বলে দিয়েছে, এই পায়ে চলা পথ ধরে আড়াই মাইল গেলেই পৌঁছে যাবে ওরা শহরে। বিশাল আকাশের নীচে ঘাসে ছাওয়া প্রেয়ারি প্রান্তর, মাঝখান দিয়ে সরু একটা পথ তৈরি হয়েছে বাবার ওয়্যাগন চলাচলের ফলে।

'আহ্, লরা!' মা'র অনুকরণে বলল মেরি, 'টুপিটা মাথায় দাও, নইলে ইন্ডিয়ানদের মত তামাটে হয়ে যাবে। কী বলবে তখন শহরের মেয়েরা?'

'যা খুশি বলুকগে, আমি পরোয়া করি না!' ঘোষণা দিল লরা।

'ঠিকই পরোয়া কর, মুখে মুখে বাহাদুরি।'

'না, করি না।'

'হ্যাঁ, কর।'

'না, করি না।'

'আমারই মত তুমিও আসলে ভয় পাচ্ছ শহরে যেতে।'

জবাব দিল না লরা। একটু পরেই গলার সঙ্গে ফিতে দিয়ে বাঁধা সানবনেটটা মাথায় দিল। এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটল ওরা।

'ভাগ্যিস আমরা দুজন,' একটু পরে আবার বলল মেরি, 'একা হলে কী যে

বিচ্ছিরি হতো!'

হাঁটতে হাঁটতে একসময় শহর দেখা গেল। কাঠের ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে দূর থেকে। রাস্তাটা ঢালু হয়ে নীচে নামলে সব অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার যখন ওপরে ওঠে তখন আগের চেয়ে বড় দেখায় সবকিছু। স্টোভপাইপ দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

শহরের রাস্তায় অসম্ভব ধুলো। ছোট একটা বাড়ির পাশ দিয়ে এগোলে একটা স্টোর, তারপর কামারের দোকান – জোরে শোরে কাজ চলছে সেখানে। তারপর একটা বাড়ির পিছন দিক, সেটা পেরোলেই সামনে আরেক রাস্তা। কোন দিকে যাবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না, এমন সময় ছেলে-মেয়েদের হৈ-হল্লার আওয়াজ এল কানে।

'ওই-ত্তো, ওই দিকে,' ডাকল মেরি। 'বাবা বলেছিল বাচ্চাদের চেঁচামেচি শোনা যাবে।'

ঘুরেই একছুটে বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করল লরার।

ধীর পায়ে এগিয়ে গেল ওরা শব্দ লক্ষ্য করে। দুটো স্টোর আর একটা কাঠের দোকান পেরিয়েই দেখতে পেল ওরা স্কুলহাউসটা। ধুলো ভরা রাস্তাটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ঘাসের ওপর দিয়ে আরও কিছুদূর যেতে হবে। এক দল ছেলে-মেয়ে খেলা করছে সামনের মাঠে।

এগিয়ে গেল লরা, পিছন পিছন আসছে মেরি। ওরা কাছে যেতে থেমে গেল হৈ-চৈ, সবাই ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে ওদের। এত মানুষ তাকিয়ে রয়েছে দেখে একটু হকচকিয়ে গেল লরা। কিছু না ভেবেই টিফিন-বক্সটা দুলিয়ে বলে উঠল, 'দূর থেকে তোমাদের চেঁচামেচি শুনে মনে হচ্ছিল একঝাঁক প্রেয়ারি-মুরগির বাচ্চা ঝগড়া করছে।'

কথা শুনে অবাক হয়ে গেল ওরা। কিন্তু লরা নিজে অবাক হয়েছে ওদের চেয়ে অনেক বেশি, মুখ ফস্‌কে এমন একটা কথা বেরিয়ে যাওয়ায় লজ্জাও পেয়েছে। মেরি চমকে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই, লরা!' এবার ওদের মধ্যে থেকে লাল চুলের একটা ছেলে চেঁচিয়ে উঠল, 'আর তোমরা হলে স্নাইপ! স্নাইপ! স্নাইপ! লম্বা ঠ্যাঙা স্নাইপ!'

লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করল লরার, মনে হলো চট্‌ করে বসে পড়ে লুকায় পা দুটো। ওদের জামা শহরের মেয়েদের জামা থেকে বেশ অনেকটা ছোট। প্লাম ক্রীকে আসার বেশ অনেকদিন আগেই মা বলেছিল ওদের জামাগুলো ছোট হয়ে গেছে। পরিষ্কার বুঝতে পারল লরা, ঠিকই বলেছে ছেলেটা, স্নাইপের পায়ের মতই দেখাচ্ছে ওদের পা।

সব ছেলেরা আঙুল তুলে দেখাচ্ছে আর তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, 'স্নাইপ! স্নাইপ! হো-হো!'

কিন্তু একটা মেয়ে হঠাৎ ঠেলা-ধাক্কা দিতে শুরু করল ছেলেদেরকে, 'অ্যাই, চুপ, চুপ! বড় বেশি গোলমাল শুরু করেছ তোমরা! অ্যাই, স্যান্ডি, একদম চুপ!' এই মেয়েটার মাথাতেও লাল চুল। লরার দিকে এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিল মেয়েটা, 'আমার নাম ক্রিস্টি কেনেডি, আর ওই পাজি ছেলেটা আমার ভাই,

স্যান্ডি। ও কিন্তু খারাপ ছেলে না, তোমাদের সঙ্গে দুষ্টুমি করে ফেলেছে. তোমরা মনে কিছু নিয়ো না। কী নাম তোমার?'

মেয়েটার চোখ ঘন নীল, এতই ঘন যে কালো দেখায়। গালে ফুটকি-ফুটকি দাগ। চুলগুলো শক্ত করে বেনী পাকানো, মাথার সানবনেট পিঠের কাছে ঝুলছে।

'ওই মেয়েটা তোমার বোন?' লরা চেয়ে দেখল কয়েকটা বড় মেয়ে ঘিরে ধরেছে মেরিকে, গল্প করছে ওরা। 'ওর সঙ্গে কথা বলছে, ওরা আমার বোন; বড়জনের নাম নেটি, আর ওই কালো চুল যার ও হচ্ছে ক্যাসি, তার পরেরজন ভাই–ডোনাল্ড, সবশেষে আমি আর স্যান্ডি। তোমরা ভাইবোন কয়জন?'

'তিন,' বলল লরা। 'আমি লরা, ওর নাম মেরি, সবার ছোট ক্যারি। ওর চুলও সোনালী। আমাদের একটা বুলডগ আছে, ওর নাম জ্যাক। প্লাম ক্রীকের ধারে আমাদের বাড়ি। তোমরা কোথায় থাকো?'

'উনি কি তোমাদের বাবা, ওই যে দুটো সুন্দর বাদামি রঙের ঘোড়া যাঁর ওয়্যাগন টানে? দুটোরই লেজ আর কেশর কালো?'

'হ্যাঁ,' বলল লরা, 'ওদের নাম স্যাম আর ডেভিড।'

'উনি তো আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই শহরে আসেন। তার মানে তোমরাও আজ এসেছ ওই পথে। বীড্‌ল্‌দের স্টোর বা পোস্ট-অফিস পাওয়ার আগেই, কামারের দোকানেরও আগে যে বাড়িটা–সেটা আমাদের। মিস্ ইভা বীড্‌ল্ তো আমাদের টীচার। আর ওই যে মেয়েটা আসছে, ওর নাম নেলী ওল্‌সন্।'

নেলী ওলসন মেয়েটা দেখতে ভারি সুন্দর। হলুদ, কোঁকড়া চুল বিছিয়ে রয়েছে গোটা পিঠ জুড়ে, চওড়া নীল রিবন দিয়ে চুলগুলো ঘাড়ের কাছে বাঁধা। নীল ফুল তোলা দামি সাদা কাপড়ের ড্রেস, পায়ে জুতো।

লরা আর মেরির দিকে তাকিয়ে দেখল, তারপর নাকটা কুঁচকে বলে উঠল, 'হুম্! গ্রাম থেকে উঠে এসেছে, একেবারে গাঁইয়া, খ্যাৎ!'

কেউ কিছু বলার আগেই বেল বেজে উঠল। স্কুলহাউসের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তরুণী এক মহিলা বেল বাজিয়ে ডাকছেন সবাইকে। ছেলেমেয়েরা সবাই তাঁকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে যাচ্ছে স্কুলের ভিতর।

মহিলা খুবই সুন্দরী, হাসিটাও খুব মিষ্টি। লরার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'তুমি আজই নতুন এলে, তাই না?'

'জী, ম্যাডাম,' বলল লরা।

'আর এ নিশ্চয়ই তোমার বোন?' বলে মেরির দিকে চেয়ে হাসলেন।

'হ্যাঁ, ম্যা'ম,' বলল মেরি।

'তা হলে এসো আমার সঙ্গে, তোমাদের নাম তুলে নিই খাতায়।'

টীচারের সঙ্গে গিয়ে নাম, পিতার নাম, বয়স, ঠিকানা – সব বলতে হলো ওদের। ওরা কে কোন্ ক্লাসের উপযুক্ত বুঝে নিলেন টীচার, তারপর লরাকে বললেন, 'তুমি একেবারে গোড়া থেকে শুরু করবে।' মেরির দিকে ফিরে বললেন, 'আর তুমি শুরু করবে একটু ওপরের ক্লাস থেকে। স্লেট এনেছ তোমরা?'

স্লেট নেই শুনে বললেন, 'কিন্তু স্লেট তো লাগবে, নইলে লেখা শিখতে পারবে

না। ঠিক আছে, আজকের জন্যে আমারটা ধার দিচ্ছি – কাল দুজন দুটো শ্লেট নিয়ে আসবে, কেমন?'

শুরু হলো ক্লাস। টীচারকে অবাক করে দিল লরা টিফিনের আগেই সিএটি ক্যাট, পিএটি প্যাট শিখে ফেলে। এবার তিনি শিখতে দিলেন আরএটি র‍্যাট, এমএটি ম্যাট। খুব অল্প সময়ে শেখা হয়ে গেল এগুলোও। স্পেলিং-বুকের প্রথম সারির সবকটা শব্দ এখন পড়তে পারে ও গড়গড় করে।

দুপুরে ছাত্র-ছাত্রী, টীচার সবাই বাড়ি চলে গেল ডিনার খেতে। লরা আর মেরি বাইরে নির্জন স্কুলহাউসের ছায়ায় ঘাসের উপর বসে গল্প করতে করতে খেয়ে নিল ওদের টিফিন – মাখন দেয়া রুটি।

'স্কুল ভাল লাগছে আমার,' বলল মেরি।

'আমারও,' বলল লরা। 'তবে হেঁটে আসতে পা ব্যথা হয়ে যায়। আর ওই নেলী মেয়েটাকে আমার একটুও পছন্দ হয়নি, যে আমাদের গাঁইয়া বলছিল।'

'আমরা তো গাঁইয়াই,' বলল মেরি। 'বললে রাগ করার কী আছে?'

'বুঝলাম, কিন্তু নাকটা ও না সিঁটকালেও পারত!' মন্তব্য করল লরা।

## দশ

খালের ধারে অপেক্ষা করছিল জ্যাক ওদের জন্য, ওরা ফিরে আসায় কী যে খুশি হলো! নেচে-কুঁদে যতভাবে সম্ভব আনন্দ প্রকাশ করল সে।

রাতে খেতে বসে স্কুলের সব কথা বলল ওরা বাবা-মাকে। টীচারের শ্লেট নিয়ে লেখার কথা শুনে মাথা নাড়ল বাবা, একটা শ্লেটের জন্য কারও কাছে বাধিত থাকা তার মোটেই পছন্দ নয়।

পরদিন সকালে বেহালার বাক্স থেকে টাকা-পয়সা বের করে গুনল বাবা, তার থেকে একটা রূপালী মুদ্রা বের করে মেরির হাতে দিল শ্লেট কেনার জন্য।

'বহুত মাছ আছে খালে,' বলল বাবা, 'ফসল তোলার আগ পর্যন্ত ঠিকই চালিয়ে নিতে পারব আমরা।'

'চিন্তা কীসের, আলুও উঠবে শীঘ্রি,' বলল মা। পয়সাটা রুমালে বেঁধে মেরির পকেটের ভেতর দিকে ওটা টেঁকে দিল মা, যাতে হারিয়ে না যায়।

সারাটা পথ পকেটটা খামচে ধরে হাঁটল মেরি সাবধানে। শহরে পৌঁছে ধুলো ভরা রাস্তা পার হয়ে মিস্টার ওলসনের স্টোরের ধাপ ডিঙিয়ে দোকানে ঢুকল ওরা। ওই দোকান থেকেই শ্লেট কিনতে বলে দিয়েছে বাবা।

হরেক রকম জিনিসে ঠাসাঠাসি হয়ে রয়েছে দোকানটা। লাঙল, কোদাল, বেলচা থেকে নিয়ে লজেন্স-চকোলেট সব আছে। হাঁ করে চারদিক দেখছে লরা, এমনি সময়ে হঠাৎ পিছনের দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকল নেলী আর তার ছোট ভাই উইলি। লরা আর মেরিকে দেখেই নাক সিঁটকাল নেলী, আর উইলি চেঁচিয়ে উঠল, 'ইয়াহ! ইয়াহ! ঠ্যাং লম্বা স্নাইপ!'

'অ্যাই, উইলি, চুপ করো!' ধমক দিলেন মিস্টার ওলসন। কিন্তু কে শোনে কার কথা, উইলি বলতেই থাকল, 'স্নাইপ! স্নাইপ! হো-হো!'

মেরি আর লরাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এল নেলী, একটা বালতি থেকে এক মুঠো ক্যান্ডি তুলে নিল। দেখাদেখি উইলিও আরেক বালতি থেকে নিল মুঠো ভর্তি করে। তারপর দুজনে একটার পর একটা পুরতে শুরু করল মুখে। মেরি আর লরার সামনে দাঁড়িয়ে গপাগপ খাচ্ছে, কিন্তু একটাও সাধছে না ওদের।

'নেলী, উইলিকে নিয়ে যাও তো এখন এখান থেকে!' বললেন মিস্টার ওলসন।

দরজার কাছে চলে গেল ওরা, কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে না – দেখতে চায় ওরা দুজন কী কেনে। মেরি পয়সা বের করে দিল। একটা স্লেট কাপড় দিয়ে মুছে মেরির হাতে ধরিয়ে দিলেন মিস্টার ওলসন, তারপর বললেন, 'পেন্সিলও একটা দরকার হবে তোমাদের। এই যে ধরো   এক পেনি দাম।'

নেলী দরজার কাছ থেকে বলে উঠল, 'থাকলে তো, আর একটা পয়সাও নেই ওদের কাছে।'

'ঠিক আছে, নিয়ে যাও। তোমার বাবাকে বলবে, আবার শহরে এলে যেন এক পেনি শোধ করে দেন,' পেন্সিলটা এগিয়ে দিলেন মিস্টার ওলসন।

'না,' সাফ মানা করে দিল মেরি। 'আপনাকে ধন্যবাদ,' বলেই ঘুরে হাঁটা ধরল। লরাও চলল ওর পিছন পিছন। দরজার কাছে গিয়ে নেলীর দিকে তাকাল একবার লরা। জিভ বের করে ভেঙাল ওকে নেলী, ক্যান্ডি লেগে লাল আর সবুজ হয়ে রয়েছে ওর জিভটা।

'আশ্চর্য!' বলল মেরি বাইরে বেরিয়ে, 'আমি কোনদিনও এত নীচ হতে পারব না!'

মনে মনে লরা বলল, 'আমি পারব। খালি যদি বাবা-মা বাধা না দিত, তা হলে ওর চেয়ে অনেক নীচ হতে পারতাম আমি।'

সুন্দর, মসৃণ স্লেটটায় হাত বুলিয়ে দেখল ওরা। চমৎকার স্লেট, কিন্তু একটা পেন্সিল না হলেই নয়। বাবার অনেক খরচ হয়ে গেছে, তার কাছে আর চাইতে ইচ্ছে হলো না ওদের। কী করা যায়, ভাবতে ভাবতেই লরার মনে পড়ে গেল ওদের দুজনের কাছে একটা করে ক্রিসমাস পেনি আছে। ইন্ডিয়ানদের এলাকায় যখন ছিল তখন পেয়েছিল বড়দিনে।

ঠিক হলো, মেরির পেনি দিয়েই একটা স্লেট-পেন্সিল কেনা হবে, আর লরার পেনিটার অর্ধেক মালিক হবে মেরি। পরদিনই একটা পেন্সিল কিনে নিল ওরা, কিন্তু ওলসনদের দোকানে আর গেল না, মিস্টার বীডলের দোকান থেকে কিনল সেটা।

দিন দিন আরও বেশি ভাল লাগছে ওদের স্কুলটা। পড়া, লেখা, অঙ্ক – সব কিছুতেই নতুন কিছু শেখার আনন্দ। একটা দিনও কামাই গেল না ওদের, সপ্তাহের পর সপ্তাহ রোদ-হাওয়া তুচ্ছ করে নিয়মিত গেল ওরা স্কুলে; ফলে শিখছেও দ্রুত। তার ওপর জুটে গেছে বেশ কিছু প্রিয় বান্ধবী। বিরতির সময়টা ওদের সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে যায় লরা, মাঠে-ময়দানে দৌড়ে প্রেয়ারির নানা জাতের

ফুল তোলে। তা ছাড়া খেলাধুলো তো আছেই।

স্কুলহাউসের এক ধারে ছেলেরা খেলে, অন্য ধারে খেলে মেয়েরা। মেরির খেলা ভাল লাগে না, ও কয়েকটা বড় মেয়ের সঙ্গে সিঁড়িতে বসে গল্প করে।

প্রতিদিন ওরা "রিং-অ্যারাউন্ড-আ-রোজি" খেলাটা খেলে, কারণ রোজই নেলী ওই খেলাই খেলতে চায়। এক খেলা রোজ খেলতে খেলতে বিরক্ত হয়ে উঠেছে সবাই, কেউ ওকে ঘাঁটাতে চায় না বলে খেলে একই খেলা। হঠাৎ একদিন নেলী কিছু বলার আগেই লরা বলে ফেলল, 'এসো আজ "আঙ্কেল জন" খেলি।'

খুশিতে লাফিয়ে উঠল সবাই। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক বলেছ। এসো–' হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে দাঁড়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই। কিন্তু হঠাৎ লাফিয়ে এসে দুই হাতে লরার চুল চেপে ধরে একটানে ওকে মাটিতে ফেলে দিল নেলী।

'না, খবরদার!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিল-চিৎকার দিল নেলী। 'আমি রিং-অ্যারাউন্ড-আ-রোজিই খেলতে চাই!'

এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড জোরে নেলীকে চড় কষাতে যাচ্ছিল লরা, কিন্তু বাবার কথা মনে আসতেই ঠিক সময়মত সামলে নিল। কারও গায়ে হাত তুলতে বারণ করে দিয়েছে বাবা সেই ছোটবেলায়, উইস্কন্সিনের জঙ্গলে থাকতে।

'এসো, লরা,' বলে ওর হাত ধরল ক্রিস্টি। চোখ-মুখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে, কিচ্ছু ভালমত দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু সামলে নিল লরা নিজেকে। নেলীকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়াল ওরা সবাই। তার কথাই থাকছে দেখে গর্বের হাসি ফুটে উঠল নেলীর মুখে, ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল লরার দিকে। গাইতে শুরু করল ক্রিস্টি, সবাই যোগ দিল তার সঙ্গেঃ

'আঙ্কেল জন তো শয্যাশায়ী,
কী পাঠাব তার জন্যে?'

'না! না!' চেঁচিয়ে উঠল নেলী। 'রিং-অ্যারাউন্ড-আ-রোজি! তা নইলে আমি খেলব না! চললাম আমি!' চক্র ভেঙে বেরিয়ে গেল ও, কিন্তু কেউ ওকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল না।

'ঠিক আছে, এবার তুমি মাঝখানে দাঁড়াও, মড,' বলল ক্রিস্টি। শুরু হলো আবারঃ

'আঙ্কেল জন তো শয্যাশায়ী,
কী পাঠাব তার জন্যে?
একটুকরো পাই, একখণ্ড কেক,
একটা আপেল আর ছোট্ট পিঠে!
কীসে করে পাঠাই বলো?
কেন, সোনার একটা পিরিচে।
কাকে দিয়ে পাঠাই বলো?
কেন, গভর্নরের মেয়েকে দিয়ে।
তাকে যদি বাসায় না পাই
কাকে দিয়ে পাঠাই বলো?'
সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলঃ

'কেন, লরা ইঙ্গল্‌স্‌কে দিয়ে!'

লরা রিঙের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতেই ওকে ঘিরে শুরু হয়ে গেল নাচ। টীচার ঘণ্টা না বাজানো পর্যন্ত চলল খেলা। ক্লাসরুমে বসে নেলী কেঁদে কাটাল সময়টা। ঘোষণা করে দিল, জীবনেও আর কোনদিন কথা বলবে না লরা আর ক্রিস্টির সঙ্গে।

কিন্তু পরের সপ্তাহেই স্কুলের সব মেয়েকে দাওয়াত করল সে তার বাড়িতে শনিবার বিকেলে এক পার্টিতে। ক্রিস্টি আর লরাকে বলল বিশেষ ভাবে।

## এগারো

লরা বা মেরি কখনও কোনও পার্টিতে যায়নি, তাই বুঝতে পারছে না কী ঘটবে ওখানে। মা বলল, কিছু না, বন্ধু-বান্ধব ক'জন একসঙ্গে মিলে মজা করা।

শনিবার সেজেগুজে রওনা হলো দু'বোন। মা বলল ওদেরকে ফুটফুটে সুন্দর লাগছে। আরও বলে দিল, চুলের ফিতে যেন না হারায়, আর শিষ্টাচার যেন ভুলে না যায়।

শহরে পৌঁছে ক্যাসি আর ক্রিস্টির জন্য একটু অপেক্ষা করে ওদের নিয়ে চলে এল ওরা মিস্টার ওলসনের দোকানে। তিনি পিছনের দরজা দেখিয়ে দিলেন ভেতরে যাওয়ার জন্য।

ভেতরে ঢুকেই তাজ্জব হয়ে গেল লরা। দামি আসবাব দিয়ে সাজানো এত সুন্দর ঘর ও জীবনে দেখেনি। হাঁ করে চারদিকে দেখছে অবাক চোখে। মিসেস ওলসনের অভ্যর্থনার জবাবে কোনমতে বলতে পারল 'গুড আফটারনূন, মিসেস ওলসন', 'ইয়েস, ম্যাম', 'নো, ম্যাম'।

মেঝেতে পুরু কার্পেট, খালি পায়ের নীচে নরম ঠেকছে। দেয়ালে আর সিলিঙে সরু কাঠের চিলতে মাঝখানে সরু, লম্বা খাঁজ রেখে পাশাপাশি লাগানো। টেবিল-চেয়ারগুলো এত চমৎকার পালিশ করা যে নিজের চেহারা দেখা যায়। দেয়ালে ঝুলছে রঙীন ছবি।

'যাও, মেয়েরা, সানবনেট খুলে রেখে সোজা বেডরুমে চলে যাও,' বললেন মিসেস ওলসন।

বেডরুমে চমৎকার একটা কাঁচ লাগানো ড্রেসিং টেবিল রয়েছে। তার ওপর সুন্দর করে সাজানো রয়েছে কয়েকটা চিনামাটির পুতুল।

সবাই এসে গেছে দেখে খাবার পরিবেশনের ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মিসেস ওলসন। তারই ফাঁকে হাঁক ছাড়লেন, 'কই, নেলী, ওদেরকে তোমার খেলনাগুলো দেখাও।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল নেলী। 'ওরা উইলির খেলনা নিয়ে খেলুক।'

'আমার ভেলোসিপেড আমি কাউকে চালাতে দেব না!' চেঁচিয়ে উঠল উইলি।

'সেটা না দিলে, কিন্তু তোমার নূহের নৌকা আর টিনের সোলজারগুলো তো দিতে পার।'

আপত্তি করতে যাচ্ছিল উইলি, কিন্তু মিসেস ওলসন দাবড়ি দিতে চুপ করল।

অনেকক্ষণ নেড়েচেড়ে দেখল ওরা খেলনাগুলো, প্রশংসা করল। একটা জাম্পিং জ্যাক দুটো কাঠিতে চাপ দিতে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে সবাইকে খুব হাসাল।

এবার দামি পোশাকের খশখশে আওয়াজ তুলে একটা চিনামাটির পুতুল কোলে নিয়ে ওদের মাঝে এসে দাঁড়াল নেলী রাজকন্যার ভঙ্গিতে। বলল, 'আমার পুতুলটা দেখতে পার।'

বোঝা গেল, ওর পুতুল দেখা যাবে, কিন্তু ছোঁয়া যাবে না।

সবাই তাকিয়ে দেখল, সত্যিই অপূর্ব সুন্দর পুতুলটা। পুতুল যে এত সুন্দর হতে পারে, কল্পনাও করেনি লরা কোনদিন। বলে উঠল, 'কী আশ্চর্য সুন্দর! কী নাম রেখেছ এর, নেলী?'

'ও, এটা? এ তো বহু পুরনো একটা পুতুল। এর আবার নাম কী? আমার মোমের পুতুলটা দেখলে বুঝবে পুতুল কাকে বলে।'

একটা ড্রয়ার টান দিয়ে খুলে হেলা ভরে ছুঁড়ে দিল ও চিনামাটির পুতুলটা, তারপর একটা লম্বা বাক্স বের করল ড্রয়ার থেকে। বাক্সটা বিছানায় রেখে আস্তে করে তুলল ডালা। সবাই ঝুঁকে এল দেখবে বলে।

দম আটকে ফেলল সব কজন। মনে হচ্ছে জ্যান্ত একটা বাচ্চা শুয়ে আছে বাক্সের ভেতর। বালিশে এলিয়ে রয়েছে ওর কোঁকড়া সোনালী চুল। ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক হয়ে রয়েছে, ভেতরে ঝকঝকে সাদা ছোট্ট দুটো দাঁত দেখা যাচ্ছে। চোখদুটো বন্ধ, মনে হলো বাক্সের ভেতর ঘুমাচ্ছিল এতক্ষণ।

নেলী ওকে তুলে নিতেই চোখ মেলল পুতুলটা। বড়বড় নীল চোখ। মনে হলো হাসছে। হঠাৎ দু'হাত সামনে বাড়িয়ে ডেকে উঠল, 'মাম্মা!'

'পেটে চাপ দিলেই ডেকে ওঠে,' বলল নেলী। 'এই দেখো!' বলেই পুতুলটার পেটে জোরে একটা ঘুসি মারল। ডাক শোনা গেল, 'মাম্মা!'

নীল সিল্কের জামা ওটার গায়ে। পেটিকোটে সত্যিকার পেটিকোটের মত লেসের কাজ করা। একটা জাঙ্গিয়াও রয়েছে পরনে, ইচ্ছে করলে খোলা যায়। পায়ে রয়েছে সত্যিকার চামড়ার দুটো নীল ছোট্ট স্লিপার।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে একেবারে হতবাক হয়ে গেছে লরা। এমন পুতুল স্পর্শ করার কথা ওর কল্পনাতেও আসেনি, কিন্তু নিজের অজান্তেই হাতটা সামনে বাড়িয়েছে নীল জামাটা ছুঁয়ে দেখবে বলে।

'খবরদার, ছোঁবে না ওকে!' চিৎকার করে উঠল নেলী। 'আমার পুতুল থেকে হাত দুটো সামলে রাখো, লরা ইঙ্গলস!'

পুতুলটা টেনে নিয়ে ঝট্ করে পিছন ফিরল নেলী, লরাকে আড়াল করে বাক্সে তুলে রাখছে ওটা।

সবাই বোকা বনে গেছে। চোখ-মুখ দিয়ে গরম ভাপ ছুটছে লরার। সরে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। বাক্সটা ড্রয়ারে রেখে ড্রয়ারটা বন্ধ করে দিল নেলী। এরপর নূহের নৌকার প্যাসেঞ্জার আর টিনের সৈন্য-সামন্ত দেখল ওরা

সবাই, কাঠি চেপে লাফ-ঝাঁপ করাল জাম্পিং জ্যাককে।

মিসেস ওলসন লরাকে জিজ্ঞেস করলেন আর সবার সঙ্গে ও খেলছে না কেন। ও বলল, 'বসে থাকতেই ভাল লাগছে, থ্যাঙ্ক ইউ, ম্যাম।'

'তা হলে বই দেখো,' বলে ওর কোলের ওপর দুটো বই ফেললেন মিসেস ওলসন।

বইদুটো উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে পার্টির কথা ভুলেই গেল ও। অনেকক্ষণ পরে খাবার টেবিলে যাওয়ার জন্য ডাক পড়ল। সবচেয়ে বড় কেকের টুকরোটা তুলে নিয়ে কামড় দিল নেলী, আর সবাই অপেক্ষা করল যতক্ষণ না মিসেস ওলসন প্লেটে তুলে এগিয়ে দিলেন।

খাওয়া শেষ হতে উঠে পড়ল সবাই। মা'র শেখানো বুলি আওড়াল লরা। 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মিসেস ওলসন। খুব ভাল লাগল, চমৎকার সময় কাটল আজ পার্টিতে।'

বাইরে বেরিয়েই লরার কানে কানে ক্রিস্টি বলল, 'ছোটলোকটার গালে ঠাস করে একটা চড় লাগিয়ে দিতে পারলে ভাল হতো!'

'দাঁড়াও না,' ফিসফিস করে বলল লরা, 'এর শোধ তুলব আমি, দেখে নিয়ো! তবে মেরিকে আবার বলে দিয়ো না, তা হলে সব ভণ্ডুল করে দেবে।'

বাড়ি ফিরে পার্টির সবকথা বলল ওরা মাকে। মা সব শুনে বলল, 'পার্টিতে শুধু গেলেই হয় না, মানুষকে ডাকতেও হয়। ভাবছি, সপ্তাখানেক পর ওদের সবাইকে এখানে ডাকলে মন্দ হয় না।'

# বারো

'আমার পার্টিতে আসবে তোমরা?' ক্রিস্টি, মড আর নেলী ওলসনকে জিজ্ঞেস করল লরা। মেরি দাওয়াত করল বড় মেয়েদের। সবাই আসতে রাজি হয়ে গেল একবাক্যে।

সেই শনিবার ধুয়ে-মুছে বাড়িঘর ঝকঝকে তকতকে করে ফেলল লরা আর মেরি। মা বানাল ভ্যানিটি কেক।

অনেকগুলো ডিমকে আচ্ছামত ফেঁটে নিয়ে তার সাথে ময়দা ডলে বেশ কিছুক্ষণ রেখে দিল মা, তারপর তাওয়ায় চর্বি গলিয়ে যখন চিড়বিড় আওয়াজ পাওয়া গেল তখন সেই ময়দা একমুঠ একমুঠ করে নিয়ে ছাড়তে থাকল সেই চর্বিতে। এক ডুব দিয়েই ভেসে উঠল ওগুলো। কিছুক্ষণ পর আপনিই উল্টে গিয়ে মধু-রঙা ফোলা পিছন দিকটা উঠে এল ওপর দিকে। এবার অন্য দিকটাও ফুলে উঠে সবটা গোল আকার ধারণ করল। দেখলে মনে হয় ফুলে উঠেছে গর্বে।

ওগুলো একটা একটা করে তুলে কাবার্ডে রেখে দিল মা অতিথিদের জন্য।

লরা, মেরি, মা, ক্যারি – সবাই আজ ভাল পোশাক পরেছে। এমন কী জ্যাককেও চিরুণী দিয়ে সুন্দর করে আঁচড়ে দিয়েছে লরা, মনে হচ্ছে সাদার ওপর

বাদামি রঙের ছোপ দেয়া চমৎকার একটা কোট চাপিয়েছে ও গায়ে।

অতিথিদের আসতে দেখে লরার সঙ্গে জ্যাকও ছুটল খালের পারে ওদের অভ্যর্থনা জানাতে। পানিতে ছপ্-ছপ্ করে পা ফেলে হাসতে হাসতে আসছে সবাই, কিন্তু নেলীর নখরা করা চাই, জুতো আর মোজা খুলে হাতে নিয়েছে, এখন পায়ে নাকি ব্যথা লাগছে। বলল, 'আমি তো আর তোমাদের মত খালিপায়ে চলি না, জুতো-মোজা আছে আমার।'

দারুণ একটা নতুন ড্রেস পরেছে নেলী, চুলে নতুন হেয়ার-রিবন।

'এরই নাম জ্যাক বুঝি?' জিজ্ঞেস করল ক্রিস্টি। ওরা সবাই আদর করল জ্যাককে, জ্যাকও ওদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করল। কিন্তু নেলীর কাছে গিয়ে ভদ্র ভাবে লেজ নাড়তে গিয়ে ধমক খেল, 'দূর! দূর হ! খবরদার, আমার কাপড় ছুঁবি না!'

'জ্যাক তোমার কাপড় নষ্ট করবে না,' বলল লরা।

সবাইকে নিয়ে ফিরে এল লরা, দরজায় দাঁড়িয়ে মা ওদের অভ্যর্থনা জানাল। বড় মেয়েদেরকে মা'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল মেরি, মিষ্টি হেসে ওদের সঙ্গে কথা বলল মা। নেলীকে পরিচয় করিয়ে দিতেই ও বলল, 'গ্রাম্য একটা পার্টিতে যাচ্ছি বলে আমি আমার সেরা ড্রেসটা পরিনি।'

কথাটা শুনেই পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল লরার। কী মনে করেছে ও নিজেকে! মা'র সঙ্গে এভাবে কথা বলে কোন্ সাহসে? দাঁড়াও, তোমাকে মজা দেখাচ্ছি আমি!

মিষ্টি করে হাসল মা, বলল, 'এটাও খুব সুন্দর জামা, নেলী। তুমি আসতে পেরেছ বলে আমি খুব খুশি হয়েছি।'

মা যাই বলুক, এই ব্যবহারের জন্য নেলীকে ক্ষমা করতে পারবে না লরা কোনদিন।

মেয়েরা সবাই খুব পছন্দ করল ওদের বাড়িটা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরদোর, প্রচুর আলো-বাতাস, আর চারপাশে প্রেয়ারি-ঘাসের ফিসফাস ওদের খুব ভাল লেগেছে। মই বেয়ে মেরি আর লরার চিলেকোঠায় উঠে অবাক হয়ে গেল ওরা। ওদের কারও এ-রকম ঘর নেই। কিন্তু নেলী জিজ্ঞেস করল 'তোমার পুতুলগুলো কোথায়?'

লরা কিছুতেই ওর প্রিয় শার্লটকে বের করবে না নেলীর সামনে, পুরনো কাপড়ের তৈরি পুতুল আসলে ওটা, বলল, 'আমি পুতুল নিয়ে খেলি না। আমি খেলা করি খালে।'

সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে গেল লরা বাইরে, জ্যাক সবার আগে। খড়ের গাদার কাছে ওদেরকে মুরগির বাচ্চা দেখাল লরা, মা'র তরি-তরকারীর বাগান দেখাল, বাবার ফসলের মাঠ দেখাল – ঘন সবুজ হয়ে বেড়ে উঠেছে গম আর জইয়ের চারা। তারপর দৌড়ে চলে গেল ওরা প্লাম ক্রীকের ধারে উইলো গাছের নীচে ফুট-ব্রিজের কাছে।

বড় মেয়েদেরকে নিয়ে ধীরে-সুস্থে আসছে মেরি। কিন্তু লরা, ক্রিস্টি, মড আর নেলী হাঁটুর ওপর স্কার্ট তুলে নেমে পড়ল খালের স্বচ্ছ পানিতে। একটু দূর

দিয়ে ছুটে যাচ্ছে মিনোর ঝাঁক। বড় মেয়েরাও নেমে পড়ল পানিতে, ক্যারির হাত ধরে ওকেও হাঁটাচ্ছে পানিতে, মসৃণ, রঙচঙে পাথর পেলে হৈ-চৈ করে কুড়াচ্ছে।

হঠাৎ নেলীকে শায়েস্তা করার বুদ্ধি এসে গেল লরার মাথায়।

বুড়ো কাঁকড়াটার বাসার কাছে নিয়ে এলো ওদেরকে লরা খেলার ছলে। বাচ্চাদের দাপাদাপিতে বিরক্ত হয়ে পাথরের তলায় গিয়ে সেঁধিয়েছে ওটা, কিন্তু তামাটে রঙের একটা দাঁড়া বের করে রেখেছে বাইরে, কেউ বেশি কাছে এলেই চিমটে ধরবে। নেলীকে ঠেলেঠুলে পাথরটার কাছে নিয়ে এলো লরা, দেখল, পাথরের নীচ থেকে একটা চোখ বের করেছে কাঁকড়াটা। এইবার পাথরটার দিকে পানি ছিটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'নেলী! নেলী, সাবধান!'

আবছামত দেখতে পেল নেলী, পানির নীচ দিয়ে বিদঘুটে ভঙ্গিতে কী যেন আসছে তেড়ে।

'পালাও! পালাও!' বলে চিৎকার ছেড়ে ক্রিস্টি আর মডকে ঠেলে ব্রিজের দিকে সরিয়ে আনল লরা। ওদিকে পানির ওপর দিয়ে ছপ্‌ছপ্ করে পা ফেলে দৌড়ে চলে গেছে নেলী প্লাম-ঝাড়ের নীচে শান্ত, ঘোলাটে পানিতে। লরা ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখছে বুড়ো কাঁকড়ার পাথরটার দিকে। দেখা গেল, ধাওয়া করে শত্রুকে ভাগিয়ে দিয়ে খুশি মনে আবার গিয়ে সেঁধিয়েছে ওটা পাথরের নীচে।

'তুমি দাঁড়াও, নেলী,' বলল লরা। 'ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।'

'কী ওটা? জিনিসটা কী? এদিকে আসছে নাকি?' কাঁপা কণ্ঠে জানতে চাইল নেলী। ভয়ে হাত থেকে কাপড় ছেড়ে দিয়েছে ও, কাদাপানিতে ভিজছে নীচের দিকটা।

'বুড়ো একটা কাঁকড়া,' জবাব দিল লরা। 'মোটা-মোটা কাঠি ঘ্যাচ করে দু'টুকরো করে দিতে পারে ওর দাঁড়া দিয়ে। আমাদের পায়ের আঙুল কেটে নেয়া ওর জন্যে কিছুই না।'

'হায় হায়!' ফুঁপিয়ে উঠল নেলী। 'কোথায় ওটা? এদিকে আসছে?'

'তুমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো, আমি দেখছি,' বলে খোঁজাখুঁজির ভান করল লরা কিছুক্ষণ। এদিকে দেখে, ওদিকে দেখে, একবার ফুটব্রিজের দিকে যায়, একবার কিছুটা এগোয় নেলীর দিকে। প্লাম-ঝোপের নীচে কাদাপানিতে দাঁড়িয়ে চোখ বড় বড় করে দেখছে নেলী ওর কার্যকলাপ। অবশেষে লরা বলল, 'এবার চলে এসো। আর ভয় নেই, নিজের গর্তে ঢুকে গেছে ওটা।'

পরিষ্কার পানিতে ফিরে এল নেলী। বলল এই জঘন্য খালে ওর আর খেলার ইচ্ছে নেই। কাদা মাখা স্কার্টটা ভাল পানিতে পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে। কিন্তু পায়ের কাদা তুলতে গিয়েই তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল।

দুই পায়ে কাদাটে রঙের জোঁক লেগে আছে, ধুলেও যাচ্ছে না। একটাকে চিমটি দিয়ে তোলার চেষ্টা করল, পরমুহূর্তে আর এক চিৎকার ছেড়ে উঠে পড়ল ডাঙায়। পারে এসেই শুরু হয়ে গেল ওর লাফঝাঁপ – একবার ডান পায়ে লাফায়, একবার বাম পায়ে, তারপর জোড়াপায়ে লাফায় কিছুক্ষণ, সেই সঙ্গে চলেছে তার তীক্ষ্ণ চিল-চিৎকার।

হাসতে হাসতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল লরা, পেট চেপে ধরে গড়াগড়ি খাচ্ছে

ঘাসের ওপর। হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে চেঁচাল, 'দেখো, দেখো! নাচ দেখো নেলীর!'

মেয়েরা সবাই ছুটে এল। মেরি লরাকে বলল জোঁকগুলো ছাড়িয়ে দিতে। কিন্তু কে শোনে কার কথা, হেসে খুন হয়ে যাচ্ছে লরা, আর গড়াগড়ি দিচ্ছে ঘাসে।

ধমক দিল মেরি, 'লরা! হয় উঠে ওগুলো ছাড়িয়ে দাও, নয়তো চললাম মা'কে বলতে!'

এতক্ষণে উঠে বসল লরা, একটা একটা করে টেনে ছাড়াতে শুরু করল জোঁকগুলো। সবাই দেখার জন্য ঝুঁকে এসেছে। একেকটা জোঁককে ধরে লরা যখন টেনে লম্বা করে, ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে সবাই।

'চুলোয় যাক তোমাদের পার্টি,' ফোঁপাচ্ছে নেলী, 'আমি বাড়ি যাব।'

এত চেঁচামেচি কীসের, জানার জন্য ছুটে এল মা। নেলীকে কাঁদতে বারণ করল, বলল কয়েকটা জোঁক ধরলেই কেঁদে খুন হওয়া ঠিক না। তারপর তাগাদা দিল সবাইকে, 'ঘরে চলে এসো তোমরা, সবকিছু তৈরি।'

টেবিলটা ধবধবে সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা। সুন্দর ফুলদানীতে এক তোড়া ফুল। টেবিলের দু'পাশে বেঞ্চ পাতা। টেবিলের উপর ঝকঝকে টিনের কাপে ঘন, ঠাণ্ডা দুধ, আর মস্ত এক ডিশ ভরা মধু-রঙা ভ্যানিটি কেক।

তৃপ্তির সঙ্গে খেল ওরা ভ্যানিটি কেক যার যত খুশি। আগে কোনদিন ওরা এই জিনিস খায়নি। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল মেয়েরা, মা খুশি হয়ে আরও বেশি করে তুলে দিল ওদের পাতে। পেট ভরে কেক আর মিষ্টি দুধ খেয়ে নেলী ছাড়া সবাই ধন্যবাদ জানাল মাকে। রাগ পড়েনি নেলীর।

লরার অবশ্য তাতে কিছুই এসে যায় না। ফিরে যাবার আগে ওর হাতে চাপ দিল ক্রিস্টি, কানে কানে বলল, 'উচিত শিক্ষা হয়েছে! সত্যিই মজা পেলাম এখানে এসে, লরা।'

মনে মনে লরা বলল, 'আমিও মজা পেয়েছি। খালের ধারে নেলীর ওই নাচ জীবনেও ভুলব না আমি।'

# তেরো

রাতে পাইপ টানতে টানতে বাবা বলল, 'শহরের নতুন গির্জায় কাল থেকে শুরু হবে ধর্মোপদেশ। শুনে দেখা করলাম গিয়ে রেভারেন্ড অ্যালডেনের সঙ্গে। উনি বারবার করে বলে দিলেন যেন অবশ্যই হাজির থাকি কাল। আমি কথা দিয়েছি, যাব আমরা।'

'কতদিন যে চার্চে যাওয়ার সুযোগ হয়নি!' বলল মা।

আর আজ পর্যন্ত গির্জা দেখারও সুযোগ হয়নি লরা আর মেরির।

পরদিন সকালে উঠে তাড়াহুড়ো করে তৈরি হয়ে নিল সবাই। ওয়্যাগনে চড়ে ছুটল ওরা শহরের দিকে। আজ চোখের পলকে পৌঁছে গেল ওরা শহরে। দেখা গেল, দোকান-পাট সব বন্ধ। লোকজন সেজেগুজে চলেছে গির্জার দিকে।

গির্জার মাথায় ছোট্ট একটা ঘর দেখিয়ে লরা জিজ্ঞেস করল, 'কী ওটা?'

'আঙুল দিয়ে দেখাতে হয় না, লরা,' বলল মা। 'ওটা হচ্ছে গির্জার ঘণ্টাঘর।'

গির্জার ভেতরে আশ্চর্য একটা পুত-পবিত্র, গুরু-গম্ভীর ভাব। কালো পোশাক পরা একজন দাড়িওয়ালা, চিকন, লম্বা লোক স্টেজের ওপর একটা ডেস্কের ওপাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বললেন। সবাই চুপচাপ মাথা নিচু করে শুনছে কথাগুলো। লরাও শুনছে। হঠাৎ চমকে উঠল ও কানের কাছে কেউ কথা বলে উঠতে। চেয়ে দেখল সুন্দরী এক মহিলা হাসিমুখে কী যেন বলছেন।

'এসো আমার সঙ্গে,' আবার বললেন মহিলা। 'সানডে-স্কুলে ছোট ছেলেমেয়েদের ক্লাস নেয়া হচ্ছে।'

মা মাথা ঝাঁকাতে বেঞ্চ থেকে নেমে মহিলার সঙ্গে গেল মেরি আর লরা।

এক কোণে কয়েকটা বেঞ্চ টেনে নিয়ে তৈরি হয়েছে স্কুল . লরা দেখল ওদের স্কুলের প্রায় সব ছেলেমেয়েই হাজির ওখানে। সানডে-স্কুলের টীচারের নাম মিসেস টাওয়ার। সবার নাম জেনে নিলেন তিনি, তারপর সবাইকে বাইবেল থেকে একটা করে পংক্তি দিলেন মুখস্থ করবার জন্য। পরের রোববার তাঁকে শোনাতে হবে সেটা।

অনেকক্ষণ পর শেষ হলো রেভারেন্ড অ্যালডেনের বক্তৃতা। উঠে দাঁড়িয়ে সমবেত কণ্ঠে গান গাইল সবাই, তারপর ছুটি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাবা আর মা'র সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন রেভারেন্ড অ্যালডেন, তারপর নিচু হয়ে ঝুঁকে হ্যান্ডশেক করলেন লরার সঙ্গেও। হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'সানডে-স্কুল তোমার ভাল লেগেছে, লরা?'

'হ্যাঁ, সার,' বলল লরা।

'তা হলে প্রত্যেক রোববার এসো তুমি। আসবে তো? আমরা তোমার অপেক্ষায় থাকব।'

মানুষটাকে ভাল লেগে গেল লরার।

বাড়ি ফেরার সময় বাবাও বলল একই কথা, সবাই একসঙ্গে প্রার্থনা করবার মজাই আলাদা, মনটা আনন্দে ভরপুর হয়ে যায়। সমর্থন করল মা।

কয়েক সপ্তাহ যেতেই একদিন ডিনারে বসে বাবা বলল, 'কিন্তু, ক্যারোলিন, একটা জুতো না কিনলে যে আর চলছে না। ভাল ভাল পোশাক পরা লোকেদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে গেলে এগুলো একেবারেই বেমানান। এই দেখো!'

বাবা পা দুটো লম্বা করে দেখাল। বহু মেরামত করা বুটজোড়ার সামনের দিকটায় চামড়া ফেটে হাঁ হয়ে গেছে, লাল মোজা দেখা যাচ্ছে সেই ফাঁক দিয়ে। 'আর মনে হয় সেলাই চলবে না।'

'তোমাকে তো কতবার বললাম এক জোড়া বুট কেনো!' মা বলল। 'তা না করে জামার কাপড় কিনে আনলে আমার জন্যে। অথচ আমার জামার চেয়ে তোমার বুট কেনা অনেক বেশি জরুরী ছিল।'

'নাহ্,' মনস্থির করে ফেলল বাবা, 'আগামী শনিবার শহরে গিয়ে একজোড়া নতুন বুট কিনেই ফেলব। তিন ডলার লাগবে। মনে হয় তেমন অসুবিধা হবে না,'

ফসল কাটার আগ পর্যন্ত কোনমতে চালিয়ে নেয়া যাবে।'

গোটা সপ্তাহ বাবা খড় বানাল। মিস্টার নেলসনের খড়ের কাজে সাহায্য করে বিনিময়ে বাবা তাঁর ঘাস কাটার মেশিনটা ব্যবহার করবার সুযোগ পেয়েছে। প্রচুর ঘাস কাটছে বাবা মেশিনটা দিয়ে, মাঠেই শুকাচ্ছে সে ঘাস। এমন সুন্দর রোদেলা গ্রীষ্মকাল নাকি বাবা জীবনে দেখেনি আর।

শনিবার সকালে ওয়্যাগনে চড়ে লরাও গেল মাঠে, খড়গুলো ঘরে তুলে আনার কাজে সাহায্য করল বাবাকে। গম খেতের দিকে চেয়ে মনটা ভরে গেল বাবার। ওর চেয়েও লম্বা হয়ে উঠেছে গাছগুলো, প্রতিটা গাছের মাথায় গমের শীষ। পেকে আসা গমের ওজনে বাঁকা হয়ে একটু নুয়ে আছে গাছগুলো। মাকে দেখাবার জন্য তিনটে গুচ্ছ কেটে সঙ্গে নিল বাবা।

বাবার খুশি ধরে না। এই ফসল ঘরে তোলার পর কী কী হবে শোনাল মাকে। প্রথম কথা, ঋণমুক্ত হয়ে যাবে ওরা; তারপরেও এত টাকা থাকবে হাতে যে সেটা দিয়ে কী করবে দিশা পাবে না। একটা বাগি কিনবে বাবা, মা'র জন্য সিল্কের ড্রেস কিনবে, সবার জন্য নতুন জুতো কিনবে, আর প্রত্যেক রোববার ওরা সবাই খাবে গরুর তাজা মাংস।

ডিনার শেষ হলে পরিষ্কার একটা শার্ট গায়ে দিয়ে বেহালার বাক্স থেকে তিনটে ডলার বের করল বাবা। শহরে চলেছে নতুন বুট কিনবে বলে। হেঁটেই রওনা দিল বাবা, কারণ, ঘোড়াগুলো সপ্তাহভর খুব খেটেছে বলে আজ ওদের বিশ্রাম দেয়া উচিত।

সন্ধের একটু আগে ফিরে এল বাবা। লরা আর জ্যাক খাল-পারে বুড়ো কাকড়াটাকে জ্বালাতন করায় ব্যস্ত ছিল, বাবাকে টিলা বেয়ে উঠতে দেখে ছুট লাগাল। লরা যখন পৌঁছল, বাবা ততক্ষণে বাড়ির ভেতর চলে গেছে।

আভেন থেকে মা সেঁকা রুটি বের করছিল, বাবার আওয়াজ পেয়ে পিছনে ফিরল।

'তোমার বুট কোথায়, চার্লস?' জিজ্ঞেস করল মা।

'আসলে, ক্যারোলিন,' গাল চুলকাল বাবা, 'দেখা হয়ে গেল ব্রাদার অ্যালডেনের সঙ্গে। উনি বললেন, বেলফ্রিতে বসাবার জন্যে ঘণ্টা কেনার টাকা জোগাড় হচ্ছে না অল্পের জন্যে। শহরের লোক যে যা পেরেছে দিয়েছে, এখন শুধু তিনটে ডলার হলেই বেলটা কেনা যায়। তাই টাকাটা দিয়ে দিলাম।'

মা শুধু বলল, 'আয়-হায়!'

নিজের ছেঁড়া জুতোর দিকে চাইল বাবা। বলল, 'সেলাই করে নেব। কোনমতে কাজ চলার মত করে নেব এটাকেই। আর একটা কথা জানো, আমরা নাকি এখান থেকেও পরিষ্কার শুনতে পাব চার্চের ঘণ্টা।'

চট্ করে ঘুরে গেল মা স্টোভের দিকে। চুপচাপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল লরা, সিঁড়ির ধাপে গিয়ে বসল। গলাটা কেমন যেন ধরে আসছে ওর। ও মনে মনে খুব চেয়েছিল বাবার একজোড়া নতুন বুট হোক।

'কিচ্ছু ভেবো না তুমি, ক্যারোলিন,' লরা শুনতে পেল, বাবা বলছে, 'ফসল তোলার আর বেশি দেরি নেই, এই তো আর কটা দিন।'

# চোদ্দ

এতদিনে পাকতে শুরু করল গম।

প্রত্যেকদিন মাঠে যাচ্ছে বাবা, বাসায় ফিরে খোসা ছাড়ানো গমের নরম দানা মাকে দেখিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করছে ঠিক কবে ছড়াটা পাকবে, কবে ফসল কাটা শুরু করতে পারবে। আবহাওয়া নাকি গম পাকার জন্য আদর্শ।

'ঠিক এরকম চললে আগামী সপ্তাহেই কাটতে শুরু করব, বুঝলে?'

খুব গরম। আকাশের দিকে তাকানো যায় না। গোটা প্রেয়ারি থেকে ধোঁয়ার মত কাঁপা কাঁপা বাষ্প উঠছে। স্কুলে গিরগিটির মত হাঁপায় ছেলেমেয়েরা, কাঠের দেয়াল বেয়ে পাইনের কষ নামে ফোঁটায় ফোঁটায়।

শনিবার আবার বাবার সঙ্গে চলল লরা মাঠের ফসল দেখতে। প্রায় বাবার সমান লম্বা হয়ে গেছে গমের মাথা। ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে দেখাল বাবা। লরা দেখল ফসলের ভারে নত হয়ে আছে গোটা খেত। গোটা মাঠ সবুজ আর সোনালী রঙে মাখামাখি।

দুপুরে ডিনার খেতে গিয়ে মাকে বলল বাবা, এমন ফলন জীবনে দেখেনি। প্রতি একরে কমপক্ষে চল্লিশ বুশেল (এক বুশেল প্রায় পৌনে এক মন) করে হবে, প্রতি বুশেলের দাম এক ডলার। ভাবো একবার! বড়লোক হয়ে যাবে ওরা। অপূর্ব এক দেশ এটা! এখন আর ওদের কোনও চাহিদা অপূর্ণ থাকবে না। শুনে নিশ্চিন্ত হলো লরা, এবার নতুন বুট হবে বাবার।

দরজার দিকে মুখ করে বসে খাচ্ছে লরা, উজ্জ্বল রোদ এসে পড়ছে ঘরে। ওর মনে হলো হঠাৎ একটু যেন কমে গেল আলোর তেজ। চোখদুটো ডলে নিয়ে আবার তাকাল লরা। সত্যিই কমে গেছে আলো। দেখতে দেখতে আরও কমে গেল, তারপর নাই হয়ে গেল।

'ঝড় আসবে মনে হচ্ছে,' বলল মা। 'সূর্য ঢেকে গেছে মেঘে।'

একলাফে উঠে দাঁড়াল বাবা, দ্রুতপায়ে চলল দরজার দিকে। ঝড়ে ফসলের ক্ষতি হতে পারে। আকাশের দিকে চাইল বাবা, তারপর বেরিয়ে গেল বাইরে।

আলোটা কেমন যেন অদ্ভুত, ঝড়ের সময় যেমন হয় ঠিক তেমন নয়। ঝড়ের আগে বাতাসের চাপ বদলে যায়, তারও কোনও আভাস নেই। ভয় পেল লরা, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারল না কেন ভয় লাগছে। খাওয়া ফেলে দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াল বাবার পাশে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বাবা। মা আর মেরিও বেরিয়ে এল বাইরে। বাবা জিজ্ঞেস করল, 'দেখে তোমার কী মনে হচ্ছে , ক্যারোলিন?'

সূর্য ঢাকা পড়েছে ঠিকই, কিন্তু মেঘের মত লাগছে না, মনে হচ্ছে তুষার-কণা আড়াল করেছে ওটাকে। তবে ঠিক তুষার-কণার মতও নয়, তারচেয়ে বড়, সরু আর চকচকে কী যেন। প্রতিটা কণার ফাঁক দিয়ে আলো আসছে।

বাতাস নেই। ঘাসগুলো স্থির। অথচ আকাশ-জোড়া মেঘটা এগিয়ে আসছে দ্রুতবেগে। ঘাড়ের পশম দাঁড়িয়ে গেছে জ্যাকের, হঠাৎ মেঘের দিকে চেয়ে গর্জন ছাড়ল, তারপর অসহায় ভঙ্গিতে ককিয়ে উঠল।

থপ্! কী যেন পড়ল লরার মাথায়, তারপর ছিটকে মাটিতে। চেয়ে দেখল, মস্ত একটা ঘাসফড়িং পড়েছে আকাশ থেকে। এত বড় ঘাসফড়িং জীবনে দেখেনি ও। পরমুহূর্তে শিলাবৃষ্টির মত আকাশ থেকে পড়তে শুরু করল ঘাসফড়িং এখানে, ওখানে, সেখানে।

আকাশ ছেয়ে মেঘের মত উড়ে আসছে ঘাসফড়িঙের বিশাল একটা ঝাঁক। এতই ঘন যে ঢাকা পড়ে গেছে সূর্য। চকচক করছে ওদের সরু, লম্বা পাখা। পাখা ঝাপটানোর ফড়ফড় আওয়াজে ভরে গেছে চারদিক। শিলা-বৃষ্টির শব্দ তুলে পড়ছে ওরা চারপাশে।

হাতের ঝাপটায় ওগুলোকে গা থেকে ফেলার চেষ্টা করল লরা, লম্বা পা দিয়ে গায়ের চামড়া আর কাপড় আঁকড়ে ধরে থাকে ওরা, ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখ দিয়ে দেখে ওকে, মাথাটা নাড়ে এপাশ-ওপাশ। তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে ছুটে চলে গেল মেরি বাড়ির ভিতর।

চারপাশে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল লরা। কোথাও মাটি দেখা যাচ্ছে না, সর্বত্র বিজবিজ করছে কেবল ঘাসফড়িং। ওদের গা না মাড়িয়ে এক পা ফেলার উপায় নেই।

ছুটে গিয়ে জানালাগুলো বন্ধ করছে মা। বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার কাছে, বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে বাইরের দিকে। তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে লরা আর জ্যাক। বাইরে কয়েক ইঞ্চি পুরু হয়ে মাটি ছেয়ে ফেলেছে ঘাসফড়িং। পাখা ভাঁজ করে এখন লাফ দিয়ে পড়ছে যত্র-তত্র। বাড়ির ছাদে শিলাবৃষ্টির মত পড়ছে এখনও। ফড়ফড় শব্দে উড়ছে আকাশ-বাতাস জুড়ে।

এবার আরেক রকম শব্দ এল কানে। খেতে শুরু করেছে ওরা। কচমচ আওয়াজ আসছে এখন বাইরে থেকে। কোটি কোটি ঘাসফড়িং খেতে শুরু করেছে একসঙ্গে। চিবানোর মিলিত শব্দটা ভীতিপ্রদ।

'গম! আমার গম!' হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল বাবা। পিছন-দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল, দৌড়াচ্ছে গমখেতের দিকে।

একটু পরেই ফিরে এল বাবা, ছুটে গিয়ে ঢুকল আস্তাবলে। জানালা দিয়ে লরা দেখল, স্যাম আর ডেভিডকে ওয়্যাগনে জুতছে বাবা। তারপর পাগলের মত গোবরের গাদা থেকে পুরনো পচা খড় তুলতে শুরু করল ওয়্যাগনে পিচফর্ক দিয়ে। আরেকটা পিচফর্ক নিয়ে দৌড়ে গেল মা বাবাকে সাহায্য করতে। ওয়্যাগনভর্তি পচা খড় নিয়ে ছুটল বাবা খেতের দিকে, মা হেঁটে গেল পিছন পিছন।

খেতের চারদিকে পচা খড় ফেলছে বাবা, আর মা নিচু হয়ে ঝুঁকে একের পর এক স্তূপে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে চারদিক। একটু পর মা, বাবা, ওয়্যাগন আর গমখেত অদৃশ্য হয়ে গেল ধোঁয়ায়।

এখনও নামছে ঘাসফড়িং আকাশ থেকে, এখনও আড়াল হয়ে রয়েছে সূর্য,

আঁধার হয়ে আছে চারপাশ।

ফিরে এল মা। কাপড় থেকে ঘাসফড়িং ঝেড়ে নামিয়ে মারল সবকটাকে। খেতের চারদিকে গোবর মেশানো খড়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে মা। ধোঁয়ায় ভরে গেছে চারদিক। এর ফলে হয়তো পালাবে, হয়তো গমের ক্ষতি করতে আর পারবে না ঘাসফড়িং।

বন্ধ ঘরে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে মা, মেরি আর লরা। বাইরে থেকে আসছে অবিরাম চিবানোর শব্দ। ঘাস, পাতা যা পাচ্ছে খাচ্ছে ওরা।

এক সময়ে আঁধার কেটে গেল, জ্বলে উঠল সূর্য। জানালা দিয়ে পরিষ্কার দেখা গেল, গোটা এলাকা ছেয়ে গেছে ঘাসফড়িঙে – সর্বত্র হাঁটছে, লাফাচ্ছে আর উড়ছে ওরা। আর খেয়ে সাফ করছে সবুজ যা পাচ্ছে সব। যতদূর চোখ যায়, প্রেয়ারির লম্বা ঘাস দুলছে, বাঁকা হয়ে নুয়ে পড়ছে, তারপর শুয়ে পড়ছে মাটিতে।

'উহ্, দেখো, দেখো!' চাপা গলায় বলল লরা।

উইলো গাছগুলোর পাতা খেয়ে ফেলছে ওরা। বেশিরভাগ ডালই ন্যাড়া হয়ে গেছে, যেন কঙ্কাল।

'আমি আর দেখতে চাই না,' বলে সরে গেল মেরি জানালা থেকে। লরারও আর দেখবার রুচি নেই, কিন্তু কিছুতেই চোখ সরাতে পারছে না ও।

সবার যখন সর্বনাশ, মুরগি দুটো আর তাদের বাচ্চাগুলোর তখন পৌষ মাস। ওরা মনের আনন্দে একের পর এক গপাগপ খেয়ে চলেছে ঘাসফড়িং, কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টাকে খাবে দিশে পাচ্ছে না।

চোখের নিমেষে খতম হয়ে গেল মা'র সবজি বাগান। আলু, গাজর, বীট, মটর সব খেয়ে নিল ওরা, ভুট্টার লম্বা পাতাগুলো খেয়ে কচি দানাগুলোকেও ছাড়ল না।

বুঝে নিল লরা, কিছুই করবার নেই, এদের ঠেকানোর সাধ্য নেই কারও।

এখনও ধোঁয়ার আড়ালে রয়েছে গমখেত। মাঝে মাঝে বাবাকে দেখা গেল ওর মধ্যে আবছা ভাবে, পাগলের মত ছুটছে এদিক-ওদিক। আগুন উস্কে দিচ্ছে এখানে-ওখানে, ঘন ধোঁয়ার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে আবার।

সন্ধের দিকে গরুটাকে আনার জন্য জুতো আর মোজা পরল লরা, গায়ে-মাথায় শাল জড়িয়ে নিল। পুরনো বাড়ির কাছে খালের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্পট, অনবরত গায়ের চামড়া নাড়াচ্ছে, আর সমানে লেজ ঝাপটে চলেছে। ঘাসে মুখ দিতে পারছে না ফড়িঙের জ্বালায়। পরিষ্কার বুঝতে পারল লরা, সব ঘাস যদি খেয়ে নেয় ঘাসফড়িং তা হলে কী দশা হবে গরুগুলোর। স্রেফ না খেয়ে মারা যাবে ওরা।

ঘাসফড়িং ছেঁকে ধরেছে লরাকে। মুখে আর হাতে যেগুলো বসছে, সেগুলো হাত ঝাপটে দূর করছে, কিন্তু কাপড়ের ওপর বা ভাঁজে যেগুলো ঢুকে পড়ছে সেগুলো নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে যেখানে খুশি। লরা আর স্পটের পায়ের নীচে পড়ে কড়মড় শব্দে ভাঙছে ঘাসফড়িঙের শক্ত শরীর।

মা বেরিয়ে এল দুধ দোয়াতে। সঙ্গে করে বালতি ঢাকার জন্য কাপড় এনেছে মা, কিন্তু ঘাসফড়িং ঠেকানো যাচ্ছে না ও দিয়ে। উড়ে এসে টপাটপ পড়ছে ওরা

যুধে। টিনের কাপ দিয়ে তুলে ছেঁকে দূর করতে হচ্ছে ওদের।

দুধ দুইয়ে ঘরে ফিরল ওরা অসংখ্য ঘাসফড়িং সঙ্গে নিয়ে। খাবার বাড়ছিল মেরি, ঘাসফড়িঙের লাফালাফি দেখে চট্ করে ঢাকল খাবার। প্রত্যেকটা ফড়িংকে মেরে ঝাড়ু দিয়ে নিয়ে ফেলা হলো স্টোভের ভেতর।

ঘরে ফিরল বাবা, কিন্তু সাপার সেরেই বেরিয়ে গেল আবার। গমের কথা কিচ্ছু জিজ্ঞেস করল না মা। শুধু একটু হেসে বলল, 'দুশ্চিন্তা কোরো না, চার্লস। ঈশ্বর আছেন, কোথাও ঠেকিনি আমরা আজ পর্যন্ত।'

এতক্ষণ ধোঁয়ায় থেকে বাবার গলা খশখশে হয়ে গেছে দেখে আর এক কাপ চা খেয়ে যেতে বলল মা। চুপচাপ আর এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়ে গেল বাবা। আর এক ওয়্যাগন গোবর আর পচা খড় নিয়ে চলে গেল মাঠে।

অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না লরার। কানে শুনতে পাচ্ছে ফড়ফড় করে ঘাসফড়িঙের ওড়ার শব্দ, কুট করে কাটা আর চিবানোর শব্দ। মনে হচ্ছে ওর গায়ে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে বুঝি ওগুলো, খামচে ধরছে নখ দিয়ে। অন্ধকারেও ও যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ওদের ঠেলে-বেরিয়ে-আসা চোখ। এক সময় ঘুম এসে রেহাই দিল ওকে ওদের হাত থেকে।

সকালে উঠে লরা দেখল বাবা ফেরেনি রাতে। নাস্তা খেতেও আসেনি। সেই গতরাত থেকে একনাগাড়ে পরিশ্রম করে চলেছে।

গোটা প্রেয়ারির চেহারা বদলে গেছে। বাতাস বইছে ঠিকই, কিন্তু দুলছে না ঘাস; পড়ে আছে মাটিতে, নিস্পন্দ। ক্রীকের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে উইলোগুলোর কঙ্কাল, একটা পাতা নেই কোনও শাখায়। প্লাম ঝাড়েরও ওই একই অবস্থা।

দুপুরবেলা ধোঁয়ার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল বাবা। স্যাম আর ডেভিডকে আস্তাবলে রেখে ধীর পায়ে এসে ঢুকল ঘরে। ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে মুখটা, চোখ দুটো লাল। হ্যাটটা দরজার পিছনে পেরেকে ঝুলিয়ে টেবিলে এসে বসল।

'কোনও লাভ হলো না, ক্যারোলিন,' হতাশ কণ্ঠে বলল বাবা। 'ঠেকাতে পারলাম না। ধোঁয়ায় কিচ্ছু হয় না ওদের। চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা, শেষ করে দিল সব।'

টেবিলের ওপর কনুই রেখে দুই হাতে মুখ ঢাকল বাবা। পাথরের মত স্থির হয়ে গেছে লরা আর মেরি। নরম গলায় মা বলল, 'কিচ্ছু ভেবো না, চার্লস। আগেও অনেক কঠিন সময় কাটিয়ে উঠেছি আমরা।'

টেবিলের নীচে বাবার ছেঁড়া বুটের দিকে চাইল লরা। বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল ওর, মনে হলো কী যেন আটকে আছে গলায়। বাবার বুট কেনা হলো না আর।

মুখ থেকে হাত নামিয়ে ছুরি আর কাঁটা চামচ তুলে নিল বাবা। হাসল, কিন্তু সেই হাসিতে কোন প্রাণ নেই। চোখ দুটো হাসছে না। মাকে বলল, 'ঠিক বলেছ, ক্যারোলিন। সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, এখন যেভাবে হোক চালিয়ে নিতে হবে।'

লরার মনে পড়ল, ঋণ করে তৈরি হয়েছে এ-বাড়ি; গম বিক্রি করে ধার শোধ করার কথা ছিল।

চুপচাপ খেয়ে উঠল সবাই। মেঝেতেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল বাবা। মা তার

মাথার নীচে একটা বালিশ গুঁজে দিল, ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ থাকতে বলল সবাইকে। ক্যারিকে নিয়ে নিজেদের শোবার ঘরে চলে এল ওরা, কাগজের পুতুল দিয়ে ওকে শান্ত করে রাখল।

দিনের পর দিন খেয়ে চলল ঘাসফড়িং। গম, জই সব খেল, সবুজ যা পেল সব খেল, বাগানের তরি-তরকারি খেল, সব ঘাস খেয়ে নিল প্রেয়ারির। ইঁদুর, খরগোশ আর ছোটপাখি পালাল এলাকা ছেড়ে। শুধু রয়ে গেল বড় পাখি আর মোরগ-মুরগি, যারা ঘাসফড়িং খায়।

রোববার হেঁটে সানডে স্কুলে গেল লরা আর মেরি বাবার সঙ্গে। রোদ অতিরিক্ত কড়া দেখে ক্যারিকে নিয়ে মা রয়ে গেল বাড়িতে। শহরে জানা গেল বহু লোক ফিরে যাচ্ছে পুবে। ক্রিস্টি আর ক্যাসিকেও যেতে হচ্ছে। বিদায় জানাল ওরা পরস্পরকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে।

স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল ওদের, কারণ, জুতোগুলো ঠিক রাখতে হবে ওদের শীতে পরবার জন্য। এখন আর খালিপায়ে ঘাসফড়িং মাড়িয়ে স্কুলে যাওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া এমনিতেও শীঘ্রি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে স্কুল। মা বলেছে, গোটা শীতকালটা ওদের ঘরে পড়াবে, আগামী মরশুমে স্কুলে গিয়ে ওরা দেখবে কারও চেয়ে একটুও পিছিয়ে নেই ওরা।

মিস্টার নেলসনের ওখানে কাজ করে বিনিময়ে তাঁর লাঙলটা ব্যবহারের সুযোগ পেল বাবা। আবার ফাঁকা গমখেতে লাঙল টানতে শুরু করল বাবা, আগামী বছর গম বুনতে হবে।

# পনেরো

একদিন খালের পারে ঘুরে বেড়াচ্ছে লরা। পায়ে পায়ে চলেছে ওর সার্বক্ষণিক সঙ্গী জ্যাক। প্লাম ক্রীকের অবস্থা দেখে মনটা একেবারে দমে গেছে ওর। খালটা প্রায় শুকিয়ে গেছে, তির-তির করে বইছে চিকন ধারা। ফুটব্রিজের ওপর উইলোর ছায়া নেই। প্লাম ঝাড়ের নীচে পানি নেই, শুধু কাদা। রাগী, বুড়ো কাঁকড়াটা চলে গেছে কোথায় যেন।

প্রচণ্ড গরম, গা পুড়ে যাচ্ছে রোদে। বিরক্তিকর ফড়ফড় শব্দ তুলে চারপাশে উড়ছে ঘাসফড়িংগুলো।

হঠাৎ লরা লক্ষ করল, টিলার গায়ে লাইন দিয়ে বসে পড়েছে অসংখ্য ঘাসফড়িং, সবকটার লেজ নীচের দিকে দাবানো। আঙুল দিয়ে খোঁচা দিলেও নড়ে না। একটাকে সরিয়ে দেখা গেল, নীচে গর্ত। কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে ধূসর একটা জিনিস বের করে আনল ও গর্ত থেকে। জিনিসটা মোটাসোটা একটা পোকার মত দেখতে, কিন্তু জ্যান্ত মনে হচ্ছে না। জিনিসটা কী বুঝতে পারল না লরা। জ্যাকও একটু শুঁকে দেখল, কিন্তু বুঝতে পারল না কী ওটা।

বাবাকে জিজ্ঞেস করবে মনে করে মাঠের দিকে রওনা হয়েই দেখতে পেল

লরা, লাঙলের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্যাম আর ডেভিড, চাষ বাদ দিয়ে বাবা মাঠের অন্যদিকে নিচু হয়ে ঝুঁকে কী যেন করছে। হঠাৎ সোজা হয়ে ফিরে গেল বাবা লাঙলের কাছে, তারপর লাঙল তুলে ঘোড়াদুটোকে নিয়ে রওনা হলো আস্তাবলের দিকে।

বাবাকে কাজ ফেলে ফিরে আসতে দেখে বুঝে ফেলল লরা, নিশ্চয়ই ভয়ানক কিছু হয়েছে। খিঁচে দৌড় দিল আস্তাবলের দিকে। স্যাম আর ডেভিডকে রেখে বেরিয়ে এল বাবা, লরাকে দেখল, কিন্তু হাসল না। বাবার পিছু নিয়ে ঘরে ফিরে এল লরা।

অসময়ে বাবাকে ফিরতে দেখে চমকে উঠল মা। 'কী হলো? কী হয়েছে, চার্লস?'

'ডিম পাড়ছে ওরা,' বলল বাবা। 'সবখানে। মাটি একেবারে মৌচাকের মত করে ফেলেছে। কোথাও এক ইঞ্চি জায়গা খালি নেই। মাটির নীচে গর্ত খুঁড়ে একটা করে এই জিনিস ঢুকিয়ে দিচ্ছে ভেতরে।' পকেট থেকে কয়েকটা ধূসর রঙের পোকা মত বের করে রাখল টেবিলের ওপর। 'এই দেখো। একটা কেটে দেখেছি, পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশটা করে ডিম রয়েছে এগুলোর প্রত্যেকটায়। সারা দেশে এই একই কারবার।'

ঝপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল মা, হাত দুটো অসহায় ভঙ্গিতে ঝুলে রয়েছে দু'পাশে।

'আগামী বছর শস্যের একটা দানা তুলতে পারবে না কেউ ঘরে,' বলল বাবা। 'ডিম ফুটে বাচ্চাগুলো বেরোবে যখন, সবুজের চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না এদিকের গোটা অঞ্চলে।'

'হায়-হায়, চার্লস! আমাদের কী হবে?' মা'র গলাটা কেঁপে গেল।

বেঞ্চে বসে পড়ল বাবা, মাথা নেড়ে বলল, 'জানি না!'

ওপরে ওঠার গর্তের কাছে মেরির শুকনো মুখটা দেখা গেল। পা টিপে নেমে এল ও মই বেয়ে, দাঁড়াল লরার পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে।

হঠাৎ সিধে হলো বাবা। বেপরোয়া একটা ভঙ্গি ফুটে উঠল চোখে-মুখে। 'তবে একটা কথা জানি, ক্যারোলিন,' বলল বাবা, 'সামান্য ঘাসফড়িং বা পঙ্গপালের কাছে আমরা কিছুতেই হার মানব না! কিছু না কিছু করবই। তুমি দেখে নিয়ো, বালা-মুসিবত সব কাটিয়ে উঠব আমরা, যেমন করে হোক।'

'হ্যাঁ, চার্লস,' বলল মা ম্লান কণ্ঠে।

'কেন পারব না?' নিজেকেই যেন বোঝাচ্ছে বাবা, 'আমরা সুস্থ, মাথার ওপর একটা চাল আছে আমাদের, অন্য অনেকের চেয়ে আমাদের অবস্থা অনেক ভাল। ডিনারটা একটু তাড়াতাড়ি রেডি করে ফেলো, ক্যারোলিন। শহরে যাব আমি। তুমি চিন্তা কোরো না, কিছু না কিছু ব্যবস্থা করেই ফেলব।'

সন্ধের পর ফিরল বাবা। সাপার শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ কিছু জানতে চাইল না। তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া শেষ করে নিজেই মুখ খুলল বাবা।

'শুনছ, ক্যারোলিন?'

'হ্যাঁ, বলো, চার্লস।'

'এখন একমাত্র সমাধান হচ্ছে পুব,' বলল বাবা। 'কাল ভোরে পুবে রওনা দিচ্ছি আমি।'

চমকে উঠল মা। 'এ কী বলছ, চার্লস!'

'ওদিকে এখন ফসল কাটা চলছে,' বলল বাবা। 'ঘাসফড়িংগুলো পুবে একশো মাইল পর্যন্ত ক্ষতি করেছে ফসলের। তার মানে, এর পরের ফসল সব ঠিকই আছে। অর্থাৎ, কাজও আছে। পশ্চিমের সব লোক এখন কাজের আশায় ছুটছে পুবে। যে আগে পৌঁছবে সে আগে কাজ পাবে। দেরি করা ঠিক হবে না।'

'তুমি যদি মনে করো এটাই একমাত্র সমাধান,' মা বলল, 'ঠিক আছে, যাও তা হলে। আমি আর মেয়েরা চালিয়ে নেব এদিকটা। কিন্তু, চার্লস, এতো দূর হাঁটতে হবে তোমাকে, ভাবতেও খারাপ লাগছে।'

'আরে দূর!' মুখ বাঁকাল বাবা, 'এক-দুইশো মাইল একটা দূরত্ব হলো?' কথাটা বলেই নিজের বুটজোড়ার দিকে চোখ গেল বাবার, কিন্তু চট্ করে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, 'দুশো মাইল পথ তো উড়েই চলে যাব!'

বেশ অনেকদিন পর বেহালাটা বের করল বাবা, অনেকক্ষণ বাজাল চোখ বুজে। দুপাশে বসে শুনছে লরা আর মেরি। মা দোল দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে ক্যারিকে। সবার পছন্দের অনেক পরিচিত সুর বাজানোর পর গুনগুন করে গান ধরল:

'ও, সুসানা, আমার জন্যে কেঁদো না!<br>
ক্যালিফোর্নিয়া গেলাম আমি<br>
গুঁড়ো সোনার খোঁজে।'

বেহালাটা যত্নের সঙ্গে বাক্সে তুলে রাখল বাবা। সকাল সকাল উঠতে হবে কাল, তাই শুয়ে পড়ল আজ একটু আগেই।

সকালে নাস্তার পর সবাইকে চুমু দিয়ে বেরিয়ে গেল বাবা। বাড়তি একটা শার্ট আর এক জোড়া মোজা জাম্পারে পেঁচিয়ে ঝুলিয়ে নিয়েছে কাঁধে। প্লাম ক্রীক পার হওয়ার আগে থেমে পিছন ফিরল বাবা, হাত নাড়ল ওদের দিকে। তারপর ঘুরে একটানা হেঁটে চলে গেল চোখের আড়ালে, একবারও পিছনে না তাকিয়ে। লরার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখল জ্যাক বাবার বিদায় নেয়া।

বাবা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরও বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, তারপর যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে সচকিত হয়ে উঠল মা। বলল, 'এখন থেকে আমাদেরই সব সামাল দিতে হবে। মেরি আর লরা, তোমরা গরুটাকে কিছু খাওয়ানোর ব্যবস্থা করো, আমি ঘরদোর সামলাচ্ছি।'

# ষোলো

বাবা না থাকলে মনে হয় কেউ নেই, কিছু নেই – সব ফাঁকা। কবে ফিরবে তা কেউ বলতে পারে না। চোখ বুজলেই লরা দেখতে পায়, ছেঁড়া জুতো পায়ে বাবা খালি হাঁটছে তো হাঁটছেই, চলে যাচ্ছে আরও, আরও দূরে।

জ্যাকের বয়স হয়েছে, নাকটা দিন দিন ধূসর হয়ে যাচ্ছে। প্রায়ই বাবা যে পথে চলে গেছে সেদিকে চেয়ে থাকে ও, লম্বা করে নিঃশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়ে অপেক্ষার ভঙ্গিতে। কিন্তু ওকে দেখে মনে হয়, ও জানে, অপেক্ষা করে লাভ নেই, আসবে না বাবা।

দিন দিন বাড়ছে গরম। ঘাসহীন ধু-ধু প্রেয়ারির কোথাও এতটুকু ছায়া নেই। প্রায়ই দেখা যায়, একরাশ ধুলো পাক খেতে খেতে মাটিতে লেজ আছড়ে ছুটে যাচ্ছে ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে। লরা শুনেছে, ওগুলো নাকি ধূলি-পিশাচ; কিন্তু মা বলে গরম বাতাসের ঢেউ তৈরি করে ওদেরকে।

খাল শুকিয়ে গেছে। পানি আনতে যেতে হয় পুরনো বাড়ির কাছে সেই ঝর্নায়। সন্ধ্যায় একটা বালতি বসিয়ে রেখে আসে মা, সারারাত ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ে ভরে থাকে ওটা; সকালে ওটা আনার সময় আর একটা বালতি বসিয়ে দিয়ে আসে ঝর্নার নীচে।

চাহিদা মত ঘাস বা খড় না পেয়ে শুকিয়ে হাড়-জিরজিরে হয়ে গেছে স্পট, স্যাম আর ডেভিড। উইলোর শিকড়-বাকড় আর প্লামের ডাল চিবিয়ে চিবিয়ে তেতো হয়ে গেছে স্পটের দুধ, চোখ বসে গেছে গর্তে।

শনিবার মিস্টার নেলসনের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিল লরা বাবার কোনও চিঠি এসেছে কি না। না, আসেনি। মিসেস নেলসন বললেন, আগামী শনিবার আবার পোস্ট অফিসে খোঁজ নেবেন মিস্টার নেলসন।

'থ্যাঙ্ক ইউ, ম্যাম,' বলে ফিরে এল লরা। কিছুদূর প্রায় দৌড়ে এল ও, ফুটব্রিজের কাছে এসে কমে গেল হাঁটার গতি, যখন টিলা বেয়ে উঠছে তখন আর চলছে না পা।

মা বলল, 'তাতে কী হয়েছে, আগামী শনিবার নাগাদ এসে যাবে চিঠি

কিন্তু পরের শনিবারেও এল না।

সানডে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে ওদের। ক্যারি হাঁটতে পারবে না অতদূর, আর ওকে কোলে নিয়ে মার পক্ষে এই গরমে অতদূর হাঁটা সম্ভব নয়। তা ছাড়া শীতের জন্য ঠিক রাখতে হবে মেরি আর লরার জুতো, এখন প'রে প'রে ক্ষয় করে ফেললে চলবে না। তাই রোববার ভাল জামাকাপড় প'রে মাকে শোনায় ওরা বাইবেলের মুখস্থ করা পংক্তি। প্রচণ্ড গরম পড়ছে গত কয়েকদিন।

গরমে যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত-প্রায়, আর সহ্য করা যাচ্ছে না, বাসায় বসে হাপুস-হুপুস হাঁপাচ্ছে ওরা চারজন; ঠিক তখুনি মেঘ করল আকাশে, ঠাণ্ডা হাওয়া

রইল কিছুক্ষণ, তারপর শুরু হলো বৃষ্টি।

সবাই খুশি, তাই দেখে জ্যাকও বাচ্চা কুকুরের মত লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আনন্দ প্রকাশ করল। ঠাণ্ডা বাতাস আর ভেজা মাটির গন্ধে যেন প্রাণ ফিরে পেল ওরা।

পরদিন আবার সেই গরম। কিন্তু বিকেলের দিকে দেখা গেল গোটা প্রেয়ারি জুড়ে অসংখ্য চিকন ঘাসের মাথা গজিয়ে উঠেছে। অল্প কয়েকদিনেই সবুজের আভাস দেখা দিল, প্রেয়ারির তামাটে মাটি ঢেকে দিচ্ছে সবুজের সমারোহ।

স্পটের কাছাকাছি স্যাম আর ডেভিডকেও মাঠে নিয়ে গিয়ে খুঁটিতে বেঁধে দিল লরা। অল্পদিনেই তরতাজা হয়ে উঠল ওরা আবার। দুধ বেড়ে গেল স্পটের, তেতো ভাবটাও দূর হয়ে গেল।

উইলো আর প্লাম গাছও কচি পাতা ছাড়ল।

সবই ভাল, শুধু বাবা যদি থাকত এখন!

সারাদিন খালি বাবার কথা মনে হয় লরার, আর রাতে যখন প্রেয়ারির ওপর দিয়ে উদাস হাওয়া বয়ে যায় তখন হু-হু করে বুকের ভেতরটা, ফাঁকা লাগে সবকিছু।

প্রথম প্রথম কথা বলে মনটা হালকা করার চেষ্টা করেছে লরা, হিসেব করে বের করতে চেয়েছে আজ কতদূর হাঁটল বাবা। মনে মনে প্রার্থনা করেছে, পুরনো, ছেঁড়া জুতো জোড়া যেন টিকে যায়। কল্পনায় বোঝার চেষ্টা করেছে আজ ঠিক কোথায় কীভাবে রাত কাটাচ্ছে বাবা, সবাইকে বলেছে নিজের হিসেব আর কল্পনার কথা। কিন্তু কদিন যেতে বুঝে ফেলেছে ও মার কাছে এসব বলা ঠিক হচ্ছে না। সারাদিনই বাবার কথা ভাবে মা, কিন্তু মনের কথা প্রকাশ করতে পছন্দ করে না। শুধু শনিবার এলে মনে করিয়ে দেয়, 'আজ শনিবার!'

সারাটা দিন আশায় আশায় থাকে ওরা, নিশ্চয়ই আজ শহরে গিয়ে বাবার চিঠি পেয়ে যাবেন মিস্টার নেলসন পোস্ট অফিসে। লরা আর জ্যাক প্রেয়ারির ওপর দিয়ে বহুদূর গিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে মিস্টার নেলসনের ওয়্যাগন ফেরার অপেক্ষায়।

আসে না বাবার চিঠি। মা বলে, 'চিন্তা কোরো না, একটা চিঠি আসবেই।'

রাতে আর নিজেকে সামলাতে পারে না লরা, জিজ্ঞেস করে বসে, 'আচ্ছা, মা, সত্যিই বাবা ফিরে আসবে, তাই না?'

'নিশ্চয়ই আসবে।' মা এত জোরের সঙ্গে বলে যে লরা আর মেরি বুঝে ফেলে, মা-ও ভয় পাচ্ছে, কিছু একটা হয়েছে বাবার।

কল্পনার সাহায্য পেলে দুশ্চিন্তা বেড়ে যায় শতগুণ। হয়তো বুটটা ছিঁড়ে খসে গেছে পা থেকে, খালিপায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে বাবা। হয়তো শিং মেরেছে কোনও গরুর পাল। হয়তো, কে জানে, একটা ট্রেন ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেলে দিয়েছে। বন্দুক তো নেয়নি, নেকড়ের পালের মধ্যে যদি পড়ে যায়! হয়তো গভীর বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, গাছের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ল একটা প্যানথার!

সম্ভাবনার কোনও শেষ নেই, বিপদের আশঙ্কাও তাই বেড়েই চলল লরার।

পরের শনিবার বিকেলে মিস্টার নেলসনের সঙ্গে দেখা করবে বলে রওনা দিতে যাচ্ছে লরা আর জ্যাক, এমন সময় দেখতে পেল, ফুটব্রিজ পার হয়ে

এদিকে আসছেন তিনি। হাতে সাদা মত কী যেন। ঢাল বেয়ে উড়ে নেমে গেল লরা। চিঠি এসেছে!

'ধন্যবাদ! আপনাকে অনেক ধন্যবাদ!' বলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল লরা বাড়ির দিকে। ক্যারির মুখ ধোয়াচ্ছিল, চিঠিটা নিল মা ভেজা হাতে, প্রবল বেগে কাঁপছে হাতটা। ধপ্ করে বসে পড়ল মেঝেতে।

'তোমার বাবার চিঠি,' সহজ ভঙ্গিতে বলতে চাইল মা, কিন্তু গলাটা কাঁপছে। হাতটাও এত জোরে কাঁপছে যে চুল থেকে কাঁটা খুলতে পারছে না। একটা কাঁটা খুলে খাম ছিঁড়ে চিঠি বের করল মা। ভাঁজ খুলতেই দেখা গেল ডলারের একটা নোট।

'বাবা ভালই আছে,' বলল মা। তারপর চট্ করে অ্যাপ্রন দিয়ে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে শুরু করল।

যখন কাপড়টা সরাল, তখন মা'র ভেজা চোখদুটো হাসছে খুশিতে। লরা আর মেরিকে চিঠিটা পড়ে শোনাতে গিয়ে মা কতবার যে চোখ মুছল তার ঠিক নেই।

তিনশো মাইল হাঁটার পর কাজ পেয়েছে বাবা। এখন গম খেতগুলোয় কাজ করছে, মজুরি দিনে এক ডলার। মাকে পাঁচ ডলার পাঠিয়েছে বাবা, তিন ডলার নিজে রেখেছে বুট কিনবে বলে। যেখানে কাজ করছে, সেখানে চমৎকার ফলন হয়েছে গমের, কাজ আছে যথেষ্ট। মা আর মেয়েদের যদি তেমন কোনও অসুবিধে না থাকে তা হলে যতদিন কাজ থাকে ততদিন ওখানেই থাকবে বাবা।

নিরাপদে আছে বাবা, নতুন বুট কিনেছে এতদিনে; খবর জেনে কী যে খুশি লাগল লরার!

## সতেরো

ঠাণ্ডা হয়ে আসছে আবহাওয়া। ইতোমধ্যে অসংখ্য ঘাসফড়িং ছোট ছোট ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলে গেছে, কিন্তু আরও কোটি কোটি রয়ে গেছে চারপাশে। সকালে ওরা নড়তে পারে না ঠাণ্ডায়।

একদিন সকালে উঠে দেখা গেল তুষার পড়েছে পুরু হয়ে। তার নীচে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্থির হয়ে মরে রয়েছে লক্ষ লক্ষ ঘাসফড়িং। কয়েকদিনের মধ্যেই মরে সাফ হয়ে গেল ওরা।

শীতের আর দেরি নেই, কিন্তু বাবা এল না এখনও। ঠাণ্ডা বাতাসের বেগ বেড়েছে, এখন আর ঝিরঝির করে বয় না বাতাস; সোঁ-সোঁ আওয়াজ আসে, মনে হয় বিলাপ করছে কেউ পুত্রশোকে। বৃষ্টি রূপান্তরিত হয়েছে তুষারে, ঝরছে তো ঝরছেই – তবু বাবা এল না।

বাবার কেটে রাখা কাঠ শেষ হয়ে গেছে। এখন কুড়িয়ে-বাড়িয়ে কাঠ সংগ্রহ করতে হচ্ছে লরা আর মেরিকে। হাত-পা জমে যেতে চায় ঠাণ্ডায়।

একদিন বিকেলে ছোট্ট মেয়ে অ্যানাকে নিয়ে বেড়াতে এলেন মিসেস

নেলসন। হাসি-খুশি মোটা-সোটা মানুষ মিসেস নেলসন, লরার খুব পছন্দ তাঁকে, কিন্তু অ্যানাকে ওর একটুও ভাল লাগে না। একটা ইংরেজি শব্দ বোঝে না মেয়েটা, আর লরা বা মেরি একটা শব্দও বোঝে না ওর নরওয়েজিয়ান ভাষার। গরমের সময় অ্যানা এলেই ওরা দু'বোন পালিয়ে যায় বাড়ি ছেড়ে, কিন্তু এখন শীতের সময় ঠাণ্ডায় যাবে কোথায়? তা ছাড়া মা বলে দিয়েছে ওদের পুতুলগুলো নিয়ে অ্যানার সঙ্গে খেলতে।

কাগজের পুতুলগুলো নিয়ে খেলতে বসল ওরা। ক্যারির চেয়ে সামান্য বড় অ্যানা, কাগজের পুতুল দেখে হেসে উঠল. বাক্সে হাত ঢুকিয়ে একটা পুতুল তুলে নিয়ে একটানে ফড়াৎ করে ছিঁড়ে ফেলল।

মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল লরা আর মেরির মুখ। ক্যারিও চোখ বড় করে তাকিয়ে রয়েছে। মিসেস নেলসন আর মা কথা বলতে ব্যস্ত, তাদের চোখেই পড়ল না ঘটনাটা। বাক্সের ডালা বন্ধ করে দিল লরা চট্ করে, কিন্তু একটু পরেই ছেঁড়া পুতুলটা ফেলে দিয়ে আরেকটার জন্য হাত বাড়াল অ্যানা। কী করবে এখন, দিশে পেল না ওরা।

যা চায় তা না পেলেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ওঠে অ্যানা। ওকে কাঁদালে রেগে যাবে মা, ওদিকে পুতুলও দেয়া যায় না ওর হাতে, দিলেই ছিঁড়ে ফেলবে। ফিস-ফিস করে মেরি বলল, 'শার্লোটকে নিয়ে এসো। শার্লোটকে টেনে ছিঁড়তে পারবে না।'

মেরি অ্যানাকে সামলানোর ভার নিল, আর লরা মই বেয়ে ওপরে উঠে গিয়ে শার্লোটের বাক্স খুলল। লাল ঠোঁটে হাসি নিয়ে শুয়ে আছে শার্লোট, বোতামের চোখ দুটোয় উজ্জ্বল দৃষ্টি। সাবধানে কোলে তুলে নিয়ে কালো সুতোর তৈরি কোঁকড়া চুলগুলো আর জামাটা ঠিকঠাক করল। পা নেই শার্লোটের, কিন্তু তাতে কী, সেজন্য ওর প্রতি লরার ভালবাসায় কোন কমতি নেই। উইস্কন্সিনের বিগ উড্সে থাকতে বড়দিনের উপহার পেয়েছিল ও এই প্রিয় পুতুল।

শার্লোটকে নিয়ে মই বেয়ে নীচে নেমে এল লরা। পুতুল দেখেই ওটা নেয়ার জন্য চেঁচিয়ে উঠল অ্যানা। সাবধানে, যত্নের সাথে শার্লোটকে ওর কোলে তুলে দিল লরা। বুকের সঙ্গে চেপে ধরল অ্যানা শার্লোটকে। এতে অবশ্য তেমন ক্ষতি হবে না শার্লোটের। কিন্তু অ্যানা যখন ওর বোতাম-চোখ উপড়ে তোলার চেষ্টা শুরু করল তখন অধীর উৎকণ্ঠায় শক্ত হয়ে গেল লরার হাত-পা। এবার কালো সুতোর কোঁকড়া চুলগুলো টেনে ছিঁড়ে আনার চেষ্টা করছে মেয়েটা, মাটিতে আছড়াচ্ছে শার্লোটকে। শোকে বুকটা ভেঙে আসতে চাইলেও নিজেকে প্রবোধ দিল লরা, অ্যানা চলে গেলে শার্লোটের চুল আর জামাকাপড় ঠিকঠাক করে নেবে ও।

দীর্ঘ যন্ত্রণার অবসান ঘটতে যাচ্ছে দেখে হাঁপ ছাড়ল লরা। উঠে দাঁড়িয়েছেন মিসেস নেলসন, অ্যানাকে নিয়ে চলে যাবেন এখন। ঠিক তখনই ঘটল আসল বিপদটা। অ্যানা শার্লোটকে ছাড়বে না।

ও হয়তো মনে করেছে ওকে দিয়ে দেয়া হয়েছে পুতুলটা। হয়তো ওর মাকে বলেছে ওকে ওটা দিয়েছে লরা, মিসেস নেলসন মিষ্টি করে হাসলেন লরার দিকে ফিরে। শার্লোটকে নেয়ার জন্য হাত বাড়ালো লরা, তাই দেখে গলা ফাটিয়ে কেঁদে

উঠল অ্যানা।

'আমার পুতুল দাও!' বলল লরা। কিন্তু শার্লোটকে বুকের সাথে চেপে ধরে পা ছুঁড়তে শুরু করল অ্যানা, তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।

মাকে নালিশ করল লরা, 'মা, আমার শার্লোটকে নিয়ে যাচ্ছে!'

'ছি, লরা,' মা উল্টে বকল ওকে, 'অ্যানা বাচ্চা মেয়ে, তার ওপর মেহমান। তা ছাড়া পুতুল খেলার বয়স তোমার পার হয়ে গেছে। ওকে দিয়ে দাও ওটা।'

মা'র কথা শুনতেই হবে। জানালায় দাঁড়িয়ে দেখল লরা, নাচতে নাচতে নেমে যাচ্ছে অ্যানা ঢাল বেয়ে, আর শার্লোটের একটা হাত ধরে পাঁই-পাঁই করে ঘোরাচ্ছে।

'তোমার লজ্জা হওয়া উচিত, লরা,' আবার বলল মা। 'এত বড় একটা মেয়ে, ছেঁড়া কাপড়ের একখানা পুতুলের জন্যে শোক করছ! ছি ছি ছি ছি! ওই পুতুল দিয়ে কি হবে – কোনদিন তো ওটা নিয়ে খেলতে দেখলাম না। দিতে শেখো, মানুষকে কিছু দিতে শেখো।'

চুপচাপ মই বেয়ে নিজেদের ঘরে চলে এল লরা, জানালার ধারে রাখা বাক্সের ওপর বসে চেয়ে রইল বাইরের দিকে। চোখে পানি নেই, কিন্তু ভেতরটা কাঁদছে ওর। শার্লোট নেই! বাবা নেই, শার্লোটের বাক্সও খালি! বাইরে বাতাসের শোঁ-শোঁ আওয়াজ। সব যেন খালি, কোথাও কিচ্ছু নেই।

ওকে একদম চুপ হয়ে যেতে দেখে রাতে মা বলল, 'আমি দুঃখিত, লরা। ওটা যে তোমার এত প্রিয়, আগে জানলে কিছুতেই ওকে দিতাম না।'

টপ্ করে একফোঁটা পানি পড়ল এতক্ষণে। দ্বিতীয় ফোঁটা ঝরার আগেই চট্ করে মুছে ফেলল লরা। মা দেখল সবই। একহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ছি, মা, কাঁদে না। ভেবে দেখো, তোমার পুতুলটা পেয়ে কত খুশি হয়েছে অ্যানা!'

পরদিন সকালে ওয়্যাগন ভরে বাবার কেটে রাখা গাছের গুঁড়ি নিয়ে এলেন মিস্টার নেলসন, সারা দিন ধরে সেই কাঠ ফেড়ে স্টোভে ব্যবহারের উপযোগী করে দিয়ে তারপর গেলেন।

'দেখলে, আমাদের জন্যে কত কষ্ট করলেন মিস্টার নেলসন?' বলল মা। 'এখন পুতুলটা অ্যানাকে দিয়েছ বলে ভাল লাগছে না তোমার, লরা?'

'না, মা।' সত্যি কথাটাই বলল লরা। বাবা আর শার্লোটের জন্য সারাক্ষণ কাঁদছে ওর মনটা।

বাবার কাছ থেকে আর কোনও চিঠি এল না। আবার কদিন বৃষ্টি হলো খুব, মাটির ওপর বরফ হয়ে জমে গেল বৃষ্টির পানি। মা বলল, খুব সম্ভব বাড়ি ফিরে আসছে বাবা, তাই আর চিঠি দিচ্ছে না। রাতে শুয়ে শুয়ে মনের চোখে দেখতে চেষ্টা করে লরা কোথায় কী করছে বাবা এখন। কদিন ধরে তুষার পড়ছে, সকালে কাঠ আনতে গিয়ে দেখা যায় কাঠের স্তূপ ঢাকা পড়েছে তুষারে। লরা ভাবে, বেশি শীত পড়ে গেলে গরম জামা ছাড়া বাবা থাকবে কী করে!

প্রত্যেক শনিবার বিকেলে জুতো-মোজা প'রে, মা'র বড় শালটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে নেলসনদের বাড়িতে যায় লরা, দরজায় টোকা দিয়ে জানতে চায় বাবার চিঠি এসেছে কি না। ঘরে ঢোকে না লরা, যদি শার্লোটের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! দরজা

থেকেই খবর নিয়ে মিসেস নেলসনকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে আসে।

এক ঝড়বৃষ্টির দিনে নেলসনদের গোলাঘরের সামনে দেখতে পেল ও জিনিসটা। থমকে দাঁড়াল লরা। একটা গর্ত মত জায়গায় তুষারের নীচে চিৎ হয়ে পড়ে আছে শার্লোট। অ্যানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে শার্লোটকে।

দরজায় টোকা দিতে মিসেস নেলসন জানালেন, এত খারাপ আবহাওয়ায় আজ আর মিস্টার নেলসন শহরে যাননি, আগামী সপ্তাহে নিশ্চয়ই যাবেন। 'থ্যাঙ্ক ইউ, ম্যাম,' বলেই ঘুরে দাঁড়াল লরা।

শিলার মত বৃষ্টি পড়ছে শার্লোটের গায়ে। ওর সুন্দর কোঁকড়া চুলগুলো টেনে ছেঁড়ার চেষ্টা করেছে অ্যানা, কিছু উঠে গেছে, আর কিছু আলগা হয়ে ঝুলছে এখনও। হাসি হাসি ঠোঁটের কাছটা ছেঁড়া, একটা চোখ নেই। কিন্তু চেনা যাচ্ছে শার্লোটকে।

চট্ করে তুলে নিল ওকে লরা, লুকিয়ে ফেলল শালের নীচে, তারপর ঝড়-বৃষ্টির মধ্য দিয়ে দৌড়ে ফিরে এল বাড়িতে। ওর চেহারা দেখে চমকে উঠল মা।

'কী হয়েছে, লরা! কী হয়েছে, বলো!'

'শহরে আজ যাননি মিস্টার নেলসন,' বলল লরা। 'কিন্তু মা, দেখো, চেয়ে দেখো!'

'কী ওটা?' চোখ দুটো কপালে উঠল মা'র।

'আমার শার্লোট,' ফুঁপিয়ে উঠল লরা। 'দেখো, মা, কী করেছে! আমি নিয়ে এসেছি। ওদের না বলেই। উঠানে পড়ে ছিল, একটা গর্তে। মা, আমি—'

'শান্ত হও, লরা, এত উত্তেজিত হয়ো না,' বলল মা। 'এদিকে এসো তো, লক্ষ্মী, সব খুলে বলো আমাকে।' টেনে নিয়ে ওকে কোলে বসাল মা।

সব শুনে মা বলল শার্লোটকে নিয়ে এসে কোনও অন্যায় করেনি লরা। শার্লোটের জন্য এটা ছিল একটা ভয়ানক বাজে অভিজ্ঞতা, লরা ওকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে। মা কথা দিল, আবার ওকে মেরামত করে একদম নতুনের মত বানিয়ে দেবে।

কথা রাখল মা। সেইদিনই শার্লোটকে সাবান দিয়ে ধুয়ে, আচ্ছামত নিঙড়ে পানি বের করে স্টোভে সেঁকে শুকানো হলো। নতুন একটা গোলাপি মুখ, কুচকুচে কালো বোতামের দুটো চোখ আর নীল ফিতে দিয়ে বাঁধা তামাটে-সোনালী চুল লাগিয়ে দিতেই আবার নতুন হয়ে গেল পুতুলটা। একেবারে লরার মনের মতন। এতদিন খালি পড়ে থাকা বাক্সটাও যেন হেসে উঠল শার্লোটকে ফিরে পেয়ে।

মেরির পাশে গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়ল লরা। বাইরে জোর হাওয়া, বৃষ্টির সঙ্গে শিলও পড়ছে বাড়ির ছাদে। এখন শুধু বাবা ফিরে এলেই পুরোপুরি শান্তি ফিরে আসবে ওর মনে।

গভীর রাতে প্রচণ্ড এক শব্দে লাফিয়ে বিছানায় উঠে বসল লরা আর মেরি। ভয় পেয়েছে। নীচ থেকে ঝন্‌ঝনে একটা জোরাল কণ্ঠ ভেসে এল, 'এহ্-হে! কাঠগুলো পড়ে গেল হাত থেকে!'

হেসে উঠল মা। 'পড়ে গেল, না ইচ্ছে করেই ফেললে মেয়েদের জাগাবার জন্যে?'

হা-হা করে হেসে উঠল বাবা।

প্রচণ্ড এক ইন্ডিয়ান রণ-হুঙ্কার ছেড়ে খাট থেকে নামল লরা, এক দৌড়ে মই বেয়ে নেমে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবার বুকে। একই দশা মেরিরও, হাসি গিয়ে ঠেকেছে দুই কানে। দুইহাতে দুজনকে জড়িয়ে ধরে আছে বাবা, একই সঙ্গে কথা বলছে সবাই। খুশিতে দম আটকে আসতে চাইছে লরার। জ্যাকও লাফাচ্ছে পাগলের মত। ক্যারি বিছানায় উঠে বসে বড় বড় চোখ করে দেখছে বাবাকে।

ঝিকমিক করছে বাবার নীল চোখ। খাড়া হয়ে আছে চুলগুলো। পায়ে নতুন বুট। পুব মিনেসোটা থেকে দুইশো মাইল হেঁটে এসেছে বাবা। রাতেই পৌঁছেছে শহরে, কিন্তু ওখানে রাত না কাটিয়ে ঝড়-বৃষ্টি তুচ্ছ করে চলে এসেছে বাড়িতে।

নাস্তার টেবিলে আবার আগের মত সবাই বসল একসঙ্গে।

'শেষদিকে উদয়াস্ত এত পরিশ্রম করতে হতো যে চিঠি লেখারও সময় পাইনি,' বলল বাবা। 'যখন ছাড়া পেলাম তখন আর চিঠি লিখে সময় নষ্ট না করে ছুটলাম বাড়ির দিকে। কারও জন্যে কিচ্ছু আনতে পারিনি। তবে টাকা এনেছি, উপহার কেনা যাবে যখন খুশি।'

'সুস্থ অবস্থায় তুমি ফিরে এসেছ, এটাই আমাদের জন্যে সবচেয়ে বড় উপহার, চার্লস,' বলল মা।

নাস্তার পর বাবা চলল গরু-ঘোড়াগুলো কে কেমন আছে দেখতে। সবাই চলল সঙ্গে, জ্যাক তো একেবারে পায়ে পায়ে। সব ঠিকঠাক আছে দেখে খুশি হলো বাবা। হঠাৎ ঘুরে লরাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার পায়ে কী হয়েছে লরা?'

'জুতো পায়ে দিলে ব্যথা লাগে,' জবাব দিল লরা।

বাসায় ফিরে লরার জুতোটা টিপে দেখল বাবা।

'উহ্! এইখানে টিপ দিলে আঙুলে ব্যথা লাগে।'

'লাগারই তো কথা,' বলল বাবা। 'তোমার পা বড় হয়ে গেছে গত এক বছরে। তোমার কী অবস্থা, মেরি?'

মেরি বলল ওরও একই অবস্থা, আঙুলের দিকটা টাইট।

'খোলো দেখি,' বলল বাবা। 'মেরির জুতোজোড়া পায়ে দাও তো, লরা।'

মেরির জুতো পায়ে দিলে একটুও ব্যথা লাগে না লরার।

'বুঝলাম,' বলল বাবা। 'এটাকে ভালমত গ্রিজ লাগালে একেবারে নতুনের মত দেখাবে। এটা লরা পরবে। মেরির জন্যে একটা নতুন জুতো কিনতে হবে। আর লরারটা যত্ন করে রেখে দিলে ক্যারি বড় হলে পরতে পারবে। এবার, ক্যারোলিন, কী কী লাগবে মনে মনে একটা লিস্টি করে ফেলো, আর সবাই তৈরি হয়ে নাও আমি ওয়্যাগন বের করতে করতে। শহরে যাচ্ছি আমরা।'

প্রথমে মিস্টার ফিচের দোকানে গেল বাবা। বাড়ি তৈরির জন্য যে তক্তা নিয়েছিল তার দাম আংশিক শোধ করল বাবা, তা ছাড়া বাবার অনুপস্থিতিতে মিস্টার নেলসন এখান থেকে বাকিতে যত ময়দা আর চিনি নিয়ে মাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন, তার দাম পুরো শোধ করল। এরপর বাকি টাকা গুনে নিয়ে প্রথমেই কেনা হলো মেরির জন্য নতুন জুতো।

মেরির পায়ে ঝকঝকে জুতো দেখে লরার মনে হলো, ছোট হয়ে ঠকা হয়ে

গেছে ওর। বাকি জীবন কেবল মেরির ছোট হয়ে যাওয়া পুরনো জুতোই পরতে হবে ওকে, নতুন জুতো পাবে না কোনদিন।

মা বলল, 'এবার লরার জন্যে জামার কাপড়।'

মিস্টার ফিচ গরম কাপড়ের থান বের করলেন। কয়েকটা দেখে পছন্দ করে মা কিনল কাপড়। কিন্তু মেরির রঙ পছন্দ হলো না বলে ওর কাপড় কিনতে রাস্তা পেরিয়ে মিস্টার ওলসনের দোকানে যেতে হলো।

ওরা কাপড় পছন্দ করছে, এমন সময় পিছন দরজা দিয়ে ঢুকল নেলী। পশমের একটা শোল্ডার কেপ পরে আছে ও।

'হেলো!' বলেই মেরির পছন্দ করা নীল ফ্ল্যানেলের দিকে তাকাল নাক সিটকে। বলল, 'হ্যাঁ, গেঁয়োদের জন্যে ওটা ঠিকই আছে।' বলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজে কী পরে আছে দেখাল। জিজ্ঞেস করল, 'দেখেছ, আমি কী গায়ে দিয়েছি?'

ঠিক পরের প্রশ্নটাই হলো, 'ফারের একটা কেপ কেনার ইচ্ছে হয় না, লরা? অবশ্য চাইলেই তো আর কিনতে পারবে না তোমরা। তোমার বাবা তো চাষাভুষো মানুষ, দোকানের মালিক না।'

ঠাস করে একটা চড় কষাবার ইচ্ছে অনেক কষ্টে দমন করল লরা। এত রেগে গেছে যে একটা কথাও বের হলো না ওর মুখ দিয়ে। ঝট্ করে পিছন ফিরল লরা, হেসে উঠল নেলী, তারপর ঢুকে গেল ভেতরে।

ক্যারির জন্যও একটা জামার কাপড় কিনছে মা। বাবা কিনছে নেভি বীন, ময়দা, কর্নমীল, লবণ, চিনি আর চা। কেরোসিন-ক্যানটা ভরে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গেল ওরা – শীত পড়ছে খুব।

রাতে সাপারের পর কাপড়ের বান্ডিল খুলল মা। সবাই মুগ্ধ হয়ে দেখছে যার যার কাপড়। মা বলল, যত শীঘ্রি পারে জামাগুলো তৈরি করে ফেলবে। বাবা যতক্ষণ বাড়িতে থাকে সানডে স্কুলে যাবে মেয়েরা নিয়মিত।

'আরে!' অবাক হলো বাবা। 'তোমার জন্যে যে কাপড়টা পছন্দ করলাম, ওটা তো দেখছি না, ক্যারোলিন?'

লাল হয়ে গেল মা'র মুখটা, মাথা নিচু করে চুপ করে থাকল। বাবা বলল, 'তার মানে কেনোনি ওটা?'

হাসল মা। 'তোমার জন্যে যে ওভারকোটটা পছন্দ করেছিলে, ওটাও তো দেখছি না, চার্লস!'

'ওটার অনেক দাম, ক্যারোলিন। ওটা এখন কেনা ঠিক হতো না। আগামী বছর ফসল হবে না। ঘাসফড়িঙের বাচ্চাগুলো ডিম ফুটে বেরিয়ে সব খেয়ে শেষ করবে। আবার কাজ পেতে পেতে সেই আগামী ফসল কাটার মৌসুম। ততদিন চলতে হবে তো! আর এই পুরনো কোটটাই তো যথেষ্ট ভাল আছে।'

'আমিও ঠিক এই কথাই ভাবলাম,' মৃদু হেসে বলল মা।

বেহালাটা বের করে যত্নের সাথে সুর বাঁধল বাবা। 'এটার কথাও খুব মনে হতো, ক্যারোলিন,' বলে একের পর এক সুর বাজিয়ে চলল বাবা। "জনি যখন বাড়ি ফিরল" বাজাল, "ছোট্ট মিষ্টি মেয়েটা, সুন্দর মেয়েটা, যাকে রেখে আজ আমি এত দূরে" বাজাল, "আমার সেই কেন্টাকির বাড়িটা" বাজাল। সবশেষে

সবাই মিলে গাইল:

"আরাম, আয়েশ, শান্তির খোঁজে যতই ঘুরি,
সকলের সেরা, মানতেই হয়, নিজের বাড়ি।"

# আঠারো

এবারও তেমন একটা তুষার পড়ল না। যদিও ঠাণ্ডা বাতাসের দাপটে ছোট ছেলেমেয়েরা ঘরের ভেতরেই থাকতে বাধ্য হলো।

বাবা সারাদিন বাইরে থাকে। গাছ কেটে এনে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে লাকড়ি বানায়, প্লাম ক্রীকের পার ধরে বহুদূর উজানে গিয়ে যেখানে মানুষজন থাকে না, সেখানে ফাঁদ পেতে আসে মাস্করাট, মিঙ্ক আর উদবিড়ালের জন্য।

রোজ সকালে পড়তে বসে লরা আর মেরি, অঙ্ক কষে স্লেটে। বিকেলে পড়া ধরে মা। খুশি হয়ে বলে ওরা দুজনই অসম্ভব মেধাবী, এত দ্রুত শিখছে যে, আবার যখন স্কুলে যাবে, তখন দেখবে কারও চেয়ে একটুও পিছিয়ে নেই।

প্রত্যেক রোববার সানডে স্কুলে যাচ্ছে ওরা। নেলী ওলসনও আসে ওর পশমের কেপ দেখিয়ে নিজেকে শহুরে আর বড়লোক প্রমাণ করবার জন্য। বাবা সম্পর্কে ও যা বলেছে, সেকথা মনে পড়লে এখনও রাগে পিত্তি জ্বলে যায় লরার।

পুব মিনেসোটা থেকে যে-রোববার রেভারেন্ড অ্যালডেন আসেন পশ্চিমের এই গির্জায়, সেদিন লরার খুব ভাল লাগে; আশা করে উনি হয়তো দুয়েকটা কথা বলবেন ওর সঙ্গে। প্রতিবার দেখা যায় ভোলেননি উনি, বেরোবার সময় গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে এসে নরম নীল দৃষ্টি রাখেন তিনি লরা আর মেরির মুখে, মৃদু হেসে বলেন, 'এই যে আমার মিষ্টি দুই পল্লী-বালা! মেরি-লরা, কেমন আছ তোমরা?' ওদের নতুন ড্রেস দেখে বলেন, 'বাহ্, ভারি সুন্দর জামা তো!'

একদিন বিকেলে মা বলল সেদিন আর পড়া ধরতে পারবে না; স্নান করে ভাল জামাকাপড় পরে সবাইকে ঝটপট তৈরি হয়ে নিতে হবে, শহরে যাবে ওরা আজ সন্ধ্যায়।

অবাক হলো ওরা। 'কিন্তু আমরা তো কোনদিন সন্ধের পর শহরে যাই না, মা?' বলল মেরি।

'যাও না বলে যে কোনদিন যেতে পারবে না, এমন নয়।'

'কেন যাচ্ছি, মা?' সরাসরি প্রশ্ন করল লরা।

'সেটা বলা যাবে না,' সাফ জবাব।

'কেন, মা?'

'আরে, মুশকিল! আগে থেকে বললে মজা নষ্ট হয়ে যাবে তো! ব্যস, আর কোনও প্রশ্ন না, হাতে সময় বেশি নেই।'

একে একে সবাইকে স্নান করতে হলো, সেরা জামাকাপড় পরতে হলো, পায়ে পালিশ করা জুতো পরতে হলো আর চুলে বাঁধতে হলো সিল্কের রিবন।

রাতের খাবার খেয়ে নিল ওরা আগেভাগেই। ব্যাপারটা কী হতে পারে, নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে বোঝার চেষ্টা করে বিফল হলো লরা আর মেরি। খাওয়ার পর সবার শেষে স্নান করল বাবা।

সবাই উঠে বসতে শহরের পথে রওনা হয়ে গেল ওয়্যাগন। প্রচণ্ড শীত, কম্বল জড়িয়ে বসেছে তাও ঠাণ্ডা লাগছে লরার। অন্ধকার আকাশে তারাগুলোকে অনেক ছোট আর দূরের মনে হচ্ছে। শক্ত জমিতে খট্-খট্ পা ফেলছে ঘোড়াদুটো, ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ করছে ওয়্যাগন।

কানখাড়া করল বাবা হঠাৎ, তারপর বলল, 'ওয়াও!'

থেমে দাঁড়াল স্যাম আর ডেভিড। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ, তারপর মিষ্টি দুটো শব্দ কানে এল ওদের, তারপর আবার, আবার। মনে হলো তারাগুলোর কাছ থেকে আসছে শব্দগুলো – ভরাট, কিন্তু নরম, সুরেলা।

'এটা কীসের আওয়াজ, বাবা?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল লরা।

'গির্জার নতুন ঘণ্টা!' খুশি মনে বলল বাবা। রওনা হলো আবার।

এরই জন্য তালি দেয়া ছেঁড়া জুতো পায়ে দিয়েই শহর থেকে বাড়ি ফিরেছিল বাবা সেদিন।

শহরটা মনে হলো ঘুমিয়ে রয়েছে। দোকান-পাট সব বন্ধ, আঁধার। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল লরা, 'আরে! দেখো, দেখো! কী সুন্দর করে সাজিয়েছে গির্জাটা!'

আলোয় আলোময় হয়ে রয়েছে গির্জা। সব কটা জানালায় আলো। কেউ ভেতরে ঢুকতে গেলেই দরজা দিয়ে লাফিয়ে বাইরে চলে আসছে উজ্জ্বল আলো।

গির্জার দরজার সামনে সবাইকে নামিয়ে বাবা গেল ঘোড়া দুটোকে বেঁধে ওদের গায়ে কম্বল চাপা দিতে। বাবা ফিরে এলে একসঙ্গে ভেতরে ঢুকল ওরা সবাই।

ঢুকেই হাঁ হয়ে গেল লরার মুখ। বেঞ্চগুলোর সামনে কী করে যেন একটা গাছ গজিয়েছে। সেই গাছের ডালগুলো থেকে ঝুলছে লাল-নীল-হলুদ-সবুজ হরেক রঙের কাগজে মোড়া অসংখ্য জিনিস। অনেক জিনিস না মুড়ে এমনিই ঝোলানো হয়েছে – স্কার্ফ, লাল দস্তানা, একজোড়া বুট, আরও কত কী।

নীচে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা রয়েছে একটা কাঠের গামলা, একটা ওয়াশবোর্ড, একটা বেলচা, একটা পিচফর্ক, এমন কী একটা স্লেডও।

ব্যাপারটা কী বুঝতে পারছে না লরা, মা'র মুখের দিকে চাইল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। মা হেসে বলল, 'একে ক্রিসমাস ট্রী বলে। সুন্দর না?'

জবাব দিতে পারল না ও, হাঁ করে গিলছে সাজানো ক্রিসমাস ট্রীটাকে। দূরের একটা শাখায় মাফ সহ সুন্দর একখানা ছোট কেপ ঝুলছে, দেখতে পেল লরা।

রেভারেন্ড অ্যালডেন উপস্থিত আছেন আজ। ক্রিসমাস সম্পর্কে বললেন তিনি। বক্তৃতা শেষ হলে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে গান ধরল। গান শেষ হলে মিস্টার টাওয়ার আর মিস্টার বীড্ল্ গাছের ডাল থেকে এক এক করে জিনিসগুলো নামিয়ে ওগুলোর গায়ে লেখা নাম পড়তে থাকলেন, আর মিসেস টাওয়ার ও মিস্ বীড্ল্ ওগুলো জায়গামত পৌঁছে দিতে লাগলেন।

গাছে ঝোলানো প্রতিটা জিনিস কারও না কারও জন্য উপহার।

হাঁ করে দেখছে লরা, এমন সময়ে কে একজন গোলাপী রঙের একটা ক্যান্ডি ভরা ব্যাগ আর বড়সড় একটা পপকর্নের মোয়া ধরিয়ে দিল ওর হাতে। মেরিকেও দেয়া হলো একটা, ক্যারিকেও। বোঝা গেল, প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের জন্যই রয়েছে এ-জিনিস একটা করে। এরপর মেরি একটা নীল দস্তানা পেল, একটু পর লরা পেল একটা লাল দস্তানা।

বড় একটা প্যাকেট খুলে মা দেখল সুন্দর একটা খয়েরি আর লাল রঙের শাল পেয়েছে। বাবা পেল একটা উলের মাফলার। এরপর ক্যারি পেল চিনামাটির মাথা লাগানো একটা কাপড়ের পুতুল। খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল ও।

চারদিকে হাসি-গল্প চলেছে, তারই মাঝে নাম পড়ে যাচ্ছেন মিস্টার বীডল আর মিস্টার টাওয়ার। ফারের ছোট্ট কেপ আর মাফ্‌টা ঝুলছে এখনও। লরা একবার ভাবল, ইশ্‌শ্‌, ও যদি পেত ওটা! নেলীর আছে, কাজেই মনে হয় না ও পাবে। যে-ই পাক, লরা জিনিসটার দিকে তাকিয়ে থাকতে চায় যতক্ষণ সম্ভব। কে পেল সেটাও জানার খুব ইচ্ছে।

আর কিছু পাওয়ার আশা করছে না লরা। অনেক কিছু পেয়েছে ও। মেরি এই সময়ে সুন্দর একটা ছোট্ট ছবির বই পেল। মিস্টার টাওয়ার ফারের কেপটা নামাচ্ছেন গাছের ডাল থেকে, নামটা পড়লেন, কিন্তু গোলমালে শুনতে পেল না লরা। চোখের আড়ালে চলে গেল ওটা, কে যে পেল জানা হলো না।

ক্যারি আরেকটা খেলনা পেল – সাদার ওপর বাদামি ছোপ দেয়া একটা সুন্দর চিনামাটির কুকুর; কিন্তু কাপড়ের পুতুলটাকে কোলে নিয়ে এমনই মত্ত হয়ে রয়েছে ও যে এদিকে খেয়ালই দিল না।

'মেরি ক্রিসমাস, লরা!' বললেন মিস বীডল। লরার হাতে তুলে দিলেন সুন্দর একটা ছোট্ট সাদা চিনামাটির বাক্স। মা বলল, ওটা আসলে একটা জুয়েল-বক্স।

এত অপূর্ব ক্রিসমাস লরার জীবনে আসেনি আর। এ আনন্দের তুলনা হয় না। এত লোক, এত হাসি-গল্প, এত আলো, এত খুশি। চিরকাল মনে থাকবে ওর এই ক্রিসমাসের কথা। পাশ থেকে কেউ বলে উঠল, 'এগুলো তোমার জন্যে, লরা।'

লরা চেয়ে দেখল, মিসেস টাওয়ার হাসছেন ওর দিকে চেয়ে; হাতে সেই ছোট্ট ফার কেপ ও মাফ।

'আমার জন্যে? সত্যিই?' ওর চোখ থেকে আর সবকিছু অদৃশ্য হয়ে গেল, দুই হাতে জড়িয়ে ধরল লরা নরম ফারের কেপ।

সবাই চলে যাচ্ছে এখন। বেঞ্চির ওপর বাচ্চা কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যারি, মা ওর হুড বেঁধে দিচ্ছে। সবই দেখছে লরা, কিন্তু মনে হচ্ছে স্বপ্নের ঘোরে। মা বলল, 'শালটার জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ব্রাদার অ্যালডেন। ঠিক এই জিনিসটাই দরকার ছিল আমার।'

বাবা বলল, 'আর আমার মাফলারের জন্যেও ধন্যবাদ। ঠাণ্ডার সময় শহরে আসার পথে খুব কাজে দেবে।'

একটা বেঞ্চে বসলেন রেভারেন্ড অ্যালডেন। 'আর মেরির কোটটা? গায়ে ঠিক হয়েছে তো?'

লরা এতক্ষণ নিজেকে নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিল যে খেয়ালই করেনি কখন লম্বা একটা নীল কোট পেয়েছে মেরি। চমৎকার মানিয়েছে ওটা ওকে, গায়েও ঠিক হয়েছে।

'আর আমাদের ছোট্ট লরার খবর কী? পছন্দ হয়েছে তোমার ফার?' ওকে ধরে কাছে নিয়ে এলেন রেভারেন্ড অ্যালডেন। কেপটা লরার কাঁধের ওপর ফেলে গলার কাছে বেঁধে দিলেন। তারপর মাফের ফিতেটা পরিয়ে দিলেন ওর গলায়। রেশমি মাফের ভেতর ঢুকে গেল লরার হাত।

'এইত্তো!' খুশি হলেন রেভারেন্ড অ্যালডেন। 'এইবার আর সানডে স্কুলে আসতে ঠাণ্ডা লাগবে না আমার মিষ্টি পল্লীবালাদের।'

'তুমি কিছু বলবে না, লরা?' জিজ্ঞেস করল মা।

কিন্তু রেভারেন্ড অ্যালডেন বললেন, 'মুখে বলার কী দরকার? যে রকম ঝিকমিক করছে চোখদুটো, তাতেই তো সব বলা হয়ে যাচ্ছে!' হাসলেন তিনি। 'তোমাদের কথা বলব আমি পুবের ছোট্ট মেয়ে দুটোকে, যারা এদুটো উপহার পাঠিয়েছে তোমাদের জন্যে।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ,' এতক্ষণে কথা ফুটল লরার মুখে। 'ওদেরকেও দয়া করে ধন্যবাদ জানিয়ে দেবেন আমার।'

গির্জা থেকে বেরোবার সময় নেলীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অনেক উপহার নিয়ে বাড়ি ফিরছে বাবা-মার সঙ্গে। 'মেরি ক্রিসমাস, নেলী!' বলল লরা। হাঁ করে চেয়ে রইল নেলী ওর দিকে। লরার কেপটা ওরটার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। তা ছাড়া ওরটায় মাফ নেই।

লরা খেয়াল করল, আর কোন রাগ নেই ওর নেলীর ওপর।

# উনিশ

ক্রিসমাসের পর কয়েক সপ্তাহ ওরা সানডে স্কুলে গেল উইলোর ডাল চিরে বাবার তৈরি করা ববস্লেডে চড়ে, নতুন কোট, কেপ, শাল আর মাফলার পরে।

এক সকালে বাবা বলল 'চিনূক' বইছে। চিনূক হলো দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে আসা গরম বাতাস। এক দিনের মধ্যেই সব বরফ গলে গেল, দৌড়াতে শুরু করল প্লাম ক্রীকের পানি। এরপর এল প্রবল বৃষ্টি, পর পর কয়েকদিন ঝরল দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা। এবার গোঁ-গোঁ ডাক ছেড়ে উন্মাদের মত ছুটল ক্রীকের পানি কুল ছাপিয়ে।

প্লাম আর উইলো শাখায় ফুল এল, নতুন পাতা ছাড়তে শুরু করল হঠাৎ করেই। সবুজ ঘাসে ছেয়ে গেল প্রেয়ারির প্রান্তর।

দেখতে দেখতে গরম এসে গেল। লরা আর মেরির স্কুলে যাওয়ার সময় এখন, কিন্তু এ-বছর ওদের আর স্কুলে যাওয়া হবে না। কারণ, আবার কাজে যেতে হচ্ছে বাবাকে, আর তখন ওদেরকে মা'র দরকার।

বাচ্চা ফুটল ঘাসফড়িঙের। পা থেকে মাথা পর্যন্ত, এমন কী চোখও, সবুজ। জন্মেই খাওয়া শুরু করল ওরা, চারদিকে কেবল কচরমচর শব্দ। খাচ্ছে আর দ্রুত বাড়ছে। অল্প দিনেই মুছে গেল সবুজের চিহ্ন। যতদূর চোখ যায় শুধু ধু-ধু প্রাণহীন ফাঁকা প্রান্তর।

বৃষ্টি নেই, প্রতিদিন আগের দিনের চেয়ে বাড়ছে গরম, যত্র-তত্র লাফিয়ে বেড়াচ্ছে কুৎসিত ঘাসফড়িং। অবস্থা যখন সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে, ঠিক তখনই হঠাৎ করে হাঁটতে শুরু করল ওরা। কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে, গায়ে গা মিলিয়ে এমন ভাবে চলছে যে মনে হচ্ছে মাটিই বুঝি সরে যাচ্ছে পশ্চিমে। গোটা এলাকার সমস্ত ঘাসফড়িং যেন কীসের ইঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করেছে একই সঙ্গে, কেউ উড়ছে না, কেউ লাফ দিচ্ছে না, কেবল দ্রুতপায়ে হাঁটছে পশ্চিম দিকে।

জানালা বন্ধ রাখতে হলো, নইলে জানালা গলে ঘরে ঢুকে আসে। মার্চ করে আসছে ওরা পুব থেকে, বাড়িটাকে কোন বাধা বলেই গণ্য করল না – সোজা দেয়াল বেয়ে উঠে ছাদ টপকে নেমে গেল ওপাশের দেয়াল বেয়ে।

পরপর চারদিন চাররাত হাঁটল ওরা এইভাবে। তারপর মাটি ছেড়ে আকাশে উঠল। ক্রমে আরও ওপরে উঠছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢাকা পড়ল সূর্য, ঠিক প্রথম আসার দিন যেমন হয়েছিল। সেদিন ওরা নেমেছিল, আজ উঠছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পশ্চিমে সরে গেল মেঘটা।

পঙ্গু দু-একটাকে এখনও দেখা যাচ্ছে মাটিতে। ছেঁচড়ে, বুকে হেঁটে যেমন ভাবে পারে চেষ্টা করছে পশ্চিমে এগোতে।

যেন শান্তি ফিরে এল গোটা অঞ্চলে। শুধু মানুষ নয়, পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গ-উদ্ভিদ সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। আপদ বিদায় হতেই যে-যার ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য উঠে-পড়ে লাগল নিজ নিজ কাজে।

বৃষ্টি নামতেই আবার গজিয়ে উঠল ঘাস-পাতা-ঝোপ-ঝাড়। আলুগুলো রক্ষা পেয়েছে, তা ছাড়া মাছ পড়তে শুরু করেছে ফাঁদে। মিস্টার নেলসনের লাঙলে স্যাম আর ডেভিডকে জুতে নিয়ে বাবা লতা-গুল্মে ছাওয়া গমখেতের একাংশে লাঙল টেনে, জমি তৈরি করে শালগমের বীজ বুনল। তারপর প্রেয়ারি আগুনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হিসেবে বাড়ির পশ্চিম দিকে খালের পার থেকে শুরু করে বাঁকা হয়ে আবার খালের পার পর্যন্ত লাঙল টানল বার কয়েক। ফলে চওড়া একটা পরিখার মত তৈরি হলো জমিতে।

এরপর এক সকালে শিস দিতে দিতে চলে গেল বাবা কাজের সন্ধানে।

দিন যায়। সকালে উঠে আস্তাবল আর গোয়ালঘরের কাজ সেরে, বাড়ি ফিরে থালাবাসন ধুয়ে-মুছে, ঘর ঝাড়ু দিয়ে পড়তে বসে ওরা; দুপুরে পড়া ধরে মা। তারপর খেলা অথবা সেলাই – যার যা খুশি। বিকেলে মাঠ থেকে স্পট আর তার বাছুরটাকে গোয়ালে ফিরিয়ে আনা, সান্ধ্যকালীন কাজগুলো সেরে সাপার, তারপর ডিশগুলো ধোয়া-মোছা হয়ে গেলেই বিছানায় উঠে ঘুম।

হঠাৎ এক সকালে পোড়া-পোড়া গন্ধ পেল লরা প্রেয়ারির বাতাসে। ধোঁয়া দেখতে পেল দূর-আকাশে। দৌড়ে গিয়ে মাকে বলতেই বাইরে বেরিয়ে দেখল

মা। বলল, 'বহুদূরে আছে ওটা, লরা। এদিকে নাও আসতে পারে। তবে একটা চোখ রাখতে হবে ওদিকটায়।'

দুপুর নাগাদ এসে পড়ল আগুন। ধোঁয়ার আগে আগে আগুনের বল গড়িয়ে আসতে দেখে ভুরু কুঁচকে গেল মা'র। এক বালতি পানি আর একটা ঘর মোছার কাপড় নিয়ে ছুটল মা। ঠিক সেই সময় একটা আগুনের গোলা লাঙল চষা দাগের ভেতরে চলে এল গড়িয়ে।

'তোমরা দূরে সরে থাকো!' বলেই ভেজা কাপড় দিয়ে পিটাতে শুরু করল মা বলটাকে।

টাম্বল্‌উইড বলে এক জাতের লতা পেঁচিয়ে গোল আকার ধারণ করেছে, বাতাসের ধাক্কায় গড়িয়ে আসছে এদিকে একের পর এক। একটাকে পিটিয়ে মেরেছে মা, কিন্তু এরই মধ্যে আরও দুটো ঢুকে পড়েছে সীমানা ডিঙিয়ে।

ঘোড়ায় চেপে ছুটে এলেন মিস্টার নেলসন। ঘোড়াটাকে আস্তাবলে ঢুকিয়ে দিয়ে একটা পিচ্‌ফর্ক তুলে নিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'ভেজা ছালার ব্যবস্থা করো দেখি, খুকিরা!'

দৌড়াল লরা আর মেরি। একটা ভেজা ছালা পিচ্‌ফর্কে আটকে নিয়ে দমাদম পিটিয়ে নেভাতে শুরু করলেন মিস্টার নেলসন আগুনের গোলা। মা'ও একটা পিচ্‌ফর্ক সংগ্রহ করে তাতে আটকে নিয়েছে একটা ভেজা ছালা। এবার দ্রুত নিয়ন্ত্রণে চলে আসছে ভেতরে ঢুকে পড়া আগুনের বলগুলো। ছোটাছুটি করে বালতি ভরে পানি আনছে লরা আর মেরি, ভরে দিচ্ছে কারও বালতি খালি হয়ে গেলে।

হঠাৎ লরা লক্ষ করল, একটা আগুনের গোলা ছুটে যাচ্ছে খড়ের গাদার দিকে। ওর চিৎকার শুনে মা ও মিস্টার নেলসন, দুজনেই দৌড়ে গেল ওটাকে ঠেকাতে। এদিকে পোড়া ঘাসের ওপর দিয়ে আরেকটা আগুনের গোলা সরাসরি বাড়ির কাছে চলে আসতে দেখে প্রথমে থতমত খেয়ে গেল লরা, তারপর যেই মনে পড়ল ঘরে ক্যারি রয়েছে, একটা ভেজা গানিব্যাগ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটার ওপর, পিটিয়ে একেবারে মিশিয়ে দিল মাটিতে।

আগুনের গোলা আর নেই, গোলার পিছু পিছু ধেয়ে আসা মূল আগুনের দেয়াল এসে থামল সীমানা বরাবর, এগোতে না পেরে দু'ভাগ হয়ে রওনা হলো দু'দিকে -- সীমানার বাইরের সব ঘাস জ্বালিয়ে শেষে থামল গিয়ে খালের ধারে, তারপর ওখানেই জ্বলে শেষ হয়ে গেল।

মিস্টার নেলসনকে অনেক করে ধন্যবাদ জানাল মা। উনি চলে গেলে মেয়েদের বলল, 'দুনিয়ায় সুপ্রতিবেশী পাওয়াই সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য। এর চেয়ে বড় আর কিছুই নেই। এবার চলো, মেয়েরা, হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসবে, চলো।'

প্রেয়ারি-আগুনের পরপরই ঠাণ্ডা পড়ে গেল খুব। মা বলল, এখনই আলু আর শালগম তুলে না ফেললে জমে শক্ত হয়ে যাবে।

মেরি আর লরাও লেগে গেল কাজে। মা মাটি খুঁড়ে আলু বের করে, মেরি আর লরা সেগুলো বালতিতে ভরে একদৌড়ে রেখে আসে সেলারে। ঠাণ্ডা বাতাসে

লাফ-ঝাঁপ দিয়ে নাকের ডগা লাল হয়ে গেল ওদের, হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে গেল। আস্তাবলের কাজ সেরে বাড়ি ফিরে স্টোভে হাত সেঁকতে খুব আরাম লাগল ওদের। এদিকে সেদ্ধ আলু আর ভাজা মাছের সুগন্ধে জিভে পানি এসে যাচ্ছে।

আলু তোলা হয়ে যেতে শালগম উপড়ে তুলতে লেগে গেল সবাই। সারাদিন অন্ধকার হয়ে থাকল আকাশের মুখ, যে-কোন মুহূর্তে নামতে পারে অঝোর ধারা। এরই মধ্যে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে ওরা মা'র পাশে থেকে। আলুর চেয়ে শালগম তোলা অনেক কঠিন। এত বড় জিনিসটা টেনে উপড়ে তুলে আনা লরার কচি হাতের পক্ষে কঠিন, গায়ের জোরে টানছে বলে প্রায়ই ধপ্ করে বসে পড়ছে মাটিতে। শালগম তুলে প্রথম কাজ ঘ্যাঁচ করে আগার পাতাগুলো কেটে ফেলা। পাতা আর শালগম আলাদা বালতিতে রাখা হচ্ছে; বালতি ভরে গেলে একজন শালগম নিয়ে ছুটছে সেলারের দিকে, অপরজন পাতাগুলো দিয়ে আসছে স্পট আর তার বাচ্চার মুখের সামনে গামলায়।

কয়েকদিন লেগে গেল সব শালগম তুলে আনতে। কাজ শেষ করে হাঁফ ছেড়ে মা বলল, 'গোটা শীতকালটা রোজ খেলেও এত শালগম শেষ করতে পারব না আমরা! তা ছাড়া আলু রয়েছে মেলা, মাছ রয়েছে – কোনও অসুবিধে হবে না আমাদের।'

সেই রাতেই ঝরতে শুরু করল তুষার, পরদিন সকালে উঠে লরা দেখল মাঠ-ঘাট ঢাকা পড়েছে তুষারে। এখন শুধু ঘরে বসে বাবার জন্য প্রতীক্ষা।

অপেক্ষা করতে করতে মেয়েরা যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছে, তখন চিঠি এল, আর দুই সপ্তাহ পরেই কাজ শেষ করে রওনা হবে বাবা। শুনেই স্লেটের গায়ে ছোট ছোট চোদ্দটা দাগ টেনে রাখল মেরি, রোজ একটা করে দাগ মুছতে থাকবে; শেষ দাগটা যেদিন মোছা হয়ে যাবে, সেদিন ফিরে আসবে বাবা। মা বলল, 'আরও সাতটা দাগ দিয়ে রাখো, মেরি। হেঁটে ফিরে আসতে সময় লাগবে না?'

কথামত কাজ করল মেরি। রোজ একটা করে দাগ মুছে ফেলে, অপেক্ষার দিন কমে যায় একটা, মই বেয়ে চিলেকোঠায় ঘুমাতে যায় দু'বোন।

মেঘ সরে গেছে, রোদে গলে গেছে তুষার; কিন্তু জমির উপর জমে আছে শক্ত বরফ। ধারা কিছুটা ক্ষীণ হলেও পানি বইছে প্লাম ক্রীকে, উইলোর হলুদ ঝরাপাতা হেলে-দুলে ভেসে চলে যাচ্ছে স্রোতের টানে। আকাশ নীল।

একদিন সাপারের পর লরা খেলছে ক্যারি আর জ্যাকের সঙ্গে, শেষ সপ্তাহের প্রথম দাগটা মুছে মেরি বলল, 'বাড়ির পথে রওনা হয়ে গেছে বাবা। আর মাত্র ছয়দিন।'

মনে হলো দারুণ খুশি হয়েছে জ্যাক কথাটা শুনে, হাসতে হাসতে ছুটল দরজার দিকে, দুই পা ওপরে তুলে আঁচড়াচ্ছে দরজা খোলার চেষ্টায়, সেই সঙ্গে তুমুল বেগে নাড়ছে ওর ছোট্ট লেজখানা। পরমুহূর্তে হালকা শিসের আওয়াজ এল লরার কানে। কে যেন 'জোর কদমে ফিরছে জনি বাড়ির পথে' গানটির সুর বাজাচ্ছে।

'বাবা, বাবা ! বাবা ফিরে এসেছে!' চেঁচিয়ে উঠল লরা। দরজা খুলেই পড়ি

কি মরি করে ছুট দিল বাইরের অন্ধকারে।

'হ্যালো, আধ-বোতল!' লরাকে জড়িয়ে ধরল বাবা। 'গুড ডগ, জ্যাক,' বলল জ্যাককে। দরজায় আলো দেখা গেল, মা, মেরি আর ক্যারি আসছে। 'আমার ছোট্ট পুতুলটা কেমন আছে?' ক্যারিকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে বলল বাবা। 'আর আমার বড় কন্যা?' মেরির বেনী ধরে টান দিল। 'আমাকে একটা চুমু দাও দেখি, ক্যারোলিন – অবশ্য যদি এই বুনো ইন্ডিয়ানদের হটিয়ে আমার কাছে ভিড়তে পারো!'

বাবার জন্য তড়িঘড়ি সাপার তৈরি করা হলো, মেরি আর লরা সাহায্য করল মাকে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বলে চলল এদিককার যাবতীয় খবর। আগুনের গোলা, আলু আর শালগম তোলা, স্পটের বাছুরটা এখন কতবড় হয়েছে, লেখাপড়ায় কে কতদূর এগিয়েছে কিছুই জানতে বাকি থাকল না বাবার দশ মিনিটের মধ্যে।

খাওয়া শেষ হলে সবাই আবার ঘিরে ধরল বাবাকে। মেরি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আগে আগে চলে এলে কী করে, বাবা? ছয় দাগ আগে এসে পড়লে কী করে?'

স্লেটের দাগ দেখে মাথা ঝাঁকাল বাবা। বলল, 'ছোট্ট একটা ভুল হয়েছে তোমার, মেরি। আমার চিঠি এতদূর এসে পৌঁছতে যতটা সময় লেগেছে, সেটা যদি স্লেট থেকে মুছে ফেলতে তা হলে মিলে যেত ঠিক ঠিক।'

মা'র দিকে ফিরল বাবা। 'শহর থেকে কী কী আনতে হবে, ক্যারোলিন?'

'কিচ্ছু না। মাছ আর আলু খেয়েছি প্রচুর, তাই ময়দা প্রায় ছোঁয়াই হয়নি। চা, চিনিও যথেষ্ট আছে। শুধু লবণ কিছুটা কমে এসেছে – তাও যাবে আরও কয়েকদিন।'

'তা হলে আগে কাঠের ব্যবস্থা করি। শুনছি, এদিকে নাকি হুট করে এসে পড়ে তুমুল তুষার-ঝড়। একেক বারে কয়েকদিন করে থাকে।'

# বিশ

কয়েক দিন ওয়্যাগন ভরে ভরে কাঠ নিয়ে এসে গাদা করল বাবা, তারপর ওগুলো চিরে সাজিয়ে রাখল কাঠ-ঘরে। যখন বোঝা গেল গোটা শীত চলে যাবে এই কাঠে, তখন কোমরে কুঠার, পিঠে বন্দুক আর হাতে পশু ধরার ফাঁদ নিয়ে বেরোতে শুরু করল আবার।

প্লাম ক্রীকের তীর ধরে বহুদূর উজানে চলে যায় বাবা, ফাঁদ পাতে মাস্করাট, মিঙ্ক, উদবিড়াল আর শেয়াল ধরার জন্য। কিন্তু প্রায়ই ফিরে এসে দুঃখ করে, এত বেশি হয়ে গেছে মানুষের বসতি যে ধারে কাছে কোথাও আর পশু-পাখি বলতে কিচ্ছু নেই। একটা শেয়াল দেখে গুলি করেছিল, কিন্তু লাগাতে পারেনি।

'অনভ্যাসে বিদ্যা নাশ, ক্যারোলিন,' মাথা নাড়ল বাবা এপাশ-ওপাশ।

'শিকারের হাতটা আমার গেছে! একেকবার ভাবি, শিকারই যে দেশে নেই সে দেশে কেন খামোকা পড়ে আছি। তারচেয়ে যদি আরও পশ্চিমে, যেখানে –'

'যেখানে বাচ্চাদের পড়াবার মত কোন স্কুল নেই,' মৃদুকণ্ঠে বলল মা।

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল বাবা। 'ঠিকই বলেছ তুমি, ক্যারোলিন।'

কয়েকটা দিন চুপ থেকে আবার তুলল বাবা কথাটা।

'মাংসের কী ব্যবস্থা করা যায় বুঝতে পারছি না, ক্যারোলিন। উইসকনসিনে থাকতে মাংসের কোন অভাব ছিল না; ভালুক, হরিণ, খরগোশ মেরে এনেছি জঙ্গল থেকে, ইন্ডিয়ানদের এলাকায় মেরে এনেছি অ্যান্টিলোপ, জ্যাকর্যাবিট, রাজহাঁস, টার্কি – অভাব ছিল না কিছুর। আর এখানে?' দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বাবা এপাশ ওপাশ।

'নিজেরাই পশু-পাখি পুষলে পারি আমরা,' বলল মা। 'ঘাসের তো অভাব নেই, ওদের জন্যে কিছু শস্য বুনলেই হয়।'

মাথা ঝাঁকাল বাবা। 'ঠিক বলেছ, আগামী বছর গমের পাশাপাশি ওদের জন্যেও কিছু বুনতে হবে।'

প্রচণ্ড শীত পড়ল এ-বছর। এত ঘন হয়ে তুষার ঝরল যে এক হাত সামনেও দেখা যায় না কিছু। দড়ি বেঁধে সেটা ধরে ধরে গোয়াল ঘরে যায় বাবা, ফিরে আসে দড়ি ধরে – নইলে পথ চিনে ফিরে আসতে পারবে না। দুধ যা দোয়ায়, অর্ধেকই তার বালতি থেকে ছোবল দিয়ে তুলে নিয়ে যায় ঝোড়ো-হাওয়া।

এমন আবহাওয়ায় বাইরে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই, কেউ যে আসবে সে সম্ভাবনা নেই; কেমন যেন ফাঁপর লেগে ওঠে। একটানা তিনদিন তুষার-ঝড়ের পর একদিন একটু বিরতি দিতেই তৈরি হয়ে গেল বাবা, শহরে যাবে। 'তামাক ফুরিয়ে গেছে, যাই চট করে নিয়ে আসি শহর থেকে। তোমার কিছু লাগবে, ক্যারোলিন?'

'এই ঝড়-তুফানে যেতেই হবে তোমার?'

'কোনও ভয় নেই,' দরাজ গলায় আশ্বাস দিল বাবা। 'গত তিনদিন একটানা হয়ে গেল না? আজ আর আসবে না, এলে আগামীকাল।'

বাবার আশ্বাসে তেমন একটা ভরসা রাখতে পারল না মা, বলল, 'যাবেই যখন, যাও। তবে কথা দিতে হবে যে, ঝড় দেখলে থেকে যাবে শহরে।'

আরেক জোড়া মোজা পরতে হলো বাবাকে, গায়ে চড়াতে হলো শতচ্ছিন্ন ওভারকোটটা। মা বলল, 'তোমার একটা বাফেলো ওভারকোট থাকা দরকার ছিল।'

'আর তোমার একটা হীরের নেকলেস!'

হাসল দু'জনে। মার চিবুকটা নেড়ে দিয়ে খুশিমনে বেরিয়ে গেল বাবা। গাইছে:

> "আকাশ ছাওয়া আঁধার মেঘ যখন
> ফেলছে ছায়া চরাচরে, ম্লান:
> আশার আলো দেখছি আমি পথে,
> আমার হাত যে ধরা যীশুর হাতে।"

সেদিনই সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়ে গেল তুমুল ঝড়-তুফান। সেই সঙ্গে ঘন হয়ে ঝরছে তুষার। জানালায় একটা বাতি জ্বেলে রাখল মা। কিন্তু এল না বাবা। পরদিনও না। পরপর চারদিন কোন খবর নেই বাবার। উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল মেয়েদের মুখ।

ভয় পেয়েছে মা-ও, কিন্তু যতটা সম্ভব সবাইকে সাহস জোগাবার চেষ্টা করল।

চারদিন পর আধঘণ্টার জন্য থামল ঝড়। বাইরের অবস্থা দেখার জন্য জানালার কাঁচের উপর নিঃশ্বাস ফেলে জমাট বরফ সরিয়ে ছোট্ট একটা ফাঁক তৈরি করল লরা। দেখল, তুষারপাত থেমেছে বটে, কিন্তু তুষারকণাগুলোকে জমির ওপর দিয়ে ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাতাস ; মনে হচ্ছে সাদা স্রোত বয়ে যাচ্ছে চারপাশে। তারই মধ্যে হঠাৎ দেখল লরা, বিশালকায় এক রোমশ জানোয়ার এগিয়ে আসছে ওদের বাড়ির দিকে। নিশ্চয়ই ভালুক হবে, ভেবে চিৎকার ছাড়ল লরা, 'মা! জলদি এদিকে –'

এটুকু বলতে বলতেই দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে এল আগাগোড়া তুষারে মোড়া রোমশ জন্তুটা। ওটার মুখে বাবার চোখ বসানো। গমগমে গলায় বাবা বলল, 'সবাই তোমরা লক্ষ্মী হয়ে ছিলে তো?'

দৌড়ে এল মা। মেরি আর ক্যারিও ছুটে এল। সবাই হাসছে, চেঁচাচ্ছে, ফোঁপাচ্ছে। তুষারছাওয়া কোট খুলতে সাহায্য করছে মা, খুলে ছেড়ে দিল মেঝের উপর।

'চার্লস! তুমি দেখছি বরফ হয়ে জমে গেছ একেবারে!'

'প্রায়,' বলল বাবা। 'তা ছাড়া নেকড়ের মত ক্ষুধার্ত। আগুনের কাছে একটু বসতে দাও, ক্যারোলিন; আর যাহোক কিছু খাওয়াও, জলদি!'

স্টোভের ধারে বসে থর-থর করে কাঁপছে বাবা। শুকনো মুখে চোখদুটো বড় দেখাচ্ছে। চট্ করে খানিকটা স্যুপ গরম করে এগিয়ে দিল মা।

'বাহ্! চমৎকার!' চুমুক দিয়ে বলল বাবা, 'এইবার শীত পালাবে।'

বুটজোড়া টেনে খসাল মা। পা দুটো চুলোর উপরে ধরে সেঁকে নিল বাবা।

'চার্লস,' মা বলল, 'তুমি–তুমি কি–' কথা আটকে গেল মার মুখে। হাসছে মা, কিন্তু কাঁপছে ঠোঁটদুটো।

'এই যে, ক্যারোলিন, হাতে-নাতে প্রমাণ পেলে!' বলে হাসল বাবা। 'আর কোনদিন চিন্তা করবে না আমার জন্যে। তোমাকে তো বলেইছি, যেখানেই থাকি না কেন, তোমার আর বাচ্চাদের দেখাশোনার জন্যে ফিরতেই হবে আমাকে।' ক্যারিকে হাঁটুর ওপর তুলে নিয়ে বড় দুই মেয়েকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল বাবা। তারপর মাকে বলল, 'আরেকটু স্যুপ থাকলে দাও, তারপর বলছি কীভাবে কী হলো।'

স্যুপ দিয়ে ভিজিয়ে রুটি খেয়ে একটু সুস্থির হয়ে এককাপ গরম চা নিয়ে বসল বাবা। চুল-দাড়ি থেকে তুষার গলে টপ-টপ পানি ঝরছে, তোয়ালে দিয়ে বারবার মুছে দিচ্ছে মা – হাত ধরে তাকে টেনে পাশে বসাল বাবা।

'এই আবহাওয়ার মানে কি জানো, ক্যারোলিন? শহরের সবাই বলাবলি

করছে, এর মানে আগামী বছর বাম্পার ফলন হবে গমের।

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। একটা ঘাসফড়িংও নাকি আসবে না এদিকে আগামী গ্রীষ্মে। হালকা শীত আর শুকনো গ্রীষ্ম – এ না হলে আসে না ওরা। খুবই নাকি ভাল ফলন হবে আগামী বছর।'

'ভাল খবর,' বলল মা শান্ত গলায়।

'ফিচের দোকান থেকে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় এই বাফেলো কোটটা দেখাল ও আমাকে। সস্তায় পেয়েছে। দশ ডলার দাম শুনে পিছিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কী মনে করে নিয়েই নিলাম। বিশেষ করে ফিচ যখন বলল দামটা আগামী বসন্তে ফাঁদ পেতে ধরা পশুর চামড়া যখন বিক্রি করব, তখন শোধ করলেই হবে।'

'এটা নিয়ে ভাল করেছ, চার্লস।'

'কপাল ভাল যে নিয়েছিলাম,' বলল বাবা। 'তবে তখন বুঝিনি। বাইরে বেরিয়ে দেখি উত্তর-পশ্চিম আকাশে মেঘ। ছোট মেঘ, মনে হলো বহুদূরে, ভাবলাম জোরে পা চালালে পৌঁছে যাব বাড়ি।

'কিন্তু কিছুদূর হাঁটার পরই হুড়মুড় করে এসে পড়ল ঝড়। দুই মিনিটের মধ্যে অন্ধ করে দিল ঘন তুষার। এখন না পারি এগোতে, না পারি ফিরে যেতে। মনে মনে স্থির করলাম, যা থাকে কপালে, হাঁটতে থাকব সামনের দিকে। না হাঁটলে তুষারে জমে মরে পড়ে থাকব শক্ত হয়ে, হাঁটতে থাকলে বলা যায় না, বাড়িটা পেয়েও যেতে পারি।

'পেলাম না। ঘণ্টা দুয়েক হাঁটার পর বুঝলাম হারিয়ে গেছি। কোন্‌দিকে চলেছি কে জানে! কিন্তু না চলেও উপায় নেই, থামলেই মরণ।'

'জানালায় বাতি জ্বেলে রেখেছিলাম, দেখোনি?'

'কিচ্ছু না। অন্ধের মত হাঁটতে হাঁটতে একসময় আছড়ে পড়লাম একটা গর্তের মধ্যে। ওখানেই তিনদিন তিনরাত কাটিয়ে আজ উঠে এসেছি ঝড় থামায়। উঠেই দেখি বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, সিকি মাইলও হবে না – আমি আর লরা যেখানটায় মাছের ফাঁদ পেতেছিলাম, ঠিক ওখানেই একটা গর্তে পড়েছিলাম।'

সেবার ক্রিসমাসে মজার কিছু খেতে পেল না ওরা, কারণ তামাক আনতে নয়, বাবা শহরে গিয়েছিল আসলে মেয়েদের জন্য ক্যান্ডি আনতে। কিন্তু গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়ে তিনদিন থাকতে হওয়ায় খিদের জ্বালায় খেয়ে ফেলেছে ওগুলো।

শুনে একটুও মন খারাপ হলো না লরা বা মেরির।

বরং খুশি হয়ে চুমো দিল বাবার গালে।

# বাই দ্য শোর্‌স্ অভ সিলভার লেক

## এক

এক সকালে থালা ধুচ্ছে লরা, দরজার কাছে রোদে শোয়া জ্যাক চাপা গর্জন ছেড়ে জানান দিল, কেউ আসছে। চোখ তুলে লরা দেখল প্লাম ক্রীকের অগভীর পানি পেরিয়ে এদিকেই আসছে একটা বাগি।

'মা, এক মহিলা আসছেন,' বলল লরা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মা। ঘরদোরের যা অবস্থা হয়ে রয়েছে, তাতে কোনও মেহমানকে বসানো যায় না। অসুখে অসম্ভব দুর্বল হয়ে পড়েছে মা, আর খাটতে খাটতে লরা পৌঁছে গেছে ক্লান্তির শেষ সীমায়; তা ছাড়া গোটা পরিবারের ওপর নেমে এসেছে ভয়ানক বিষাদের ছায়া; তাই ওরা লজ্জার চেয়ে একটা বেপরোয়া ভাবই অনুভব করল বেশি।

মেরি, ক্যারি, ছোট্ট গ্রেস আর মা আক্রান্ত হয়েছিল খুব খারাপ ধরনের হাম-জ্বরে। ওদিকে মিস্টার নেলসনরাও ভুগছিলেন একই অসুখে, তাই কারও সাহায্য পাওয়া যায়নি, লরা আর বাবাকেই সামলাতে হয়েছে সব। রোজ এসেছে ডাক্তার, তার বিল যে কী করে শোধ দেবে জানে না বাবা। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার, অসুখটা মেরির দু'চোখ অন্ধ করে দিয়ে গেছে।

কোনমতে লেপ জড়িয়ে মার রকিং চেয়ারে উঠে বসতে পারে ও আজকাল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে একটু একটু করে কমে এসেছে ওর চোখের দৃষ্টি, এই দীর্ঘ সময় ধৈর্য আর সাহসের সঙ্গে দুর্ভাগ্যের মোকাবিলা করেছে মেরি, একটুও কাঁদেনি, অভিযোগ করেনি। এখন উজ্জ্বল আলোও দেখতে পায় না ও আর।

ওর সুন্দর সোনালী চুল আর নেই, জ্বরের পরপরই মাথা কামিয়ে দিয়েছিল বাবা। এখন দেখতে ছেলেদের মত লাগে। ওর নীল চোখ যেমন ছিল ঠিক তেমনি সুন্দর আছে, কিন্তু দৃষ্টি নেই ওগুলোতে।

'এই সকালে কে হতে পারে?' ঘাড় বাঁকিয়ে বাগির শব্দ শোনার চেষ্টা করছে মেরি।

'অদ্ভুত এক মহিলা,' বলল লরা। 'একা, বাদামী রঙের সানবনেট পরে বসে আছে বাগিতে। একটা বে টেনে আনছে বাগিটা।' বাবা বলে দিয়েছে, সব কিছু ও যেন এমনভাবে বর্ণনা করে, যাতে মেরির মনে হয় ও নিজেই দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার।

'ডিনারে কী খাওয়াবে, ভেবেছ কিছু?' জিজ্ঞেস করল মা অর্থাৎ মহিলা যদি দুপুর পর্যন্ত থাকে তা হলে কী ব্যবস্থা, জানতে চাইছে মা।

রুটি, চিটাগুড় আর আলু – এই আছে। সবে শীত গেছে, সবজি বাগানে কিছু

হতে দেরি আছে এখনও, গরুটার দুধ শুকিয়ে গেছে, আর মুরগিগুলো ডিম দেবে সেই গ্রীষ্মকালে। ফাঁদে এখন কোনদিন এক-আধটা মাছ পড়ে, কোনদিন পড়ে না।

এই অঞ্চল থেকে মন উঠে গেছে বাবার। পশ্চিমে সরে যেতে চায়। গত দুই বছর ধরে পটাচ্ছে মাকে, কিন্তু মা স্থায়ী আস্তানা ছেড়ে নড়তে চায় না। তা ছাড়া টাকা কোথায়? কোথাও যেতে হলেও তো টাকা লাগে। ঘাসফড়িং বিদায় হওয়ার পর দুটো গমের ফসল তুলেছে বাবা, কিন্তু কোনবারই তেমন ভাল ফলন হয়নি। অনেক কষ্টে ঋণমুক্ত হয়েছিল কেবল, এমনি সময়ে অসুখ-বিসুখ আসায় আবার তলিয়ে গেছে ঋণে।

'তুমি ভেবো না, মা। আমরা যা খাব, তাই খাবে মেহমান।'

বাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে বাগি, মহিলা তেমনি বসে দরজার গোড়ায় দাঁড়ানো মা আর লরার দিকে চেয়ে আছে। সুন্দর দেখতে মহিলা, চমৎকার লাগছে বাদামি রঙের ছাপা কাপড় আর সানবনেটে। নিজের খালি পা, বাসি জামা আর না-আঁচড়ানো চুলের কথা ভেবে লজ্জাই লাগল লরার। দুর্বল কণ্ঠে মা বলল, 'আরে! ডোসিয়া না?'

'আমি ভাবছিলাম, চিনতেই পারো কি না!' বলে হাসল মহিলা। 'তোমরা উইসকনসিন ছেড়ে আসার পর কত পানিই তো গড়িয়ে গেল ব্রিজের তলা দিয়ে!'

বিগ উডসে দাদুর বাড়িতে এক নাচের আসরে দেখেছে লরা ডোসিয়া আন্টিকে। বিয়ে করেছে একজন বিপত্নীক ঠিকাদারকে। আগের ঘরের দুটো বাচ্চা আছে ভদ্রলোকের। পশ্চিমে নতুন রেলরোড বসানোর কাজ নিয়েছেন তিনি। আন্টি একা বাগি চালিয়ে উইসকনসিন থেকে চলেছে ডাকোটা টেরিটোরির রেলরোড ক্যাম্পে।

বাবা তার সঙ্গে যাবে কিনা জানার জন্য এসেছে এখানে। তার স্বামী, আঙ্কেল হাইয়ের একজন ভাল লোক দরকার। চাকরিটা একাধারে স্টোরকীপার, বুককীপার ও টাইমকীপারের। বাবা ইচ্ছে করলে চাকরিটা নিতে পারে। বেতন মাসে পঞ্চাশ ডলার।

কথাটা শুনেই বাবার চোয়ালের পেশী থেকে একটা শক্ত, আড়ষ্ট ভাব দূর হয়ে গেল। নিষ্প্রভ নীল চোখে ফিরে এল আলোর ঝিলিক। শান্ত গলায় বলল, 'মনে হচ্ছে, ভাল বেতনে চাকরি করতে করতে নিজের জন্যে হোমস্টেড খোঁজার সুবর্ণ সুযোগ এসে গেল, ক্যারোলিন!'

পশ্চিমে যেতে চায় না মা। রান্নাঘরের দিকে তাকাল, ক্যারিকে দেখল, লরাকে দেখল গ্রেসকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, চার্লস। পঞ্চাশ ডলার বেতন শুনে মনে হচ্ছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। কিন্তু আমরা এখানেই স্থায়ীভাবে বাস করব বলে বাড়ি করেছি, খেত-খামার করেছি—'

'কিন্তু যুক্তি তো মানবে, ক্যারোলিন,' অনুনয়ের সুরে বলল বাবা। 'ভেবে দেখো, ওখানে আমরা শুধু বাস করলেই একশো ষাট একর জমির মালিক হতে পারি, কিনতে হবে না। সে জমি এই জমি থেকে কোনও দিক দিয়ে খারাপ তো

নয়ই, বরং ভাল। ধরে নাও, আমাদেরকে ইন্ডিয়ান টেরিটোরি থেকে ভাগিয়ে এখন তার ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে সরকার। আমার মনে হয়, এ-সুযোগ নেয়া উচিত। শিকার পাওয়া যাবে পশ্চিমে, মাংসের অভাব হবে না কোনদিন।'

'কিন্তু এখন আমরা যাই কী করে?' বলল মা। 'মেরির তো এখন নড়াচড়া করবার ক্ষমতাই নেই।'

'ঠিক বলেছ,' বলল বাবা। আন্ট ডোসিয়ার দিকে ফিরল, 'কথাটা ঠিক। চাকরিটায় যদি পরে যোগ দিই?'

'না, চার্লস,' মাথা নাড়ল আন্ট ডোসিয়া, 'এখুনি ওর লোকের দরকার। অপেক্ষার উপায় নেই, তোমার হয় নিতে হবে নয়তো ছেড়ে দিতে হবে।'

'মাসে পঞ্চাশ ডলার, ক্যারোলিন,' বলল বাবা। 'সেই সঙ্গে বিনা পয়সায় একশো ষাট একর জমি।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নরম গলায় মা বলল, 'তুমি যা ভাল বোঝো তাই মেনে নেব আমি, চার্লস।'

'কাজটা নিচ্ছি আমি, ডোসিয়া,' উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় টুপি চাপাল বাবা 'যাই, নেলসনের সঙ্গে কথা বলে দেখি।'

সব শুনে এতই উত্তেজিত হয়ে উঠল লরা যে ঘরের অভ্যস্ত কাজগুলোও ঠিকমত করতে পারছে না। আন্ট ডোসিয়া এগিয়ে এসে সাহায্য করল, সেই সঙ্গে শোনাল উইসকনসিনের সব খবর।

আন্ট রুবি বিয়ে করেছে, দুই ছেলে আর সুন্দর একটা মেয়ে হয়েছে তার। আঙ্কেল জর্জ কাঠের ব্যবসায়ে গেছে, গাছ কেটে চালান দেয় মিসিসিপি নদীতে ভাসিয়ে। আঙ্কেল হেনরীর ছেলেমেয়েরাও সবাই ভাল আছে। চার্লির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে রকম হতাশ হয়ে পড়েছিল সবাই, সেই তুলনায় অনেক ভাল করছে সে। দাদা-দাদি সেই পুরনো লগ হাউসেই আছে এখনও। ইচ্ছে করলেই এখন তক্তা দিয়ে বাড়ি করতে পারে, কিন্তু দাদার ধারণা তক্তার বাড়ি থেকে গাছের গুঁড়ির বাড়ি অনেক বেশি মজবুত।

এমন কী ব্ল্যাক সুসানের খবরও পাওয়া গেল আন্ট ডোসিয়ার কাছে। ওরা যখন বিগ উড্স্ ছেড়ে চলে আসে তখন ওই বাড়িতেই থেকে গিয়েছিল ব্ল্যাক সুসান, এখনও আছে ওখানেই। বাড়িটা হাত বদল হয়েছে বার কয়েক, এখন ওটা একটা শস্যের গুদাম। কিন্তু ওখান থেকে কিছুতেই নড়ানো যায়নি সুসানকে। ওর ধারণা বাড়িটা ওর সম্পত্তি, লোকজন আসবে-যাবে, কিন্তু ও যাবে কেন নিজের বাড়ি ছেড়ে? গুদামের ইঁদুর মেরে খেয়ে খেয়ে দিব্যি মোটাসোটা হয়েছে এখন। ওই অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতে ওর একটা করে বাচ্চা আছে – ওরই মত বড় কান আর লম্বা লেজ, ইঁদুরের যম।

ডিনারের আগেই ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে ফেলল লরা। বাবা ফিরল বাইরে থেকে। খামারটা বেচে দিয়েছে। মিস্টার নেলসন দুইশো ডলারে কিনে নিয়েছেন এটা। বাবা খুব খুশি। বলল, 'ধার-দেনা সব শোধ করেও কিছু থেকে যাবে হাতে। ভাল হলো না, ক্যারোলিন?'

'ভাল হলেই তো ভাল, চার্লস,' বলল মা। 'কিন্তু কী করে –'

'আগে শুনেই নাও না! সব ঠিক করে ফেলেছি আমি!' টগবগ করে ফুটছে যেন বাবা। 'কাল সকালে ডোসিয়ার সঙ্গে চলে যাব আমি। তুমি আর মেয়েরা থাকবে এখানে মেরি যতদিন না ভাল হয়ে উঠে শরীরে বল পায় – এই ধরো মাস দুয়েক। নেলসন সব মালপত্র সহ তোমাদেরকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে রাজি হয়েছে। তোমরা ট্রেনে চেপে আসবে।'

মা, লরা, ক্যারি সবাই হাঁ করে চেয়ে রইল বাবার মুখের দিকে। মেরি বলল, 'ট্রেনে চেপে?'

'হ্যাঁ, সবচেয়ে সহজ হবে সেটাই।'

শান্ত গলায় মা বলল, 'ঠিক আছে, চার্লস, লরা আর ক্যারি তো থাকলই, ভালমতই চালিয়ে নেব আমরা।'

## দুই

কাল সকাল সকাল রওনা হতে হলে অনেক কাজ সেরে রাখতে হবে আজই। ব্যস্ত হয়ে পড়ল বাবা ওয়্যাগনে মাল ভরার কাজে। আন্ট ডোসিয়া আর ক্যারি মাল-পত্র বাঁধা-ছাঁদায় সাহায্য করছে বাবাকে, লরা এদিকে কাপড় ধুয়ে ইস্তিরি করে দিচ্ছে, পথে খাওয়ার জন্য তৈরি করছে বিস্কুট।

এতসব ব্যস্ততার মাঝখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে জ্যাক, দেখছে। সবাই কাজে এত মগ্ন যে কেউ লক্ষ করছে না ওকে। ওয়্যাগন আর বাড়ির মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়ানো দেখল ওকে লরা। দৌড়-ঝাঁপ নেই, মাথা কাত করে দুষ্টামির হাসি নেই, লেজ নাড়া নেই। গেঁটে-বাতে আক্রান্ত আড়ষ্ট চারপায়ে কোনমতে দাড়িয়ে আছে, কপাল কুঁচকানো, বিষাদ দুই চোখে।

'গুড ডগ, জ্যাক,' বলল লরা। কিন্তু লেজ নাড়ল না জ্যাক, শুধু বিষণ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওর দিকে। 'দেখো, বাবা। জ্যাককে দেখো,' বলল লরা। নিচু হয়ে জ্যাকের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল ও। লোমগুলো পেকে সাদা হয়ে গেছে বেচারার। মাথাটা ওর গায়ে ঠেকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

হঠাৎ ওর দুঃখের কারণটা বুঝে ফেলল লরা। এই বয়সে ওর পক্ষে ওয়্যাগনের পিছু পিছু দৌড়ে ডাকোটা টেরিটোরি পর্যন্ত যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। আবার যাত্রার জন্য তৈরি হচ্ছে ওয়্যাগন, বুঝতে পারছে জ্যাক, কিন্তু ভাবনায় পড়েছে, জরা আর ক্লান্তিতে অবসন্ন শরীর নিয়ে ও কী করে যাবে?

'বাবা!' চেঁচিয়ে উঠল লরা। 'জ্যাক তো এতদূর দৌড়াতে পারবে না। ওকে ফেলে নিশ্চয়ই চলে যাব না আমরা?'

'প্রশ্নই ওঠে না,' জবাব দিল বাবা। 'ওর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। চানার বস্তাটা সরিয়ে ওর জন্যে জায়গা করতে হবে, ওয়্যাগনে চড়িয়ে নিয়ে যাব ওকে আমরা। কী রে, জ্যাক, ওয়্যাগনে চড়বি?'

ভদ্রতার খাতিরে সামান্য একটু নাড়ল জ্যাক লেজটা, তারপর চোখ ফিরাল

অন্যদিকে। না, যেতে চায় না ও, ওয়্যাগনে চড়েও না। সমস্ত উৎসাহ যেন নিভে গেছে ওর।

নিচু হয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল লরা, ছোটবেলায় ঠিক যেমন করে ধরত। 'জ্যাক! জ্যাক! পশ্চিমে, পশ্চিমে যাচ্ছি আমরা, তুমি যাবে না ?' লরার মনে পড়ছে, বাবাকে ওয়্যাগনে মালপত্র তুলতে দেখলে আগ্রহে, উত্তেজনায়, আনন্দে কী রকম লাফালাফি ছোটাছুটি করত জ্যাক। তারপর রওনা হলেই ঢুকে পড়ত ওয়্যাগনের নীচে। কত হাজার মাইল যে ও ছুটেছে ওদের পিছু পিছু! পাহারা দিয়ে রেখেছে ওদের মালপত্র, ঘোড়া, অভয় দিয়েছে লরাকে – আমি আছি, তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না নেকড়ে বাঘ। কতবড় দায়িত্ব নিয়ে বিশ্বস্ততার সঙ্গে কর্তব্য পালন করে গেছে জ্যাক সারাটা জীবন, ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতর কাঁপুনি অনুভব করল লরা।

এখন শুধু গুরু গায়ে হেলান দিয়ে ওর হাতের তালুতে নাক ঘষে অনুরোধ করতে পারে একটু আদরের জন্য। হাত বুলিয়ে দিল লরা ওর মাথায়, কানের পিছনে, স্পষ্ট অনুভব করতে পারল প্রাণশক্তি অতি সামান্যই অবশিষ্ট রয়েছে ওর মধ্যে।

সবাই যখন প্রাণঘাতি ওই স্কারলেট জ্বরে পড়ল তখন থেকেই জ্যাকের প্রতি যত্নে ঢিল পড়েছে লরার। এখন বড় খারাপ লাগছে সেজন্য। লরাকে সারাক্ষণ অত ব্যস্ত দেখে না জানি কত একাকী বোধ করেছে বেচারী!

অনেক কাজ পড়ে রয়েছে বলে বেশিক্ষণ জ্যাককে সঙ্গ দেয়া সম্ভব হলো না লরার পক্ষে, তবে যখনই সুযোগ হলো তখনই 'গুড ডগ, জ্যাক' বলে ওকে একটু আদর করে দিল। রাতে বিশেষ যত্ন করে খাওয়াল ওকে তারপর ওর বিছানাটা ঝেড়ে সমান করে বিছিয়ে দিল। ওর চিরকালের অভ্যাস মত আজও তিনটে পাক খেয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে শুয়ে পড়ল জ্যাক ওর বিছানায়। শোয়ার আগে জিভের ডগা দিয়ে আলতো করে ওর হাতটা একটু চেটে দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, তারপর সামনের দু'পায়ের ওপর নাক রেখে চোখ বুজল।

সকালে মই বেয়ে নেমে এল লরা। দেখল গরু-ঘোড়াকে খাওয়াতে চলেছে বাবা। কী যেন বলল বাবা জ্যাককে, কিন্তু নড়ল না ও কম্বলের ওপর আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মরে পড়ে আছে

'কেঁদো না, লরা,' জ্যাককে কবর দিয়ে ফেরার সময় বলল বাবা। 'শিকারের দেশে, আনন্দের দেশে গেছে ও।'

বাবা যখন চলে গেল, পাশে দাঁড়িয়ে লরাকে অভয় দেয়ার কেউ নেই তখন। কোনদিন আর ওর হাতের তালুতে নাক ঘষে আদর চাইবে না কেউ।

লরা বুঝতে পারল, ও আর ছোট নেই এখন। তেরো বছর অনেক বয়স। নিজের দেখাশোনা ওর নিজেকেই করতে হবে এখন থেকে।

# তিন

একদিন মালপত্র নিয়ে ওরা চেপে বসল রেলগাড়িতে।

নানান রকম লোকজন দেখতে দেখতে চলল ওরা। হঠাৎ ক্যারি জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, মা, বাবা আমাদের নিতে সত্যি আসবে তো?'

'নিশ্চয়ই আসবে। সারাদিন ওয়্যাগন চালিয়ে আসবে ক্যাম্প থেকে। আমরা ট্রেসিতে অপেক্ষা করব বাবার জন্যে।'

বাচ্চা একটা ছেলে লজেন্স-চকোলেট আর চুইংগাম ফেরি করছে। ক্যারির চোখ দুটো চকচক করে ওঠায় মা এক প্যাকেট কিনে ওর হাতে দিল। মা ছোট একটা টুকরো মুখে দিল, বাকিগুলো নিয়ে মেরি আর লরার মাঝখানে ফিরে এল ক্যারি। প্রত্যেকের ভাগে দুটো করে পড়ল লজেন্স। ওরা ঠিক করল, এখন একটা করে খাবে, বাকিটা কাল। কিন্তু একটা শেষ করে দ্বিতীয়টাও মুখে পুরল লরা। আধমিনিট পর একই কাজ করল ক্যারি। তারপর মেরিও।

ট্রেন থেমে দাঁড়াল। মালপত্র সহ নেমে পড়ল ওরা, ব্রেকম্যানের সাহায্য নিয়ে হোটেলে গিয়ে উঠল। ডাইনিং-রূমে গিয়ে খেয়ে নিল একগাদা লোকের সঙ্গে বসে। সবাই অবশ্য অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করল ওদের সঙ্গে।

খাওয়া হলে হোটেলের পার্লারে গিয়ে বসল ওরা। শুরু হলো অপেক্ষার পালা। সোফায় বসে আছে ওরা, ঢুলুনি এসে যাচ্ছে। গ্রেস আর ক্যারি ঘুমিয়ে নিল কিছুক্ষণ। মাও ঝিমাল একটুখানি। লরা জানালা দিয়ে চেয়ে রয়েছে বাইরে।

শেষ বিকেলে বহুদূরে একটা ওয়্যাগন দেখা গেল, প্রেয়ারির মাঝখান দিয়ে ধুলো উড়িয়ে আসছে এদিকে। অল্পক্ষণের মধ্যেই কাছে এসে গেল ওটা, বাবা বসে আছে ওতে লাগাম হাতে নিয়ে।

জায়গাটা হোটেল, তাই ছুটে বেরিয়ে হৈ-চৈ করা গেল না, যেমন ছিল তেমনি বসে রইল ওরা। একটু পরেই বাবার গমগমে গলা ভেসে এল, 'এই যে, মেয়েরা! কেমন আছ তোমরা?'

পরদিন সকাল-সকাল রওনা হয়ে গেল ওরা পশ্চিমের পথে। বাবা বলল, আঙ্কেল হাই প্রাথমিক চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করেছে। এখন নতুন কন্ট্রাক্ট নিয়ে আরও পশ্চিমে সরে যাচ্ছে ক্যাম্প-সাইট। লোকজন বেশিরভাগই রওনা হয়ে গেছে। শুধু আঙ্কেল হাইয়ের পরিবার আর দুয়েকজন গাড়োয়ান আছে, শেষ কুটিরগুলো ভেঙে নিয়ে চলে যাবে সবাই শীঘ্রি।

'আমরাও কি যাচ্ছি আরও পশ্চিমে?' জিজ্ঞেস করল মা।

'হ্যাঁ।'

'হোমস্টেড পেলে না খুঁজে?'

'নাহ্! খোঁজার সময় পেলাম কোথায়? তবে এবার আরও পশ্চিমে গিয়ে

খুঁজব।'

দুপুরে গাড়ি থামিয়ে একটা ছোট্ট খালের ধারে ছায়ায় বসে ডিনার সেরে নিল ওরা মাখন-রুটি আর সেদ্ধ ডিম দিয়ে। ঘোড়া দুটোর দানা খাওয়া হয়ে গেলে খাল থেকে পানি খাইয়ে নিয়ে আবার রওনা দিল বাবা।

সূর্য ডুবে গেল একসময়, তারপর আঁধার হয়ে গেল চারদিক, উজ্জ্বল তারা ফুটল আকাশে, কিন্তু পথ আর শেষ হয় না, একই গতিতে সামনে এগিয়ে চলেছে ওয়্যাগন। বাতাস বেশ ঠাণ্ডা, গায়ে হুল ফুটাতে চায়। অনেক-অনেকক্ষণ পর বাবা বলল, 'ওই যে, কুটিরের আলো দেখা যায়। উ-উ-উই যে!'

ধীরে ধীরে বড় হলো আলোটা, তারপর জানালার আকৃতি নিল। তারপর একসময় বাবা বলল, 'ওয়াও!'

আর এক কদম সামনে না বেড়ে থেমে দাঁড়াল ঘোড়া দুটো। ঘণ্টাগুলো টুং-টাং আওয়াজ তুলে চুপ হয়ে গেল। আলো হাতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল আন্ট ডোসিয়া, হাঁক ছাড়ল, 'সোজা ভেতরে চলে এসো, ক্যারোলিন। চলে এসো, মেয়েরা। ঘোড়া সামলে রেখে জলদি এসো, চার্লস; সাপার তৈরি!'

মা'র পিছু নিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ঘরে গিয়ে ঢুকল মেরি, লরা আর ক্যারি। আন্ট ডোসিয়া নিজের দুই ছেলেমেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

জিন বড়জোর এগারো বছরের হবে, তবে লেনা লরার চেয়ে বছরখানেকের বড়। কালো চোখ, কুচকুচে কালো কোঁকড়া চুল, মুখটা হাসি হাসি – এক নজরেই মনে ধরে গেল লরার।

'ঘোড়ায় চড়তে কেমন লাগে তোমার?' এই প্রশ্ন দিয়ে শুরু করল লেনা, তারপর ছুটল তুবড়ি। 'দুইটা কালো ঘোড়া আছে আমাদের। আমি ঘোড়ায় চড়তেও পারি, আবার গাড়িতে জুতে চালাতেও পারি। জিন পারে না, ছোট তো! বাবা ওকে বাগি চালাতে দেয় না। কাল সকালে আমি বাগি নিয়ে যাচ্ছি কাপড় ধোলাই করে আনতে, ইচ্ছে করলে তুমি আমার সঙ্গে যেতে পার। যাবে?'

'যাব,' বলল লরা। 'যদি মা যেতে দেয়!' ঘুমে ঢুলুঢুলু হয়ে গেছে লরার চোখ, টেবিলে বসে মনে হচ্ছে খাওয়া-দাওয়া চুলোয় যাক, এখন শুতে পারলে বাঁচে।

আঙ্কেল হাই মোটাসোটা হাসিখুশি সহজ সরল মানুষ। এই মুহূর্তে বকা খাচ্ছে আন্ট ডোসিয়ার কাছে। কারণ গোটা গ্রীষ্মকাল প্রাণান্ত পরিশ্রমের পরেও একটা পয়সা ঘরে আনতে পারেনি বেচারা।

'এত পরিশ্রম, নিজের ঘোড়াগুলোকে পর্যন্ত কোম্পানীর কাজে লাগানো, নিজেরা হাড়-কিপ্টের মত টিপে টিপে খরচ করা – এতকিছুর পর এখন হিসেব করে কোম্পানী বলছে আমাদের কাছে ওরাই নাকি টাকা পায়। এত খাটাখাটনির পরও আমাদের কিছু প্রাপ্য হয়নি, ওরাই পায়!' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সবার দিকে চাইল আন্ট, 'এর পরেও এই কোম্পানির সঙ্গে কেউ চুক্তি করে? আমি বলি, ঝাড়ু মারো চুক্তির মুখে! কিন্তু না, কে শোনে কার কথা, তিনি সই করে দিয়ে এসেছেন, আরও এক টার্ম কাজ করবেন!'

আঙ্কেল হাই তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে, লরা জেগে থাকার চেষ্টা করছে। সব মুখ কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল, কথাবার্তার শব্দ দূরে সরে

গেল, পরমুহূর্তে ঝাঁকি খেয়ে সোজা হয়ে বসল লরা। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে ধোয়া-মোছার কাজে সাহায্য করতে গেল লরা, আন্ট ডোসিয়া হাঁকিয়ে দিল; ওকে আর লেনাকে বলল সোজা গিয়ে শুয়ে পড়তে।

বিছানার অভাব, তাই লেনা, লরা আর জিনকে বাইরে ঘুমাতে হবে। জিন ঘুমাবে পুরুষদের বাঙ্কহাউসে। লরার হাত ধরে টানল লেনা, 'চলে এসো, লরা, আমরা ঘুমাব অফিস-তাঁবুতে।'

কুটির থেকে বেশ কিছুটা দূরে তাঁবু। ঘাসের ওপর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল ওরা। মুহূর্তে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল লরা। সারাটা দিন ওয়্যাগনের ঝাঁকুনিতে ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে বেচারী।

হঠাৎ মাঝরাতে বিকট এক শব্দে ভয় পেয়ে জেগে গেল লরা। বাইরের অন্ধকার থেকে আবার ভেসে এল কলজে কাঁপানো আওয়াজটা – তীক্ষ্ণ, বুনো মরণ-চিৎকার। নেকড়ে না, ইন্ডিয়ানও না; মনে হচ্ছে কবর থেকে উঠে আসা পিশাচের আর্তনাদ। ভয়ে জান উড়ে গেল লরার।

'কাকে ভয় দেখাতে এসেছ, অ্যাঁ?' চেঁচিয়ে ধমক দিল লেনা। 'আমাদেরকে শহরের মেয়ে পাওনি, যে ভয়ে মরে যাব। জঙ্গলে বড় হয়েছি আমরা! যাও, ভাগো এখান থেকে!' চাপা কণ্ঠে লরাকে বলল, 'জিন বদমাশটার কাজ!'

আবার চেঁচিয়ে উঠল জিন। লেনা বলল, 'গেলি এখান থেকে! নইলে এই আসলাম, ধাওয়া করে ধরে টেনে চুল ছিঁড়ব!'

এইবার ভয় পেল পিশাচ। 'আচ্ছা, ঠিক আছে, গেলাম,' বলে সরে গেল তাঁবুর ধার থেকে। ঘুমিয়ে পড়ল লরা।

লেনার সঙ্গে কাটানো কয়েকটা দিনের কথা জীবনে ভুলবে না লরা।

সকালে উঠে কম্বলটা ভাঁজ করতেই বিছানা গুছানোর কাজ শেষ। জামা-কাপড় তো সব পরাই আছে। হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল ওরা তাঁবু থেকে।

'জলদি চলো, লরা,' তাগাদা দিল লেনা। 'নাস্তাটা খেয়েই বেরিয়ে পড়ব বাগি নিয়ে কাপড় ধোলাই করাতে!'

প্যান কেক ভাজছে আন্ট ডোসিয়া, বাকি সবাই বসে পড়েছে টেবিলে। ওদের দুজনকে দেখেই তাড়া লাগাল আন্টি, 'জলদি হাত-মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে এসো, আলসে বুড়িরা! নাস্তা দেয়া আছে টেবিলে! বাচ্চা মেয়েরা এত বেলা পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমায় কেউ?' পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় হাসতে হাসতে লেনার পেছনে একটা চাপড় লাগিয়ে দিল আন্ট ডোসিয়া। আজ সকালে আঙ্কেল হাইয়ের মতই খোশ মেজাজে আছে আন্টি।

হৈ-চৈ করে নাস্তা খেল সবাই। বাবার অট্টহাসি জমিয়ে রাখল টেবিল। থালা-বাসন ধুতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠল লরা। তাই দেখে লেনা বলল, এ তো কিছুই না, দিনে তিনবার করে ধুয়েছে ও আর আন্ট ডোসিয়া ছিচল্লিশ জনের থালা, তারই ফাঁকে ফাঁকে রান্না করেছে। সূর্য ওঠার আগে শুরু হয়েছে কাজ, মাঝরাত পর্যন্ত চলেছে একটানা – তাও সামাল দেয়া যায়নি। সেই জন্যই তো কাপড়গুলো ধুয়ে দেয়ার জন্য তিন মাইল দূরের এক হোমস্টেডারের স্ত্রীর সঙ্গে চুক্তি করেছে আন্টি।

যেতে তিন মাইল, আসতে তিন মাইল – মোট ছয় মাইল আজ বাগি হাঁকিয়ে যাবে-আসবে ওরা।

দুজনে মিলে বাগিতে জুতে ফেলল ঘোড়াগুলোকে, তারপর ছুটল। ঘোড়াদুটো কিছুদূর গিয়েই নাকে নাক ঠেকায়, তারপর চিঁহিঁ ডাক ছেড়ে ছুট লাগায় পক্ষিরাজের মত। আরও জোরে ছোটার জন্য তাগাদা দেয় লেনা। টের পেয়ে আরও বাড়ায় ওরা গতি।

লরা আর লেনার হাসি গিয়ে ঠেকেছে দুই কানে। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছে লেনা, 'হাই! য়ি! য়ি, য়ি, য়ি-ই-ই!'

বিপজ্জনক গতিতে পিছনে সরে যাচ্ছে দুপাশের দৃশ্য,যেন হাওয়ায় ভেসে চলেছে বাগিটা। গান ধরল লেনা

"যুবকটিকে চিনি আমি, দেখতে চমৎকার,
সাবধান! সাবধান!
খুশি করার চেষ্টা দেখে ভয় লাগে যে,
সাবধান! সাবধান!"

এ ধরনের গান আগে শোনেনি লরা, কিন্তু শিখে নিতে একটুও অসুবিধা হলো না। ও-ও ধরল লেনার সঙ্গে :

"ও তোমাকে ঠকাতে চায়, সন্দেহ নেই আর,
সাবধান! সাবধান!
ওর কথায় ভুললে পরে মরবে, মেয়ে
সাবধান! সাবধান!"

'হাই, য়ি, য়ি, য়ি য়িপ্পি-ই-ই!' একযোগে চেঁচাচ্ছে দুজন। কিন্তু আর বেশি জোরে ছোটার সাধ্য নেই ঘোড়ার।

"চাষার বউ কে হয়, ছিহ্,
সারাটা দিন ধুলোয় কাদায় নোংরা,
তারচে' আমার বর হোক কোনও
ডোরা জামা পরা ছোকরা।
আহা, রেলওয়ের লোক, রেলওয়ের লোক
রেলওয়ের লোক চাই,
রেলওয়ে থেকেই মনের মতন
বর যেন খুঁজে পাই।"

রাশ টেনে ঘোড়ার গতি কমাল লেনা। ওদের কিছুটা বিশ্রাম দেয়া দরকার। প্রায় হাঁটার গতিতে চলেছে এখন। মনে হচ্ছে ধীর, শান্ত হয়ে গেছে পরিবেশটা।

'আমি যদি তোমার মত বাগি চালাতে পারতাম!' বলল লরা। 'কত চেয়েছি, কিন্তু বাবা কিছুতেই দেয় না।'

'সোজা তো!' বলল লেনা, 'কঠিন কিছুই না। দেখো চেষ্টা করে,' বলে ওর হাতে রাশ তুলে দিতে যাচ্ছিল এমনি সময়ে আবার নাকে নাক ঠেকাল ঘোড়া দুটো, এবং পরমুহূর্তে চিঁহিঁ ডাক ছেড়ে ছুট লাগাল জোর কদমে। 'ঠিক আছে, ফেরার সময় পুরোটা রাস্তা তুমি চালিয়ো, কেমন?'

ধোয়া কাপড় নিয়ে ফিরে আসার সময় লেনার কাছ থেকে শিখে নিল লরা রাশ ধরে ঘোড়া নিয়ন্ত্রণের কৌশল, এবং সত্যিই চালিয়ে নিয়ে এল বাগিটা। বিকেলে ওকে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়ে দেবে বলে কথা দিল লেনা। খোলামেলা, নিরহঙ্কার, বড় মনের এই মেয়েটাকে খুব ভাল লেগে গেল লরার।

বিকেলে জিনের ঘোড়াটার পিঠে তুলে দেয়া হলো লরাকে। ওফ্, ঘোড়ায় চড়া যে এত মজার তা কে জানত! কখনও কেশর ধরে কোনমতে ঝুলে থেকেছে, কখনও জোরে ছোটার জন্য হাঁক ছেড়েছে ইন্ডিয়ানদের মত, কখনও দড়াম করে আছড়ে পড়েছে মাটিতে, তারপর আবার কারও সাহায্য ছাড়াই লাফিয়ে উঠেছে ঘোড়ার পিঠে। এক বিকেলেই ছাত্রীকে রীতিমত শিক্ষিত করে তুলেছে লেনা। দুজনে ঘোড়া নিয়ে এতই মগ্ন ছিল যে সাপারের জন্য আন্ট ডোসিয়ার ডাক শুনতেই পেল না কেউ; শেষে বাবা বেরিয়ে এসে যখন বিকট হাঁক ছাড়ল, তখন কানে বাতাস গেল।

খাবার টেবিলে বসে হাঁ করে চেয়ে রইল মা লরার দিকে, যেন চিনতে পারছে না নিজের মেয়েকে। 'আশ্চর্য, ডোসিয়া! মাত্র একটা দিনেই পুরোপুরি বুনো ইন্ডিয়ান হয়ে গেল কী করে মেয়েটা!'

'ও আর লেনা – টাকার এপিঠ-ওপিঠ। এই একটা মাত্র দিন নিজের খুশিমত চলার সুযোগ পেয়েছে লেনা বেচারী। গত তিনটে মাস তো কাজের চাপে পিঠ সোজা করারও সময় পায়নি, পরের তিনটে মাসও পাবে না।'

# চার

পরদিন সকালে আবার ওয়্যাগনে চাপল ওরা। মালপত্র নামানো হয়নি, তাই ঘুম থেকে উঠেই রওনা হতে দেরি হলো না। 'বিগ সিউ রিভার' পেরিয়ে যেতে হবে পশ্চিমে। দেখা গেল বিরাট নদীটা এখন প্লাম ক্রীকের চেয়ে মোটেই বড় বা গভীর নয়।

নদী পেরিয়ে আর কোন রাস্তা নেই। বিশাল প্রেয়ারির মাঝখান দিয়ে গাড়ির চাকার আবছা দাগ দেখে এগোতে হচ্ছে। কোথাও মানুষজন বা বসতির চিহ্ন নেই।

দুপুর বেলা ওয়্যাগন থামিয়ে খেয়ে নিল ওরা। ঘোড়াদেরও দানাপানি খাইয়ে নেয়া হলো, কারণ পরের ত্রিশ মাইল কোথাও পানি পাওয়া যাবে না।

বিকেল গড়িয়ে যখন সন্ধে হয়-হয়, তখন দেখা গেল একজন ঘোড়সওয়ার আসছে ওদের পিছু পিছু। লোকটার হাবভাব বিশেষ সুবিধের মনে হলো না।

'সিলভার লেক আর কতদূর, চার্লস?' জানতে চাইল মা।

'মাইল দশেক,' জবাব দিল বাবা।

'এর মধ্যে আর কোনও লোক-বসতি নেই?'

'না।'

বাবা যতবার পিছন ফিরে চাইছে, ততবারই লাগামের দড়ি ঝাঁকিয়ে আরও জোরে ছোটার ইঙ্গিত করছে ঘোড়াগুলোকে। কিন্তু ওয়্যাগনে জোতা ঘোড়া পিঠে সওয়ারি নেয়া ঘোড়ার সঙ্গে পারবে কেন? ক্রমে এগিয়ে আসছে পেছনের ঘোড়াটা।

অনেক কাছে চলে এসেছে লোকটা এখন। লোকটার কোমরের দুপাশে দুটো পিস্তল ঝুলানো দেখতে পেল লরা। বাবার কাছেও অস্ত্র আছে, জানে লরা। কিন্তু কোথায় রেখেছে ওটা বুঝতে পারছে না। কোনও প্রশ্ন না করে চুপ করে থাকল ও। হঠাৎ পিছনে তাকিয়ে আরও একজন ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল লরা। লাল শার্ট পরে আছে দ্বিতীয়জন, আসছে একটা সাদা ঘোড়ায় চেপে। দ্রুত।

কাছের লোকটাকে ধরে ফেলল পেছনের জন। এখন একসাথে আসছে ওরা।

নিচু গলায় মা বলল, 'ওরা এখন দুজন, চার্লস!'

ভয় পেয়ে মেরি বলে উঠল, 'কী হয়েছে, লরা? ব্যাপারটা কী?'

চট করে পিছনে তাকাল বাবা। মুহূর্তে স্বস্তি ফুটে উঠল বাবার চেহারায়। বলল, 'আর চিন্তা নেই। ও হচ্ছে বিগ জেরি।'

'কে?' জানতে চাইল মা, 'বিগ জেরি কে?'

'ও একজন হাফ-ব্রীড, ফ্রেঞ্চ আর ইন্ডিয়ান মিশেল,' বলল বাবা। 'জুয়াড়ি। কেউ কেউ বলে ঘোড়াচোর। তবে খুব ভাল লোক, অন্তত আমার সঙ্গে ভাল। ও কাছেপিঠে থাকতে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না।'

অবাক চোখে বাবার দিকে চেয়ে রইল মা। কিছু বলার জন্য মুখ খুলেও বন্ধ করে ফেলল আবার।

রাইডাররা ওয়্যাগনের পাশে চলে এল। একটা হাত তুলে বাবা বলল, 'হ্যালো, জেরি!'

'হ্যালো, ইঙ্গলস্!' উত্তর দিল বিগ জেরি। ওয়্যাগনের পাশে পাশে চলছে।

অপর লোকটা বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে ভ্রূ কুঁচকে একবার ওদের দিকে চেয়েই ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে চলে গেল সামনে।

বিগ জেরিকে দেখতে ইন্ডিয়ানই মনে হয়। লম্বা এবং চওড়া হলেও গায়ে মেদের চিহ্ন নেই। বাদামি গায়ের চামড়া। লম্বা কালো চুল উড়ছে হাওয়ায়। হ্যাট নেই মাথায়, ঘোড়ায় জিন বা লাগাম নেই। কয়েক সেকেন্ড পাশাপাশি চলার পর গতি বাড়িয়ে এগিয়ে গেল জেরি। সোজা অস্তগামী সূর্যের দিকে চলতে চলতে এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে।

মা ভয় পাচ্ছে, ডাকাতটা সুযোগ পেলে আবার ফিরে আসবে। কিন্তু বাবা

বলল, 'তুমি কিচ্ছু ভেবো না, ক্যারোলিন। বিগ জেরি গেছে ওর পিছনে, আমরা নিরাপদে ক্যাম্পে না পৌঁছা পর্যন্ত থাকবে ওর সঙ্গেই।'

মা কিছু বলল না, কিন্তু লরা জানে তার মনের কথা। প্লাম ক্রীক ছেড়ে নড়তে চায়নি মা। এরকম চোর-ডাকাত ভরা নির্জন প্রান্তরে সাঁঝ-রাতে অনিশ্চিত পথ চলা মা'র মোটেই পছন্দ নয়।

মাথার উপর রাজহাঁসের ডাক শোনা গেল। বিরাট একটা ঝাঁক চলেছে সিলভার লেকের দিকে। একটা দুটো করে অনেক তারা ফুটল আকাশে। গড়গড়িয়ে এগিয়ে চলেছে ওয়্যাগন বহুদূরের কয়েকটা আলো লক্ষ্য করে।

ঢুলছিল, গাড়ি থামতেই চমকে চোখ মেলল লরা। দেখল, একটা কুটিরের খোলা দরজা দিয়ে উজ্জ্বল আলো আসছে, আর সেই আলোর মধ্য দিয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে আঙ্কেল হেনরি। তা হলে আঙ্কেল হেনরির বাড়িতে বেড়াতে এসেছে ওরা! কিন্তু সে তো বিগ উড্‌স্ জঙ্গলে। প্রেয়ারিতে চলতে চলতে হঠাৎ বিগ উডসে পৌঁছল কী করে ওরা?

'আরে, হেনরি!' বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মা।

হেসে উঠল বাবা। 'কেমন চমকে দিলাম, ক্যারোলিন? হেনরির কথা বলিনি তোমাকে অবাক করে দেব বলে!'

'সত্যিই অবাক হয়েছি! আশ্চর্য!'

লম্বাচওড়া আরেক লোক হাসছে লরার দিকে চেয়ে। হঠাৎ চিনতে পারল লরা – এ হচ্ছে সেই চার্লি, জই খেতে যাকে কামড় দিয়েছিল হাজার হাজার হলুদ জ্যাকেট পরা সৈনিক ভীমরুল। 'হ্যালো, আধ-বোতল! হ্যালো, মেরি! আরে, সেই ছোট্ট ক্যারি এখন এত বড়টা হয়েছে!' চাচাত বোনদের সবাইকে নামতে সাহায্য করল চার্লি, আঙ্কেল হেনরি গ্রেসকে ধরল, বাবা নামতে সাহায্য করল মাকে। এবার কুটির থেকে বেরিয়ে এল চাচাত বোন লুইজা, হৈ-হৈ করে সবাইকে খেদিয়ে নিয়ে গেল কুটিরের ভেতর।

কাজিন লুইজা আর চার্লি দুজনেই বড় হয়ে গেছে। ওরা এখানে একটা বোর্ডিং চালায়। কাজের লোকেদের জন্য খাবার সংগ্রহ ও রান্না করে পরিবেশন করাই প্রধান কাজ। রাতের খাওয়া সেরে লোকজন সবাই এখন ঘুমাতে গেছে বাঙ্ক-হাউসে। কথার ফাঁকে ফাঁকে গরম করে রাখা খাবার সাজিয়ে ফেলল লুইজা টেবিলে।

খাওয়া-দাওয়ার পর একটা বাতি হাতে বাবার জন্য তৈরি করা কুটিরে পৌঁছে দিল ওদেরকে আঙ্কেল হেনরি।

'সব নতুন কাঠ দিয়ে তৈরি, ক্যারোলিন – একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,' বলল আঙ্কেল হেনরি। আলো উঁচু করে দেখাল ঘরের ভেতরটা। একপাশে একটা বাঙ্ক বাবা-মার জন্য, অপর দেয়ালে উপর-নীচে দুটো বাঙ্ক – একটা লরা আর মেরির, অপরটা ক্যারি আর গ্রেসের জন্য। সবকটা বাঙ্ক বিছানা পেতে একেবারে রেডি করে রেখেছে কাজিন লুইজা, এখন শুধু শোয়ার অপেক্ষা।

কৃতজ্ঞচিত্তে শুয়ে পড়ল ওরা যে যার বিছানায়, লেপ টেনে নিল নাক পর্যন্ত। বাবা নিভিয়ে দিল বাতি।

কয়েকদিন পর জিন আর লেনাকে নিয়ে ক্যাম্প-সাইটে পৌঁছল আন্ট ডোসিয়া। সঙ্গে গরু এনেছে দুটো। বলল, 'এর একটা তোমার, চার্লস। এখানে দুধ পেতে হলে গরু পালতেই হবে।'

আন্ট ডোসিয়ার ওয়্যাগনের পিছন থেকে একটা গরুর গলায় বাঁধা রশি খুলে নিয়ে লরার হাতে ধরিয়ে দিল বাবা। 'এই নাও, লরা। গরুর দায়িত্ব নেয়ার মত বয়স হয়েছে তোমার। নিয়মিত ঘাস-পানি খাওয়াবে, দুধ দোয়াবে, আর খুঁটিটা ভালমত গাড়বে মাটিতে।'

দুই বান্ধবীর গল্প করার ভাল সুযোগ হয়ে গেল এর ফলে। রোজ সকালে একসঙ্গে যায় দুজন যার যার গরুকে ঘাস খাওয়ার জন্য বেঁধে রাখতে, দুপুরে যায় ওদের লেক থেকে পানি খাইয়ে আনতে, বিকেলে যায় দুধ দোয়াতে। তখন গান গায় ওরা। গরু দুটো আনমনে জাবর কাটে, ভাব দেখায় যেন মগ্ন হয়ে শুনছে গান। বালতি ভরা দুধ নিয়ে ফিরে যায় ওরা যে যার কুটিরে।

একদিন লরাকে নিয়ে কোথায় কীভাবে কী কাজ হচ্ছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে আনল বাবা। লরার মনে হলো কাজের কাজ হলো একটা। কিন্তু মেরি বলল, 'কাদা-মাটি-ধুলোয় একগাদা কর্কশ স্বভাবের পুরুষ লোক কাজ করছে, এর মধ্যে কী এমন আছে ভাল লাগার আমি বুঝি না। তার চেয়ে ঘরের মধ্যে ছায়ায় বসে সেলাই করা অনেক ভাল।'

# পাঁচ

বেতনের সময় এসে গেলে সন্ধের পরও স্টোরের পিছনে অফিসঘরটায় বসে কাজ করতে হয় বাবাকে।

প্রথমে টাইম-বই থেকে হিসেব করে বের করতে হয় কে কতদিন কাজ করেছে, তারপর বের করতে হয় প্রত্যেকের প্রাপ্য বেতনের পরিমাণ। তারপর স্টোর থেকে কে কত টাকার জিনিস বাকি নিয়েছে এবং খাওয়া-থাকা বাবদ কার কত টাকা বিল হয়েছে – এ দুটো যোগ দিয়ে প্রাপ্য বেতন থেকে বাদ দিতে হয়। যা অবশিষ্ট থাকল সেই টাকা পরিশোধ করাই বাবার কাজ। প্রত্যেকের হিসেব আলাদা আলাদা কাগজে লিখে যার যার পাওনা টাকার পরিমাণ টুকে রাখে বাবা, পাঠিয়ে দেয় হেড-অফিসে এবং টাকা এলে সেই মত বেতন দেয়।

একদিন সকালে লরা দেখল একটা বাগি এসে থামল স্টোরের সামনে। একজন ধোপদুরস্ত কাপড় পরা লোক দ্রুতপায়ে গিয়ে ঢুকল স্টোরের ভেতর। আরও দুজন লোক আছে বাগিতে, তারা ঘাড় ফিরিয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে সতর্ক দৃষ্টিতে। লরার মনে হলো কোনও কারণে ভয়ে তটস্থ হয়ে রয়েছে লোক দুজন।

একটু পরেই প্রথম লোকটা ফিরে এল বাগিতে, চারদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নজর বুলিয়ে নিয়ে চলে গেল লোকগুলো দ্রুতবেগে।

লোকগুলোর হাবভাব দেখে কলজে কাঁপতে শুরু করল লরার। কারা এরা? কিছু একটা ঘটেছে স্টোরে – কী সেটা? বাবার কোন বিপদ হলো না তো?

বাইরে গিয়ে খোঁজ নিতে যাবে, এমন সময় দেখতে পেল স্টোর থেকে বেরিয়ে এইদিকেই আসছে বাবা। ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল বাবা, তারপর পকেট থেকে ভারি একটা ক্যানভাসের ব্যাগ বের করে দিল মাকে। 'এটা সাবধানে কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারবে, ক্যারোলিন? লোকজনের বেতন আছে এতে। কেউ চুরি করতে চাইলে এখানে না, অফিসে আসবে।'

ব্যাগটা পরিষ্কার কাপড়ে মুড়ে নিয়ে ময়দার বস্তার গভীরে ঢুকিয়ে রাখল মা। বলল, 'কেউ ভাবতেই পারবে না, এখানে টাকা থাকতে পারে।'

'একটু আগে যে এসেছিল, ওই লোকটাই দিয়ে গেল এটা, বাবা?'

'হ্যাঁ, ও হচ্ছে পে-মাস্টার,' বলল বাবা।

'সঙ্গের লোকগুলো এত ভয় পাচ্ছিল কেন?'

'ভয় পাচ্ছিল একথা ঠিক বলা যায় না,' বলল বাবা। 'ওদের দায়িত্ব হচ্ছে পে-মাস্টারকে গার্ড দিয়ে রাখা, যাতে কেউ টাকাগুলো কেড়ে না নিতে পারে। সাবধান ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই – বিভিন্ন ক্যাম্পের বেতন হাজার হাজার ডলার রয়েছে ওই লোকটার কাছে। কেউ কেড়ে নিতে চাইলে মুহূর্তে অস্ত্রশস্ত্র বের করবে ওরা।'

বাবা স্টোরে ফিরে যাওয়ার সময় তার হিপ-পকেটে রাখা রিভলভারের হ্যান্ডেলটা দেখতে পেল লরা। বুঝতে পারল, বাবাও আসলে ভয় পাচ্ছে না, সাবধানতা অবলম্বন করছে কেবল। দরজার ওপর ঝুলিয়ে রাখা রাইফেলটার দিকে চোখ গেল লরার, দরজার পাশে দাঁড় করানো বন্দুকটা দেখল। মা জানে ওগুলো চালাতে। ডাকাতি হওয়ার ভয় নেই।

সেই রাতে বারবার ঘুম ভেঙে গেল লরার, খেয়াল করল বাবাও বাঙ্কে এপাশ-ওপাশ ফিরছে। ময়দার বস্তায় টাকাগুলো থাকায় অন্যরকম লাগছে আজকের রাতটা, যদিও কারও বোঝার উপায় নেই কোথায় রাখা হয়েছে ওগুলো।

খুব ভোরে উঠে থলেটা স্টোরে নিয়ে গিয়ে রাখল বাবা। কারণ আজই বেতনের দিন। নাস্তার পর একজন একজন করে ভেতরে ঢুকল, তারপর বেরিয়ে এসে এখানে ওখানে জটলা পাকিয়ে মেতে উঠল গল্প-গুজবে। আজ বেতনের দিন – কাজ করবে না কেউ।

রাতের খাবার খেয়ে বাবা বলল, আবার তাকে অফিসে ফিরে যেতে হবে। কারণ, পুরো মাসের বদলে কেবল দুই সপ্তাহের বেতন পেয়ে কেউ কেউ নাকি অসন্তুষ্ট।

'এক মাসের বেতন দেয়ায় অসুবিধে কী?' জিজ্ঞেস করল লরা।

'এতগুলো লোকের বেতনের হিসেব কষতে তো সময় লাগে। আমি রিপোর্ট দিলে তবে না পে-মাস্টার সেই হিসেবে টাকা আনবে। সেজন্যে পনের দিন করে সব সময় পিছিয়ে থাকে বেতনের হিসেব। আজ পর্যন্ত যার যা পাওনা হয়েছে, সেটা দিতে পারব ঠিক পনেরো দিন পর। কেউ কেউ বুঝতে চায় না কিছুতেই, কিংবা চেষ্টা করেও পারে না বুঝতে। ওরা চায়, গতকাল পর্যন্ত যা পাওনা হয়েছে

সব ওদের দিয়ে দেয়া হোক।'

'ওরা কি এজন্যে তোমাকে দায়ী মনে করে?' এবার প্রশ্ন করল মেরি।

'হয়তো করে, ঠিক জানি না,' বলল বাবা। 'যাই, কিছু হিসাব বাকি আছে, সেরে ফেলি গিয়ে।'

কাজ-কর্ম সেরে গ্রেসকে নিয়ে রকিং চেয়ারে দোল দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে মা, লরা আর মেরি বসে আছে দরজার পাশে, বাইরে। একটা, দুটো করে তারা ফুটছে আকাশে। স্টোরের ভিতর বাতি জ্বেলেছে বাবা। হঠাৎ ডাকল লরা, 'মা! দেখো, একদল লোক!'

অনেক লোক ভিড় করেছে স্টোরের সামনে। কেউ কোন শব্দ করছে না, কিন্তু ভিড় বাড়ছে দ্রুত, অন্ধকারে জড়ো হচ্ছে ওরা যেন কী এক অশুভ উদ্দেশ্যে।

চট্ করে গ্রেসকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এল মা, দেখল ভিড়টাকে। নিচু গলায় বলল, 'তোমরা ভেতরে চলে এসো!'

ওরা ভিতরে আসতেই দরজা ভিড়িয়ে দিল মা, শুধু সামান্য একটু ফাঁক রাখল দেখার জন্য। ক্যারিকে নিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল মেরি। কিন্তু লরা মা'র বগল তলা দিয়ে চোখ রাখল দরজার ফাঁকে। দু'জন লোক ধাপ বেয়ে উঠে দরজায় কিল দিল। দলের সবাই চুপ। একটু পর আবার দুটো থাবড়া দিল ওরা দরজায়. একজন হাঁক ছাড়ল, 'ইঙ্গলস্! দরজা খোলো!'

খুলে গেল দরজা। বাতির আলোয় দেখা গেল দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে বাবা। পিছনে হাত নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল বাবা। যে দুজন দরজায় ধাক্কা দিয়েছিল, তারা পিছিয়ে ভিড়ে মিশে গেল। দু'পকেটে হাত ভরে ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে বাবা, শান্ত গলায় বলল, 'হ্যালো, বয়েজ, বলো, কী চাই? কী সমস্যা তোমাদের?'

ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'আমাদের বেতনটা চাই।'

আরও কয়েকটা গলা শোনা গেল, 'পুরো বেতন!'

'বাকি পনেরো দিনের বেতন, যেটা তুমি রেখে দিয়েছ!'

'আমাদের বেতন আদায় করে ছাড়ব আমরা!'

'দুই সপ্তাহ পরে পাবে সেটা, তোমাদের টাইম-চেক তৈরি হলেই পেয়ে যাবে।'

এবার আরও কয়েকজন গর্জে উঠল, 'আমাদের পাওনা টাকা আমরা এক্ষুণি চাই!'

'ধানাই-পানাই ছাড়ো, ইঙ্গলস!'

'এখনই দিতে হবে আমাদের বেতন!'

'কী করে দেব বলো?' শান্ত গলায় বলল বাবা, 'পে-মাস্টার না এলে আমি টাকা পাব কোথায়?'

'গুদাম খুলে দাও!' চেঁচিয়ে উঠল একজন।

এইবার একসঙ্গে হল্লা করে উঠল সবাই, 'ঠিক, ঠিক! স্টোর খুলে দাও, তা হলেই চলবে!'

'খোলো গুদাম!'

'অসম্ভব, সেটি হচ্ছে না,' ঠাণ্ডা গলায় বলল বাবা। 'কাল সকালে এসো, তোমাদের যার যা দরকার নিতে পারবে, লেখা থাকবে তোমাদের অ্যাকাউন্টে।'

'খোলো গুদাম!' ধমকে উঠল একজন, 'তা নইলে আমরা খুলছি!' জনতার মধ্যে থেকে হিংস্র একটা গর্জন উঠল। একসঙ্গে এগোল ওরা বাবার দিকে।

নিচু হয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল লরা, কিন্তু মা ওর কাঁধ ধরে টেনে পিছিয়ে আনল।

'যেতে দাও! আমাকে যেতে দাও!' ফোঁপাচ্ছে লরা। 'মারবে ওরা বাবাকে! ছাড়ো আমাকে!'

'চুপ!' অদ্ভুত এক সুরে বলল মা, 'একদম চুপ!'

'অ্যাই, সরে দাঁড়াও!' বাবার গলা শোনা গেল, 'আমার দিকে চেপে এসো না, পরে কিন্তু পস্তাবে!'

এবার জটলার পিছন থেকে ভারি একটা কণ্ঠ শোনা গেল, 'কী ব্যাপার, কী হচ্ছে এখানে?'

অন্ধকারে লাল শার্ট দেখতে না পেলেও মাথাটা সবার মাথা ছাড়িয়ে গেছে দেখে লরা চিনতে পারল বিগ জেরিকে, বেশ কিছুটা দূরে ওর সাদা ঘোড়াটাকেও দেখতে পেল আবছামত। কয়েকজন একসঙ্গে কথা বলছে। সব শুনে হা-হা করে হেসে উঠল বিগ জেরি।

'আরে, বুদ্ধুরা!' হাসতে হাসতেই বলল বিগ জেরি, 'এখন জোরাজুরি করতে গেলে গোলাগুলি হবে। কী দরকার ঝামেলায় যাওয়ার? কাল দেবে বলেছে, তো কাল নিতে অসুবিধে কী? ও তো আর মাল নিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে না, কালও থাকবে সব। যার যা খুশি নেব আমরা কাল, নিজেদের বিবেক ছাড়া বাধা দেয়ার কেউ নেই।'

খুবই অমার্জিত ভাষা ব্যবহার করছে বিগ জেরি, ভূরি ভূরি অশ্লীল শব্দ ফুটন্ত খইয়ের মত বেরোচ্ছে ওর মুখ দিয়ে, কিন্তু ওসব কিছুই খেয়াল করল না লরা – মনটা ভেঙে গেছে ওর বিগ জেরিকে বাবার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দেখে।

ভিড় এখন বিগ জেরিকে ঘিরে। কয়েকজনকে নাম ধরে ডেকে কথা বলছে জেরি, মদ-তাস-ফূর্তির কথা বলছে। বেশ কয়েকজন ওর সঙ্গে চলল বাঙ্কহাউসের দিকে, বাকিরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সরে গেল এদিক ওদিক।

দরজাটা বন্ধ করে দিল মা, বলল, 'শুয়ে পড়ো এবার।'

সকালে উঠে একটা উত্তেজনার আভাস পাওয়া গেল ক্যাম্প এলাকায়। উঁচু গলায় কথা বলছে লোকজন। দেখা গেল, বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে এল বিগ জেরি, লাফিয়ে নিজের সাদা ঘোড়ায় উঠে ডাকল সবাইকে, 'চলে এসো, মজা লুটতে হলে চলে এসো আমার সঙ্গে!' বুনো হাঁক ছাড়ল সে, তারপর রওনা হয়ে গেল পশ্চিমে।

সবাই ছুটে গেল আস্তাবলের দিকে, যার যার ঘোড়ায় চড়ে পিছু নিল বিগ জেরির। দুই মিনিটের মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেল ক্যাম্প।

দেখা গেল স্টোর থেকে বেরিয়ে বোর্ডিং-হাউসের দিকে যাচ্ছে বাবা। ওখান থেকে বেরিয়ে এল ফোরম্যান ফ্রেড, বাবার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলে আস্তাবল

থেকে নিজের ঘোড়াটা নিয়ে সে-ও চলে গেল পশ্চিম দিকে।

হাসতে হাসতে ঘরে ফিরে এল বাবা। মা হাসির কারণ জিজ্ঞেস করায় বলল, 'ওই, বিগ জেরি! সবকটা বদমাশকে সরিয়ে নিয়ে গেল অন্যদিকে।'

'কোন্ দিকে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল মা।

'স্টেবিন্সের ক্যাম্পে গোলমাল হয়েছে। চারদিকের ক্যাম্প থেকে ওদিকে ছুটেছে সবাই, এদেরকেও নিয়ে গেল বিগ জেরি।'

সারাটা দিন নীরব থাকল গোটা ক্যাম্প। লরা বা মেরি কেউ বের হলো না ঘর থেকে, কারণ, কখন কী হয় কেউ বলতে পারে না। স্টেবিন্সে কী ঘটছে জানা যাচ্ছে না। সারাদিন উদ্বেগের মধ্যে কাটল মা'র, নিজের অজান্তেই থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সন্ধের পর ফিরে এল লোকগুলো। অনেক শান্ত হয়ে গেছে এখন। ঘোড়া রেখে সোজা গিয়ে ঢুকল বোর্ডিংহাউসে, ওখান থেকে খেয়ে চলে গেল বাঙ্কহাউসে নিজ নিজ বিছানায়।

অনেক রাতে বাবা যখন স্টোর থেকে ফিরল, লরা আর মেরি তখনও জেগে। শুনতে পেল পর্দার ওপাশে মাকে বলছে বাবা, 'আর কোনও চিন্তা নেই, ক্যারোলিন। ক্লান্ত হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে সবাই।' হাই তুলে জুতো খোলার জন্য ঝুঁকল বাবা।

'এরা ওখানে গিয়ে কী করল, চার্লস? কেউ জখম হয়নি তো?'

'শুধু একজন। নিজেদের মধ্যে লেগে গিয়ে একজন জখম হয়েছে। ওকে একটা ওয়্যাগনে তুলে পুবে রওনা হয়ে গেছে কয়েকজন ডাক্তারের খোঁজে। তারপর পে-মাস্টারকে ফাঁসীতে··· এত ভেঙে পোড়ো না, ক্যারোলিন। আর বেশিদিন নেই, এদিকের কাজ প্রায় শেষ। কিছুদিনের মধ্যেই উঠে যাবে ক্যাম্প, আমরাও আমাদের হোমস্টেডে বসে যাব।'

'কবে থেকে খুঁজতে শুরু করবে?' জিজ্ঞেস করল মা।

'ক্যাম্প ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই। বুঝতেই পারছ, এখন স্টোর ছেড়ে এক পা নড়ার উপায় নেই আমার।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। পে-মাস্টারকে যারা খুন করল তাদের কিছু হলো না?'

'খুন করেনি তো,' বাবা বলল, 'করতে গেছিল। ওখানেও ওদের একই দাবি, গতকাল পর্যন্ত যা পাওনা হয়েছে – দিয়ে দাও। ওখানে সাড়ে তিনশোর মত লোক, বেশিরভাগই পিস্তল ঝোলায় কোমরে। তাদের ভয়ে দরজায় তালা দিয়ে একটা ফোকর দিয়ে বেতন দেয় ওখানকার পে-মাস্টার। পুরো মাসের বেতন দেয়া সম্ভব নয় শুনে খেপে গেল ওরা। এদিকে হৈ-হল্লা করতে করতে ওদের নিজেদেরই দুজনের মধ্যে ঝগড়া বেধে গিয়ে একজন দাঁড়ি-পাল্লার বাটখারা তুলে মেরে দিয়েছে আরেকজনের মাথায়। কাটা কলাগাছের মত ধপাস করে পড়েছে লোকটা। বাইরে নিয়ে অনেক সাধ্য-সাধনা করেও জ্ঞান ফিরছে না দেখে খোঁজ পড়ল যে মেরেছে তার। কিন্তু তাকে তখন পাবে কোথায়, সে তো পালিয়েছে।

'কাজেই একটা রশি নিয়ে তার পেছনে ছুটল সবাই। কিন্তু সে তখন এই মুলুকে আছে নাকি! দুপুর পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করে হয়রান হয়ে শেষে একজনের

মাথায় বুদ্ধি এল – আয়, পে-মাস্টারটাকেই ঝুলিয়ে দিই। হয় পুরো বেতন দিক, নয়তো ঝুলে মরুক। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। দুজন ছাতের তক্তা সরিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে, তারপর দড়ির ফাঁস পরিয়ে দিল তার গলায়।'

'থামো!' বাধা দিল মা, 'মেয়েরা সব জেগে!'

'আরে, বললে কোনও ক্ষতি নেই,' হাসল বাবা। 'বার দুয়েক গলায় টান পড়তেই ওদের দাবি মেনে নিয়েছে পে-মাস্টার।'

'ফাঁসী দেয়নি তা হলে?'

'না। ওদিকে কজন মিলে স্টোরের দরজা প্রায় ভেঙে ফেলছে দেখে দরজা খুলে দিয়েছে স্টোরকীপার। ভেতরে ঢুকে একজন পে-মাস্টারের গলার দড়ি কেটে দিতেই যে যত টাকা দাবি করেছে দিয়ে দিয়েছে সে। এই ফাঁকে অন্যান্য ক্যাম্পেরও কয়েকজন বেতন নিয়েছে ওখান থেকে। টাইম চেক-মেক সব চুলোয় গেছে।'

'ছি,' বলে উঠল লরা, 'আমি হলে দিতাম না। কিছুতেই না!'

'কী কিছুতেই দিতে না, লরা?' পর্দা সরিয়ে জিজ্ঞেস করল বাবা।

'বেতন। আমাকে বাধ্য করতে পারত না ওরা। তোমাকে যেমন পারেনি।'

'এখানকার চেয়ে অনেক বড় দল ছিল ওখানে। বেশিরভাগই মাতাল ছিল। তার ওপর ওখানে পে-মাস্টার বিগ জেরির সাহায্য পায়নি।'

'কিন্তু তুমি হলে নিশ্চয়ই দিতে না, বাবা,' জোরের সঙ্গে বলল লরা।

'আস্তে!' বকা দিল মা, 'গ্রেসকে জাগিয়ে দেবে। আমার ধারণা ঠিক কাজই করেছে ওদের পে-মাস্টার। মরা সিংহের চেয়ে জ্যান্ত কুকুরও ভাল। এবার ঘুমাও।'

'আর একটা প্রশ্ন, মা!' ফিস ফিস করে জানতে চাইল মেরি। 'কী করে দিল? টাকা পেল কোথায়? অর্ধেক বেতন তো আগেই দিয়ে দিয়েছিল।'

'তাই তো, কোথায় পেল টাকা?' জিজ্ঞেস করল মা।

'স্টোর থেকে,' বলল বাবা। 'বেতনের প্রায় সব টাকাই ততক্ষণে স্টোরে ফিরে এসেছে। টাকা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খরচ শুরু করে ওরা, শেষ না হলে থামে না।' মাঝের পর্দাটা ছেড়ে দিল হাত থেকে। 'এবার ঘুমিয়ে পড়ো, মেয়েরা।'

## ছয়

দেখতে দেখতে বেজে গেল ছুটির ঘণ্টা। শীত এসে পড়ল প্রায়। ক্যাম্প গুটাবার কাজ শুরু হয়ে গেছে।

হেমন্তকালে প্রচুর পাখি এসেছিল সিলভার লেকে, মনের সুখে শিকার করেছে বাবা। পালকগুলো সংগ্রহ করেছে মা আর লরা, এবারের শীতে পালকের তোশক পাবে মেরি আর লরা।

শীত আসছে বলে ঝাঁকে ঝাঁকে দক্ষিণে চলে যাচ্ছে পাখিগুলো, ফাঁকা হয়ে

আসছে লেক। সকালের দিকে খুব ঠাণ্ডা পড়ছে গত কিছুদিন।

লেনার সঙ্গে দেখা হয় রোজ দুধ দোয়াবার সময়। গরম জামাকাপড় পরে যায় ওরা দুধ দোয়াতে, দুজন একসঙ্গে হলেই গান গায়।

"চললে কোথায়, ও সুন্দরী, বলবে না?
দুধ দোয়াতে যাচ্ছি, মশায়, বলল ললনা।
তোমার সঙ্গে, ও সুন্দরী, আসতে পারি?
আমার কীসের অসুবিধে, গেলে চলো না।
সম্পদ কী আছে তোমার, জানতে পারি?
চেহারাটুকুই সম্পদ মোর, মিষ্টি ভারি।
তা হলে আর তোমার সাথে বিয়ে হলো না,
কেউ সেধেছে? মধুর হেসে বলল ললনা।"

এক সন্ধ্যায় লেনা বলল, 'মনে হয়, বহুদিন আর দেখা হবে না আমাদের। তোমার কথা খুব মনে হবে আমার। কাল সকালে আমি, জিন আর মা চলে যাচ্ছি। খুব ভোরে উঠে কেটে পড়ব আমরা, তিনজন তিন ওয়্যাগন ভর্তি মাল-সামান নিয়ে যাচ্ছি তো। যদি কোম্পানী আবার ধরে ফেলে, সেজন্যে কাউকে জানাচ্ছি না কোথায় চলেছি।'

'তোমাদের ওই ঘোড়াটা আর একবার চালাতে পারলে হতো,' বলল লরা।

'আরে, গুলি মারো!' বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলল লেনা। 'ইশ্‌শ্‌, এখান থেকে পালাতে পেরে বাঁচলাম! আর রান্না নেই, থালা ধোয়া নেই, ঝাড়ু দেয়া নেই! হুপ্-পি!' একটু থেমে বলল, 'আচ্ছা, তা হলে গুড বাই। মনে হয়, যতদিন বাঁচবে, এইখানেই থাকবে তুমি, তাই না?'

'মনে হয়, তাই,' দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলল লরা, 'গুড বাই।'

পরদিন একা দুধ দোয়াল লরা। খুব সকালে এক ওয়্যাগন ভর্তি জই নিয়ে আন্ট ডোসিয়া, স্টোর থেকে এক ওয়্যাগন ভর্তি মালপত্র নিয়ে লেনা, আর এক ওয়্যাগন ভর্তি যন্ত্রপাতি নিয়ে জিন রওনা হয়ে গেছে। দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি হলেই রওনা হয়ে যাবে আঙ্কেল হাইও।

'ইচ্ছে করলেই তুমি এটা ঠেকাতে পারতে, চার্লস!' বলল মা ক্ষুব্ধকণ্ঠে।

'এটা আমার দেখার বিষয় নয়,' বলল বাবা। 'আমাকে লিখিত অর্ডার দেয়া হয়েছে, ঠিকাদার যা চাইবে তাই আমার দিতে হবে ওর অ্যাকাউন্টে টুকে রেখে। আমি তাই দিয়েছি। তুমি এটাকে চুরি ভাবছ, ক্যারোলিন। আসলে কিন্তু তা নয়। কোম্পানীই বরং ঠকাচ্ছিল ওকে, এখন শোধ-বোধ হয়ে গেল। ন্যায্য পাওনার বেশি কিছুই নেয়নি হাই।'

'যাই হোক, আমরা এখন একটা স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে পেলেই আমি খুশি।'

প্রতিদিন দেনা-পাওনা হিসেবের পর বেতন নিয়ে চলে যাচ্ছে একজনের পর একজন। ওয়্যাগনের পর ওয়্যাগন চলে যাচ্ছে পুবে, ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে ক্যাম্প। একদিন আঙ্কেল হেনরি, লুইজা আর চার্লিও চলে গেল, উইসকনসিনে ফিরে গিয়ে

খামারটা বেচে দিয়ে আন্ট পলিকে নিয়ে মন্টানায় গিয়ে বসতি করবে।

সবাই চলে গেল। এখন কোম্পানীর লোক এসে বাবার হিসেব বুঝে নিলেই বাবার ছুটি।

'আমাদের পুবে কোথাও গিয়ে শীতটা কাটিয়ে আসতে হবে,' বলল বাবা। 'এই কুটিরে যদি এরা থাকতে দেয়ও, প্রচুর কয়লা যদি থাকত, তাও আমরা শূন্য ডিগ্রীর নীচের শীতে এখানে টিকতে পারতাম না। খুবই পলকা কাঠ দিয়ে তৈরি এসব কুটির।'

'কিন্তু, চার্লস, এখনও হোমস্টেড খুঁজে পাওনি তুমি। যা রোজগার করেছ সেটা যদি বসন্তকাল পর্যন্ত টিকে থাকতেই ব্যয় করতে হয়–' মার কণ্ঠে উদ্বেগ।

'জানি, ক্যারোলিন,' বলল বাবা। 'কিন্তু কী করব, বলো? এখান থেকে যাওয়ার আগেই হয়তো জায়গা পছন্দ করতে পারি আমরা। আগামী বসন্তে ক্লেইম ফাইলও নাহয় করলাম। তারপর আগামী গ্রীষ্মে হয়তো একটা কাজ জোগাড় করে নিয়ে খাওয়া-পরা আর একটা কুটির তৈরি করার টাকা সংগ্রহ করলাম। যা রোজগার হয়েছে সেটা যখন শুধু বেঁচে থাকার জন্যেই খরচ করে ফেলতে হচ্ছে, তখন সময় থাকতে পুবে সরে যাওয়াই ভাল।'

কিছুতেই এগোনো যায় না, ভাবল লরা। পুবে ফিরে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ওর, কিন্তু কী আর করা! নালিশ করে লাভ কী!

কোম্পানী থেকে পরিদর্শক এসে বাবার হিসেব-পত্র দেখল খুঁটিয়ে। শেষ ওয়্যাগনগুলোও চলে যাচ্ছে। লেকের পাখিগুলোও বিদায় নিয়েছে। একটা ছেঁড়া ওয়্যাগন-কাভার মেরামতের কাজে হাত দিয়েছে মা লরাকে নিয়ে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে দীর্ঘ যাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে রুটি সেঁকছে মা, বিস্কিট বানাচ্ছে।

সন্ধের সময় শিস দিতে দিতে দখিনা হাওয়ার মত ঘরে ঢুকল বাবা।

'শীতকালটা এখানেই কাটাতে পারলে কেমন হয়, ক্যারোলিন?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল বাবা। 'এই ধরো, সার্ভেয়ারের কোয়ার্টারটায়?'

স্টোভের পাশে সোজা হয়ে দাঁড়াল মা, অ্যাপ্রন দিয়ে চোখ মুছল, তারপর বলল, 'খুব ভাল হয়, চার্লস।'

'সত্যিই, বাবা? লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লরা। 'ওই বাড়িতে থাকতে পারব আমরা?'

'একশো বার!' বাবার খুশি আর ধরে না। 'অবশ্য তোমার মার যদি আপত্তি না থাকে, তবেই।' মার দিকে চাইল বাবা চোখ পাকিয়ে। 'দারুণ একটা বাড়ি, ক্যারোলিন, একটা ফুটো নেই যে শীত ঢুকবে। একটু আগে স্টোরে এসেছিল হেড-সার্ভেয়ার। ওদের পুরো টীমকে এখানে থাকতে হবে মনে করে প্রচুর খাবার আর কয়লা জড়ো করেছিল ওরা ওই বাড়িতে। কিন্তু আমি যদি কোম্পানীর মাল-সামান আর যন্ত্রপাতি দেখেশুনে রাখার দায়িত্ব নিতে রাজি হই, তা হলে ওরা শীতকালটা এখানে পড়ে না থেকে বাড়ি চলে যাবে। এই ব্যবস্থায় কোম্পানীর পরিদর্শকও রাজি আছে।

'নিজে গিয়ে বাড়িটা দেখে এলাম, ক্যারোলিন। ময়দা, বীন, নোনা মাংস, আলু, এমন কী টিনের খাবারও রয়েছে প্রচুর। আর কয়লা আছে অঢেল। এখানে

থাকতে রাজি হলে এসব আমাদের জন্যে ফ্রী। ওদের আস্তাবলটা ব্যবহার করতে পারব গরু-ঘোড়ার জন্যে। আমি ওদের বলেছি, তোমার সঙ্গে আলাপ করে কাল সকালে জানাব। তুমি কী বলো, ক্যারোলিন?'

সবাই তাকিয়ে রয়েছে মা'র মুখের দিকে। উত্তেজনা চেপে রাখতে কষ্ট হচ্ছে লরার। ভাবছে, মা হয়তো সভ্যজগতে ফিরে যেতে চাইবে। কিন্তু তা হলে যে গত ছ'মাসে রোজগার করা বাবার তিনশো ডলার শেষ হয়ে যাবে ওদের সবার খাওয়া-থাকাতেই। কিন্তু না, মৃদু হাসল মা। বলল, 'মনে হচ্ছে, খোদার তরফ থেকে এসেছে সুযোগটা, চার্লস। বলছ, কয়লা আছে?'

'কয়লা না থাকলে এখানে থাকার প্রশ্নই উঠত না। বললাম তো, প্রচুর আছে।'

'বেশ। খাবার দেয়া হয়েছে টেবিলে,' বলল মা। 'মুখ-হাত ধুয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা হওয়ার আগেই বসে পড়ো সবাই। মনে হচ্ছে, সব দিক থেকে ভাল হবে এটা আমাদের জন্যে। ভাল সুযোগ, চার্লস।'

'হ্যাঁ,' বলল বাবা। 'সেই বসন্তকাল পর্যন্ত একটা পেনিও খরচ হবে না আমাদের!'

খেতে বসে সবাই শুধু এই কথাই আলাপ করল। খাওয়ার পর বাবা বলল, 'এর ভাল দিক যেমন আছে, খারাপ দিকও রয়েছে কিছুটা। ধারে কাছে ষাট মাইলের মধ্যে জন-মনিষ্যি নেই। যদি কিছু ঘটে –'

দরজায় খট্-খট্ আওয়াজ হতেই চমকে উঠল সবাই। বাবা 'ভেতরে এসো' বলতেই বিশাল চেহারার এক লোক ঢুকল ভিতরে। পুরু কোট আর মাফলার পরে আছে লোকটা। চিবুকে সামান্য একটু কালো দাড়ি, গাল দুটো লাল।

'হ্যাল্লো, বোস্ট!' ডাকল বাবা। 'আগুনের ধারে চলে এসো। খুব ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। এই যে আমার স্ত্রী, আর এরা মেয়ে। বোস্ট কাছেই একটা হোমস্টেড ক্লেইম ফাইল করেছে, এতদিন রেল কোম্পানীতে কাজ করছিল।'

মা আগুনের ধারে একটা চেয়ার টেনে বসতে দিল ভদ্রলোককে। আগুনের দিকে বাড়ানো দু'হাতের একটায় ব্যান্ডেজ দেখে মা জিজ্ঞেস করল, 'হাতে ব্যথা পেয়েছেন?'

'মচকে গেছে,' বললেন মিস্টার বোস্ট, 'সেঁকে বেশ আরাম লাগছে এখন।' বাবার দিকে ফিরলেন, 'তোমার সাহায্য দরকার, ইঙ্গলস। একটা অসুবিধায় পড়েছি। তোমার মনে আছে, একজোড়া ঘোড়া বেচেছিলাম পিটের কাছে? কিছু টাকা দিয়েছিল তখন, বাকি টাকা পরের বেতনের দিন দেবে বলেছিল। সেই টাকা দিচ্ছি-দেব করে দিল না তো দিলই না, এখন ঘোড়া দুটো নিয়ে কেটে পড়ার তালে আছে ব্যাটা। আমি ওর কাছ থেকে ঘোড়া দুটো কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু ওর ছেলেও আছে ওর সঙ্গে, হাঙ্গামা করবে ওরা। একসঙ্গে দুজনের সঙ্গে লাগতে চাই না, বিশেষ করে একটা মচকানো হাত নিয়ে।'

'এখনও বেশ কয়েকজন আছি আমরা।' বলল বাবা, 'সবাই গিয়ে ধরলে টাকা না দিয়ে ও যাবে কোথায়?'

'ঠিক এজন্যে আসিনি আমি,' বললেন মিস্টার বোস্ট। 'বিবাদ করতে চাই না

না আসলে।'

'আমি তা হলে কোন্ কাজে আসতে পারি?'

'তাই চিন্তা করছি। আইন নেই এখানে, কোনও অফিসার নেই যে তার মাধ্যমে টাকা উদ্ধার করা যাবে, একটা কাউন্টি নেই যে সাহায্যের জন্যে যাব। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে পিট সেকথা জানে না।'

'ওহ্-হো!' বলল বাবা, 'তুমি চাইছ, আমি কিছু একটা কাগজ তৈরি করে দিই, পরোয়ানা জাতীয় কিছু, যেটা দেখাবে -'

'ঠিক ধরেছ। একজন আছে, যে শেরিফ সেজে কাগজটা নিয়ে যাবে ওদের কাছে।' চকচক করছে দুজনের চোখ স্কুল-পালানো দুষ্টু ছেলেদের মত।

জোরে হেসে উঠল বাবা, চাপড় দিল নিজের হাঁটুতে। 'চমৎকার! কপাল ভাল, গোটা কয়েক আইনী ফুল্স্ক্যাপ কাগজ রয়ে গেছে আমার কাছে! ঠিক আছে, আমি লিখে দিচ্ছি পরোয়ানা, তুমি তোমার শেরিফকে ধরে আনো গে যাও।'

হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেলেন মিস্টার বোস্ট, মা আর লরা জলদি করে খালি করে দিল টেবিল, বাবা বসে গেল বড়সড় একটা কাগজ নিয়ে পরোয়ানা লিখতে।

'এই যে! খুব ভারিক্কি চালের হয়েছে, আর ঠিক সময়মতই শেষ করতে পেরেছি দেখা যাচ্ছে!'

দরজায় টোকা দিয়ে আরেকজন লোককে নিয়ে ঢুকলেন মিস্টার বোস্ট। ইয়া ঢাম্বু একখানা ওভারকোট পরনে, টুপিটা টেনে চোখ পর্যন্ত নামানো, মাফলার দিয়ে জড়িয়েছে ঘাড় আর মুখ।

'এই যে, শেরিফ!' বলল বাবা। 'এই পরোয়ানা নিয়ে গিয়ে জারী করো অপরাধীর ওপর, ধরে নিয়ে এসো জীবিত বা মৃত ঘোড়া কিংবা টাকা,সেই সঙ্গে মামলার খরচ বাবদ মাননীয় আদালতের ফিস্!' সবার মিলিত হা-হা হাসিতে মনে হলো ছাদ উড়ে যাবে কুটিরের।

লোকটার টুপি আর মাফলারের দিকে চেয়ে বাবা বলল, 'তোমার কপাল ভাল, শেরিফ, যে আজ খুব ঠাণ্ডা পড়েছে!'

ওরা দুজন বেরিয়ে যেতে বাবা বলল, 'লোকটা যদি চীফ সার্ভেয়ার না হয়, তো আমার হ্যাট খেয়ে নেব আমি!' উরুতে চাপড় দিয়ে আবার হাসিতে ফেটে পড়ল বাবা।

রাতে মিস্টার বোস্ট আর বাবার গলার শব্দে জেগে গেল লরা। দরজায় দাঁড়িয়ে বাবাকে বলছেন মিস্টার বোস্ট, 'তোমার বাতি জ্বলছে দেখে জানাতে এলাম, কাজ হয়েছে তোমার পরোয়ানায়। লোকটা এমনই ভয় পেয়ে গেল যে টাকা-ঘোড়া সবই দিয়ে দিচ্ছিল। আইনকে ভয় করার নিশ্চয়ই বিশেষ কোন কারণ আছে ব্যাটার - একেবারে থরহরিকম্প অবস্থা! এই যে ধরো, ইঙ্গলস, মাননীয় আদালতের খরচাও আদায় করে নিয়ে এসেছি। সার্ভেয়ার কিছুতেই ওর ফী নিল না, বলে যে-আনন্দ পেয়েছে সেটাই নাকি ফীর দশগুণ।'

'বেশ তো, তুমি রেখে দাও ওর ভাগ। কিন্তু আমারটা আমি নেব,' বলল বাবা, 'কোর্টের মান-মর্যাদা উঁচু রাখতে হবে না!'

আস্তে হাসার চেষ্টা করলেন মিস্টার বোস্ট, কিন্তু তার ফলে গলা দিয়ে এমনই বিচিত্র আওয়াজ বের হলো যে লরা, মেরি, ক্যারি, এমন কী মা পর্যন্ত হো-হো করে হেসে উঠল। বাবার হাসি আন্তরিক, মনটা খুশি হয়ে ওঠে। কিন্তু মিস্টার বোস্টের হাসি সবাইকে হাসায়, শুনলে না হেসে পারা যায় না।

হাসতে হাসতে মা বলল, 'অ্যাই, চুপ, চুপ! গ্রেস জেগে যাবে!'

'কৌতুকটা কী নিয়ে?' জানতে চাইল ক্যারি। গভীর ঘুমে মগ্ন ছিল ও, মিস্টার বোস্টের হাসি শুনেছে কেবল।

'তুমি জানো না?' পাল্টা প্রশ্ন করল মেরি, 'তা হলে তুমি হাসছ কীজন্যে?'

'মিস্টার বোস্টের হাসি কাতুকুতু দেয়,' বলল ক্যারি।

সকালে নাস্তা খেতে এলেন মিস্টার বোস্ট, কারণ কেউ এখন আর নেই ক্যাম্পসাইটে, সার্ভেয়াররাও রওনা হয়ে গেছে সকাল ভোরে, নাস্তার ব্যবস্থা নেই কোথাও। মিস্টার বোস্টই পুবের শেষ যাত্রী। আইওয়া যাচ্ছেন বিয়ে করতে।

'তোমরা যদি শীতকালটা এখানে কাটাও, বলা যায় না, এলিকে নিয়ে আমিও হয়তো চলে আসতে পারি,' বললেন মিস্টার বোস্ট।

বাবা-মা দুজনেই তাকে স্বাগত জানাল।

মিস্টার বোস্টের ওয়্যাগন দূরে মিলিয়ে যেতে একেবারে সুনসান হয়ে গেল গোটা এলাকা। ওয়্যাগন নিয়ে এল বাবা ঘরের দরজায়। 'চলো, ক্যারোলিন, আজই বাড়ি বদল করি।'

# সাত

লেকের উত্তর তীরে বাড়িটা।

পছন্দ হলো মার: সবকিছু যেন ছবির মত সাজানো গোছানো।

বাবার মধ্যে জেগে উঠল গান। অনেকদিন পর বেরিয়ে এল বেহালাটা।

সঙ্গীত শেষ হতেই খুব কাছ থেকে ডেকে উঠল একটা নেকড়ে বাঘ। চমকে উঠল লরা, মা ছুটে গেল গ্রেসকে সামলাবার জন্য, সাদা হয়ে গেছে ক্যারির মুখ, বড় বড় চোখে ভয়।

লরা সান্ত্বনা দিল ওকে, 'ওটা – ওটা একটা নেকড়ের ডাক, ক্যারি।'

সকালে আস্তাবলের আশেপাশে নেকড়ের পায়ের ছাপ দেখা গেল, যদিও এর পর অনেকদিন আর এদিকে নেকড়ের ডাক শোনা যায়নি।

শীতের সন্ধ্যায় মেয়েদের নিয়ে গান গায় বাবা। কীভাবে পল্‌কার সুরে নাচতে হয় শেখায় ওদের, কীভাবে ওয়াল্‌যের ছন্দে সাড়া দিতে হয় শেখায়।

বেশ কিছুদিন পর এক রাতে মার অনুমতি নিয়ে ক্যারিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল লরা চাঁদনি রাতে বরফের ওপর স্লাইড করবে বলে। কোট, হুড আর দস্তানা পরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দুজন। গরম ঘর থেকে বাইরে বেরিয়েই প্রচণ্ড শীতের ধাক্কা খেল ওরা প্রথমে, কিন্তু একটু পরেই গা গরম হয়ে উঠল ওদের। ঢাল বেয়ে

সড়সড় করে নেমে যাচ্ছে দুজন হাত ধরাধরি করে। কয়েক পা দৌড়ে তার চেয়ে বেশিদূর যাচ্ছে স্লাইড করে। বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে চলে এসে ক্যারি বলল, 'কান পেতে শোনো, লরা। দেখো, কী রকম নিস্তব্ধ চারদিক।'

শুনল লরা। তারপর ছুটল আবার। মুক্তির স্বাদ আছে এ ছোটায়।

কিছুটা দৌড়ে কিছুদূর বরফের ওপর দিয়ে পিছলে যাচ্ছে ওরা। দারুণ মজা!

এভাবে চলতে চলতে লেকের আরেক পারে চলে এসেছে প্রায়, এমন সময় হঠাৎ চোখ তুলেই দেখতে পেল লরা, পারে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল এক নেকড়ে।

সোজা লরার দিকে তাকিয়ে রয়েছে নেকড়েটা। চাঁদের আলোয় চকচক করছে ওটার গায়ের লোম।

'চলো ফেরা যাক,' বলেই ঘুরল লরা ক্যারিকে নিয়ে। 'দেখা যাক কে আগে বাড়ি পৌঁছায়।'

খানিক দৌড়ায়, খানিক পিছলে চলে, এভাবে ছুটল লরা যত দ্রুত সম্ভব, ক্যারিও চলছে ওর সঙ্গে সমান তালে। চলতে চলতেই হাঁপাতে হাঁপাতে ক্যারি বলল,'আমিও দেখেছি ওটাকে! নেকড়ে বাঘ, তাই না, লরা?'

'কথা বোলো না!' চাপা গলায় বলল লরা, 'জলদি পালাও!'

কান খাড়া রেখেছে লরা, কিন্তু পিছনে কোন পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়নি। বাড়ির কাছাকাছি এসে ঘাড়ের ওপর দিয়ে পিছনে তাকাল লরা, কিন্তু কোথাও নেকড়ের চিহ্নমাত্র দেখতে পেল না।

একদৌড়ে বাসায় পৌঁছেই দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল লরা। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল বাবা। 'কী হয়েছে! এত ভয় পেয়েছ কেন?'

'ওটা তো নেকড়ে ছিল, তাই না, লরা?' বলল ক্যারি।

'হ্যাঁ! মস্ত একটা নেকড়ে, বাবা! আমি ভেবেছিলাম ক্যারি বুঝি জোরে দৌড়াতে পারবে না, কিন্তু ঠিকই পালিয়ে এসেছি আমরা!'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল বাবা, 'কোথায় নেকড়ে?'

'জানি না!' বলল লরা, 'আমাদের পিছু ধাওয়া করেনি ওটা।'

মা ওদের ভারি জামাকাপড় খুলতে সাহায্য করল, তারপর বলল, 'একটু জিরিয়ে নিয়ে তারপর কথা বলো।'

'নেকড়েটাকে কোথায় দেখলে?' জানতে চাইল বাবা।

'ওইদিকের উঁচু পাড়ে,' জবাব দিল ক্যারি।

'এতদূর গিয়েছিলে তোমরা!' অবাক হলো বাবা। 'তারপর দৌড়ে ফিরে আসতেও পেরেছ! আধমাইলের বেশি হবে – আমি ভাবতেও পারিনি এতদূর চলে যাবে তোমরা!'

'চাঁদের দিকে যাচ্ছিলাম আমরা,' বলল লরা।

'আর আমি ভেবেছিলাম চলে গেছে ওরা। এভাবে তোমাদের যেতে দেয়া আমার উচিত হয়নি। দেখি, কাল বেরোব বন্দুক নিয়ে।'

খানিক চুপ করে থেকে নিচু গলায় ডাকল লরা, 'বাবা!'

'বলো, আধ-বোতল।'

'তুমি যদি ওটাকে না পাও তা হলে ভাল হয়।'

'কেন!' অবাক হলো মা।

'কারণ, ও তো কোনও ক্ষতি করেনি আমাদের। ইচ্ছে করলেই তাড়া করে ধরতে পারত।'

দূর থেকে টানা, লম্বা ডাক শোনা গেল নেকড়ের। আরেকটা নেকড়ে উত্তর দিল সে ডাকের। তারপর আবার সব চুপ।

পরদিন সকালে নাস্তার পর বন্দুক নিয়ে বেরলো বাবা।

ফিরল অনেক দেরি করে। ডিনারের সময় পার হয়ে গেছে তখন। মুখ-হাত ধুয়ে সবাই খেতে বসল। মেরি জিজ্ঞেস করল, 'কতদূর গিয়েছিলে, বাবা?'

'দশ মাইল তো হবেই,' বলল বাবা। 'নেকড়েগুলোর পায়ের ছাপ অনুসরণ করে গিয়েছিলাম। কাল রাতে দুটো মস্ত বড় বাফেলো উল্‌ফ্ ওদের পুরনো আস্তানায় বেড়াতে এসেছিল। রাতেই ফিরে গেছে নতুন ডেরায়। খুব সম্ভব রেল লাইন বসানোর কাজে এত লোকের হৈ-হল্লা ওদের পছন্দ হয়নি, আস্তানা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। যাকগে, আসল কথা হলো, ওদের খুঁজতে গিয়ে আমি আমাদের হোমস্টেড পেয়ে গেছি।'

সবাই চেঁচামেচি শুরু করল একসঙ্গে, 'কোথায়, বাবা?' 'কেমন জায়গা?' 'এখান থেকে কতদূর?'

মা বলল, 'ভাল খবর, চার্লস।'

খাওয়ার পর চা শেষ করে গোঁফ মুছল বাবা, তারপর বলল, 'জায়গাটা সব দিক দিয়ে আমাদের উপযোগী। চাষের জমি, ঘাসের জমি, বাড়ি করার জন্যে উঁচু ভিটে – ঠিক যেন আমাদের জন্যেই তৈরি হয়ে আছে সব। লেকটা যেখানে গিয়ে ওদিকের জলায় মিশেছে, তার দক্ষিণে জমিটা। সবচেয়ে বড় কথা, শহরের এত কাছে জায়গাটা যে মেয়েদের স্কুলে যেতে কোন অসুবিধে হবে না।'

'খুব ভাল! শুনে খুব ভাল লাগছে, চার্লস!'

'গত ছয়মাস এত জায়গা ঘুরে দেখলাম, একটাও পছন্দ হলো না – অথচ ঠিক মনের মত জায়গাটা পড়ে ছিল এতদিন একেবারে চোখের সামনে!'

'দু'মাস আগেই যদি ফাইল করতে পারতে, তা হলে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম,' বলল মা।

'নিশ্চিন্ত থাকো, ক্যারোলিন, এই শীতের মধ্যে কেউ আসবে না এদিকে। আগামী বসন্তে মানুষ হোমস্টেড খোঁজাখুঁজি শুরু করার আগেই ব্রুকিংসে গিয়ে ক্লেইম ফাইল করব আমি।'

ক্রিসমাসের ঠিক আগের রাতে বউ নিয়ে এসে হাজির হলেন মিস্টার বোস্ট। সবাই দারুণ খুশি হলো, খুব জমবে এবারের বড়দিন। ঠিক হলো কাছেই সার্ভেয়ারদের অফিসরুমে থাকবেন ওঁরা।

'তোমাকে বসন্তের আগে আশা করিনি,' বলল বাবা মিস্টার বোস্টকে। 'এই শীতে এত দূরের পথ পাড়ি দেয়া –'

'ওরেব্বাপ্!' বললেন মিস্টার বোস্ট, 'হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি সেটা। তবে

খুব খারাপ কাজ করেছি তা বলব না। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, ইঙ্গলস, গোটা দুনিয়াটাই পশ্চিমে চলে আসছে আগামী বসন্তে। আইওয়ার সবাই যে আসছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভাবলাম, কিছুটা এগিয়ে থাকি, নইলে কখন কোন্ ক্লেইম-ডাকাত কেড়ে নেয় হোমস্টেড তার ঠিক আছে? দিনকাল খারাপ, ইঙ্গলস। আরও আগেই ক্লেইম করা উচিত ছিল তোমার। যাই হোক, শীতটা গেলেই ছুটে যাওয়া উচিত হবে তোমার ব্রুকিন্সে, নইলে দেখবে কোথাও একটুকরো জমি আর অবশিষ্ট নেই।'

খুব মজা হলো ক্রিসমাসে। সবাই চমৎকার উপহার পেল। এমন কী মিস্টার ও মিসেস বোস্টও অবাক হয়ে গেলেন উপহার পেয়ে – কারণ, কারও তো জানার কথা নয় যে তাঁরা আসছেন। তাঁরা অবশ্য বাচ্চাদের সবার জন্য প্রচুর ক্রিসমাস ক্যান্ডি নিয়ে এসেছেন।

'মেউই কুইসমাস, মেউই কুইসমাস!' বলে লাফ-ঝাঁপ দিল গ্রেস। সবাই ওর আনন্দ দেখে হেসে কুটিপাটি।

দুপুরের খাওয়াটা ক্রিসমাসের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। বাবার শিকার করে আনা আস্ত এক জ্যাক র‍্যাবিটের রোস্ট রান্না করেছে মা, সেই সঙ্গে মজার মজার আরও কত কী যে খাবার! তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন নব দম্পতি। দু'একটা রান্না শিখে নিলেন মিসেস বোস্ট মার কাছ থেকে।

ক্রিসমাসের পরপরই এল নিউ ইয়ারস ডে – আঠারো শো আশির পয়লা জানুয়ারি। সেদিনটাও এত আনন্দে কাটল যে স্মরণীয় হয়ে থাকল লরার কাছে। বাবাও বলল, আশির দশকটা খুব ভাল কাটবে বলে মনে হচ্ছে তার। 'তা ছাড়া এই যদি ডাকোটার শীতের নমুনা হয়, তা হলে বলতেই হবে খুব ভাল করেছি পশ্চিমে এসে।'

'হ্যাঁ,' বললেন মিস্টার বোস্ট, 'চমৎকার এই দেশটা। আমি খুশি যে পুরো একশো ষাট একর জমির ক্লেইম করেছি। তুমিও যদি তাই করো তা হলে ভাল হয়।'

'সাত দিনের মধ্যে করব,' বলল বাবা। 'ব্রুকিন্সের ল্যান্ড অফিসটা খোলার অপেক্ষায় ছিলাম শুধু। ইয়াঙ্কটনে গিয়ে ফাইল করতে পারতাম, কিন্তু ওখানে যেতে-আসতে এক সপ্তাহের বেশি লেগে যাবে। শুনেছি ব্রুকিন্সের অফিস খুলবে বছরের প্রথম দিন। আবহাওয়ার অবস্থা যদি এইরকম থাকে, আর ক্যারোলিনের যদি আপত্তি না থাকে তা হলে আগামী কালই রওনা হতে পারি আমি।'

'আপত্তি কীসের, পূর্ণ সম্মতি রয়েছে আমার!' বলল মা। এখন শীঘ্রিই একটা স্থায়ী ঠিকানা হতে চলেছে বলে খুশিতে জ্বলজ্বল করছে মার মুখ।

'ব্যস, তা হলে তো হয়েই গেল কথা,' বলল বাবা। 'দেরি হয়ে যাবে বা আর কেউ ক্লেইম করবে আমাদের পছন্দের জায়গা, সে-ভয় করছি না; আসলে কাজটা সেরে ফেলা দরকার।'

'শুভস্য শীঘ্রম!' বললেন মিস্টার বোস্ট। 'ইঙ্গলস, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, কী রকম হুড়োহুড়ি লাগবে এখানে আগামী বসন্তে!'

'আমার আগে আর কেউ পৌঁছতে পারবে না, এটুকু বলতে পারি,' জবাব দিল বাবা। 'কাল খুব ভোরে যদি রওনা দিই, পরশু সকাল নাগাদ ঠিকই হাজির থাকতে পারব ল্যান্ড অফিসের সামনে। তোমরা কেউ যদি আমাকে দিয়ে চিঠি পোস্ট করাতে চাও তা হলে ঝটপট লিখে ফেলো আজকের মধ্যে।'
মিসেস বোস্ট আর মা গেল চিঠি লিখতে। সন্ধের আগেই বাবার জন্য লাঞ্চের একটা প্যাকেট রেডি করে রাখল মা। কিন্তু বিধি বাম, তুষার-ঝড় শুরু হয়ে গেল রাতে। এই আবহাওয়ায় কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়।

এক রোববার সাপারের পর বাবার বেহালার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইছিল সবাই, হঠাৎ বাইরে থেকে জোরাল এক কণ্ঠ গেয়ে উঠল ওদের সঙ্গে।

দরজা খুলে তুষারে মোড়া দুজন লোককে ভেতরে ডেকে আনল বাবা। প্রথম জনকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল লরা, 'রেভারেন্ড অ্যালডেন! রেভারেন্ড অ্যালডেন!'

'আরে, তাই তো! ব্রাদার অ্যালডেন, আপনি কোথা থেকে?' খুশি হয়ে বলে উঠল মা। 'আগুনের ধারে চলে আসেন, প্লীজ! সত্যিই অবাক হয়ে গেছি!'

'আমার চেয়ে বেশি অবাক হননি, সিস্টার ইঙ্গলস্,' বললেন রেভারেন্ড অ্যালডেন। 'প্লাম ক্রীকের স্থায়ী বাসিন্দাদের এখানে এত পশ্চিমে আবিষ্কার করব তা কে ভাবতে পেরেছিল! আর আমার ছোট্ট, মিষ্টি পল্লীবালা লরা-মেরি দেখছি অনেক বড় হয়ে গেছে!'

লরা কিছু বলতে পারল না, খুশিতে গলাটা বুজে এসেছে ওর। মেরি বলল, 'খুব ভাল লাগছে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায়।' মেরির মুখটা খুশিতে জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু চোখে কোনও অভিব্যক্তি নেই। তাই দেখে থতমত খেয়ে গেলেন রেভারেন্ড অ্যালডেন। চট্ করে মার দিকে একবার তাকিয়ে আবার ফিরলেন মেরির দিকে।

মিস্টার ও মিসেস বোস্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল মা রেভারেন্ড অ্যালডেনের।

'আপনারা চমৎকার গান গাইছিলেন, এমন সময় আমরা এসে বিঘ্ন সৃষ্টি করলাম,' রেভারেন্ড অ্যালডেন বললেন।

'আপনিও চমৎকার গেয়ে উঠেছিলেন কিন্তু, স্যার,' জবাব দিলেন মিস্টার বোস্ট।

'না, না! ওইটা আমি না,' বললেন রেভারেন্ড অ্যালডেন। 'গেয়েছিল স্কটি। আমি তো শীতে একেবারেই কাবু হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু ওর লাল চুল ওকে গরম রাখে। এই যে, রেভারেন্ড স্টুয়ার্ট, এঁরা সবাই আমার পুরনো, প্রিয় সুবন্ধু, এবং তাঁদের বন্ধু। কাজেই এখানে আমরা সবাই বন্ধু।'

'লরা, তুমি টেবিল রেডি করো,' নিচু গলায় বলল মা অ্যাপ্রনটা কোমরে জড়াতে জড়াতে। মিসেস বোস্টও একটা অ্যাপ্রন জড়িয়ে নিয়ে নিভন্ত আগুন উস্কে চায়ের কেতলি চাপিয়ে দিলেন, তারপর দুজনে লেগে পড়লেন রান্নায়।

এতক্ষণে বাবা ফিরল সঙ্গে আরও দুজনকে নিয়ে। এঁদের ওয়্যাগনে চড়েই এসেছেন রেভারেন্ডরা। জানা গেল, এঁরা হোমস্টেডার, জিম রিভারে বসতি করতে

চলেছেন। ওখানেই গড়ে উঠতে চলেছে হুরন নামে একটা নতুন শহর। হোম মিশনারি সোসাইটি রেভারেন্ডদের পাঠিয়েছে ওখানে একটা গির্জা তৈরির সম্ভাব্যতা যাচাই করতে।

মুসাফিরদের খাওয়া হলে ভাঁড়ার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন রেভারেন্ড অ্যালডেন। লরা আর মা তখন থালা-বাসন ধুচ্ছে ওখানে। চমৎকার খাবারের ব্যবস্থা করায় মাকে ধন্যবাদ জানালেন, তারপর আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, 'মেরির এই অবস্থা দেখে সত্যিই দুঃখ হলো, সিসটার ইঙ্গলস।'

'হ্যাঁ, ব্রাদার অ্যালডেন,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল মা। 'ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে নেয়া মাঝে মাঝে কঠিন হয়ে পড়ে। প্লাম ক্রীকে আমাদের স্কারলেট ফিভার হয়েছিল। খোদার কাছে হাজার শোকর যে আমার আর সব বাচ্চারা রেহাই পেয়েছে। মেরির ওপর দিয়েই গেছে সব। কিন্তু মেয়েটা আমার এত ভাল, একটিবারের জন্যেও কোন অনুযোগ করেনি।'

'মহৎ আত্মা মেরির,' বললেন রেভারেন্ড অ্যালডেন। 'আমাদের সবার জন্যে একটা দৃষ্টান্ত। ঈশ্বর যাকে ভালবাসেন তাকেই পরীক্ষায় ফেলেন, সাহস না হারালে শেষপর্যন্ত মঙ্গলই হয়। আচ্ছা, আপনাদের কি জানা আছে যে অন্ধদের জন্যে কলেজ হয়েছে? এই আইওয়াতেও আছে একটা?'

ডিশপ্যানটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরল মা। মার মুখ দেখে ভয় পেল লরা। যখন কথা বলল, মনে হলো মার শান্ত গলাটা বুজে এসেছে। আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল মা, 'কী রকম খরচ জানেন?'

'আমি জানি না, সিসটার ইঙ্গলস, কিন্তু আপনি চাইলে খোঁজ নিয়ে জানাতে পারি।'

ঢোক গিলল মা, তারপর বলল, 'আমাদের অত টাকা নেই এখন। পরে যদি হয়, তখন, যদি আমাদের সাধ্যের মধ্যে থাকে, আমরা চেষ্টা করব। হয়তো হতেও পারে। আমার ইচ্ছে ছিল মেরি লেখাপড়া শিখুক।'

ধুপ-ধাপ লাফাচ্ছে লরার হৃৎপিণ্ডটা। চাপা স্বভাবের মাকে হঠাৎ যেন পরিষ্কার দেখতে পেল ও। মার আশা-আকাঙ্ক্ষা-হতাশা অনুভব করল স্পষ্ট।

'আমাদের প্রতিপালকের ওপর আস্থা রাখতে হবে। তিনিই জানেন আমাদের জন্যে কোন্‌টা মঙ্গল,' বললেন রেভারেন্ড অ্যালডেন। 'আপনাদের ধোয়া-মোছা শেষ হলে সবাই মিলে একটু প্রার্থনা করলে কেমন হয়?'

'খুব ভাল হয়, ব্রাদার অ্যালডেন। কাজ শেষ করেই আসছি আমরা।'

ধোয়া-মোছার কাজ শেষ করে অ্যাপ্রন খুলে রেখে চুল ঠিকঠাক করে নিল লরা। দেখল মেরির সঙ্গে কথা বলছেন রেভারেন্ড অ্যালডেন খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে। গ্রেস মিসেস বোস্টের কোলে, বাকি আর সবাই নবাগত হোমস্টেডারদের সঙ্গে গল্পে মশগুল। মা ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়ালেন রেভারেন্ড অ্যালডেন, বললেন, ঘুমাবার আগে সবাই মিলে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করবেন এখন।

সবাই যার যার চেয়ারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। রেভারেন্ড অ্যালডেন বললেন, 'হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের মনের কথা জানো, আমাদের একান্ত গোপন চিন্তাও তোমার অজানা নয়। তুমি আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করো, আমাদের পাপ

মোচন করো, আমাদেরকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করো।' আশ্চর্য এক নীরবতা নেমে এল ঘরে। লরার মনে হলো, ও যেন খরায় শুকিয়ে যাওয়া ঘাস; স্বর্গসুধার মত ঠাণ্ডা, নরম বৃষ্টি পড়ছে ওর ওপর; সিক্ত, সঞ্জীবিত করছে ওকে। শান্ত হয়ে গেল ওর মনের সকল ক্ষোভ। অনুভব করল, কী করে যেন সহজ হয়ে গেছে সবকিছু, দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছে ও, মেরি যাতে কলেজে যেতে পারে সেজন্য যা করার সব করবে ও এখন হাসিমুখে, নিজের সুখের দিকে চাইবে না।

লরা আর ক্যারি দোতলা থেকে ক্যারির বিছানাটা নামিয়ে পেতে দিল স্টোভের ধারে। তিন বোন এক বিছানায় শোবে আজ। ঠান্ডা বিছানায় ঢুকে পড়ল ওরা হি-হি করতে করতে। মায়ের দেয়া কাপড়ে প্যাঁচানো গরম লোহার টুকরোটা মেরির পায়ের কাছে রেখেই লরা নাক পর্যন্ত টেনে নিল লেপ।

'লরা,' ফিসফিস করে বলল মেরি, 'রেভারেন্ড অ্যালডেন আমাকে বললেন অন্ধদের জন্যে নাকি কলেজ আছে।'

'অন্ধদের জন্যে কী আছে?' ক্যারি ফিসফিস করে জানতে চাইল।

'কলেজ,' চাপা গলায় বলল লরা। 'ওখানে ওরা লেখাপড়া শেখে।'

'কী করে?' অবাক হয়ে গেল ক্যারি, 'আমার ধারণা ছিল লেখাপড়া শিখতে হলে পড়তে হয়।'

'ঠিক জানি না,' বলল মেরি। 'নিশ্চয়ই কোনও উপায় আছে। কিন্তু যাকগে, আমার পক্ষে তো আর সেটা সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই অনেক টাকা লাগে ওখানে ভর্তি হতে। আমি পারব না।'

'মাকেও বলেছেন রেভারেন্ড অ্যালডেন কথাটা,' ফিসফিস করে বলল লরা 'সম্ভব হতেও পারে, মেরি। আমার ধারণা, হবে।' গভীর করে শ্বাস নিল লরা, তারপর শপথের মত করে বলল, 'মন দিয়ে পড়ব আমি, যাতে স্কুলে পড়াতে পারি। যে টাকা পাব, তাতে আমিও অনেক সাহায্য করতে পারব।'

সকালে ঘুম থেকে উঠে নীচে কাপ-ভস্তরি-চামচের শব্দ শুনে তাড়াহুড়ো করে নেমে এল লরা, মাকে সাহায্য করবে বলে। দুজনে মিলে নাস্তা সাজিয়ে ফেলল টেবিলে। তৃপ্তির সাথে নাস্তা খেয়ে রওনা হয়ে গেল মুসাফিররা হুরনের পথে।

মিস্টার বোস্ট বললেন, 'দেখলে, ইঙ্গলস, এখনই কেমন লোক আসা শুরু হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ,' বলল বাবা, 'আমিও লক্ষ করেছি ব্যাপারটা, মার্চ মাত্র শুরু হয়েছে, এখনই – নাহ্! কাল সকালেই রওনা হয়ে যাব ব্রুকিন্সের পথে, রোদ থাক বা বৃষ্টি।'

# আট

কিন্তু আরও দুটো দিন দেরি হয়ে গেল বাবার রওনা হতে। ওয়্যাগনের পর ওয়্যাগন শীতার্ত, অভুক্ত লোক আসা শুরু করেছে রাতের আশ্রয়ের আশায়, খাবার

পাবে সেই আশায়।

বাবা প্রথম প্রথম আতিথেয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাল, তারপর বুঝতে পারল এভাবে তো চলবে না। আশ্রয়প্রার্থী মানুষকে ফিরিয়ে দেয়া যাবে না ঠিক, কিন্তু সাহায্যের বিনিময়ে কিছু পয়সা নিলে অসুবিধে কী? খাওয়া-থাকার জন্য ধার্য করা হলো পঞ্চাশ সেন্ট – সে মানুষ হোক বা ঘোড়া।

রোজই গাড়ি ভরে ভরে লোক আসছে আইওয়া, ওহায়ো, ইলিনয়, মিশিগান, মিনেসোটা, উইসকনসিন থেকে, এমন কী নিউ ইয়র্ক আর ভারমন্ট থেকেও। কেউ হুরন চলেছে, কেউ যাবে ফোর্ট পিয়েরে, কেউ আরও পশ্চিমে খুঁজবে হোমস্টেড।

যাই যাচ্ছি করতে করতে এক সকালে সত্যিই বেরিয়ে পড়ল বাবা।

এদিকে আশ্রয়প্রার্থীর অভাব নেই। ওয়্যাগন আসছে একের পর এক। কেউ ভদ্রলোক, কেউ চাষাড়ে, কেউ বা মদ্যপ – চেহারা দেখে চেনার জো নেই। কোন কোনদিন পনের বিশজনের মত লোক হলো। মেশিনের মত কাজ করছে মা আর লরা, ক্যারিও সাহায্য করছে সাধ্যমত। টাকা জমছে হাতে।

এবার লোকে কাঠ নিয়ে আসতে শুরু করল। শহর এলাকায় ঘর তুলতে শুরু করল মানুষ, কেউ স্টোর বানাবে, কেউ বাড়ি। চোখের সামনে গড়ে উঠতে আরম্ভ করল ডি স্মেট শহর।

কাজ করতে করতে ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে মা, তারই ফাঁকে ক্লেইম ফাইল করতে বাবা দেরি করে ফেলল কি না তাই নিয়ে তার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই।

চারদিন পর ফিরল বাবা। ঘোড়া দুটোকে আস্তাবলে রেখে হাসিমুখে ঢুকল দরজা দিয়ে। 'হ্যাঁ, ক্যারোলিন, ক্লেইম ফাইল করে এলাম!'

'পেয়েছ তা হলে!' খুশিতে ঝিকমিক করছে মার চোখ।

'পাব না মানে? পছন্দ করার পর থেকেই তো ওটা আমার। তবে যুদ্ধ করে জয় করে নিতে হয়েছে আমাকে জায়গাটা।' বলেই স্টোভের দিকে হাঁটতে শুরু করল বাবা। 'বাইরে বাতাস খুব ঠাণ্ডা!'

চট করে চা চড়িয়ে দিল মা। জিজ্ঞেস করল, 'গোলমাল হয়েছিল, চার্লস?'

'কী যে ভিড়! না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না,' বলল বাবা। 'মনে হলো গোটা দেশের সব মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছে ল্যান্ড অফিসের ওপর। রাতে পৌঁছলাম ব্রুকিংসে, পরদিন সকাল থেকে সারাদিন লাইনে দাঁড়িয়েও অফিসের দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে পারলাম না – এত লোক আগে থেকে লাইন দিয়েছে!'

'সারাদিন দাঁড়িয়ে ছিলে, বাবা?' জিজ্ঞেস করল লরা।

'হ্যাঁ, ছটফটি, সা-রা-টা দিন!'

'কিচ্ছু না খেয়ে?' এবার প্রশ্ন ক্যারির।

'মনেই ছিল না খাওয়ার কথা,' বলল বাবা। 'কষ্ট দিয়েছে ভিড়ের চাপ। এমন ভিড় তোমরা জীবনে দেখনি। আর মনের ভয়। মনের মধ্যে সারাক্ষণ ভয়, কে জানে, কেউ হয়তো আমার জমিটা ক্লেইম করছে এই মুহূর্তে! কিন্তু হোটেলে খেতে গিয়ে যা ভয় পেলাম তার কোন তুলনা হয় না।'

'খেতে গিয়ে ভয় কেন?' লরার প্রশ্ন।

'ল্যান্ড অফিস যখন বন্ধ হয়ে গেল, ঠেলাঠেলি করে পৌঁছলাম একটা হোটেলে। ওখানে খেতে খেতে দুজন লোকের আলাপ শুনে আমার তো চক্ষু চড়কগাছ। একজন বলল, হুরনের কাছে জমি ফাইল করেছে। অপরজন বলল হুরনের চেয়ে অনেক ভাল শহর হবে ডি স্মেট। তারপর ঠিক আমি যে জমি ক্লেইম করতে গিয়েছি ওটার কথা বলল, নম্বর-টম্বর হুবহু এক। পরদিন ভোরে নাকি সবার আগে ও এই জমিটা ক্লেইম করবে। বলল, এটাই নাকি এখন শহরের আশেপাশে একমাত্র খালি জায়গা। এটাই ও ক্লেইম করবে, যদিও জমিটা দেখেনি কোনদিন।'

'হায়, হায়! তারপর?' এবার মার প্রশ্ন।

'বুঝে গেলাম, যেমন করে হোক ওর আগে ক্লেইম করতেই হবে আমার। প্রথমে ভাবলাম খুব ভোরে উঠে দাঁড়িয়ে যাব লাইনে, কিন্তু পরমুহূর্তে মত পাল্টালাম – ঝুঁকি নেয়া কিছুতেই ঠিক হবে না। এমনিতেই প্রচুর সময় নষ্ট করেছি টিলিমিলি করে। সাপারটা শেষ করেই সোজা চলে এলাম ল্যান্ড অফিসে।'

'ওটা না বন্ধ হয়ে গেল?' বলল ক্যারি।

'ওই বন্ধ অফিসের দরজার সামনেই বসে পড়লাম। সারারাত থাকব ওখানে।'

'এতটা কি সত্যিই দরকার ছিল, চার্লস?' বলে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিল মা।

'বলে কী, এতটা দরকার ছিল না!' চোখ কপালে তুলল বাবা। 'একা আমি হলে একটা কথা ছিল, কয়েক ডজন লোক বসে পড়ল রাতেই কপাল ভাল যে আমিই পৌঁছেচি সবার আগে। আমার ঠিক পরেই রয়েছে সেই দুজন লোক, যাদের কথা শুনে ফেলেছিলাম।'

এই পর্যন্ত বলে চায়ে ফুঁক দিতে থাকল বাবা। অস্থির হয়ে বলে উঠল লরা, 'কিন্তু ওরা জানে না যে তুমিও একই জমি ক্লেইম করতে চাও, তাই না?'

'না, সকাল পর্যন্ত কিছুই টের পায়নি। কিন্তু সকালে হঠাৎ একজন পরিচিত লোক আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, "হ্যাল্লো, ইঙ্গলস! তুমি তা হলে সিলভার লেকেই শীতটা কাটিয়ে দিলে! ডি স্মেটের কাছাকাছিই ক্লেইম করছ, তাই না?"'

'হায়, হায়!' ককিয়ে উঠল মেরি।

'হ্যাঁ, হাঁড়ি তখন ভেঙে গেছে হাটে,' চায়ে চুমুক দিল বাবা। 'বুঝলাম, এখন দরজা ছেড়ে একটু নড়লেই গেছি। গ্যাঁট মেরে বসে থাকলাম। সূর্য যখন উঠল তখন ভিড় হয়ে গেছে দ্বিগুণ, যখন ল্যান্ড অফিসের দরজা খুলল, তখন অন্তত দুইশো লোক চাপ দিচ্ছে আমার পিঠে। লাইনের ধার সেদিন আর কেউ ধারছে না, এ ওকে ধাক্কা দিয়ে এগোবার চেষ্টা করছে সবাই সামনে।

'যাক, শেষ পর্যন্ত দরজা তো খুলল। আর একটু চা দেবে, ক্যারোলিন?'

'বলো, বলো! শেষ করো!' চেঁচিয়ে উঠল লরা। 'তারপর কী হলো, প্লিজ!'

'দরজাটা খুলতেই হুরনের লোকটা আমাকে টেনে ধরল। সঙ্গের লোকটাকে বলল, "ঢুকে পড়ো! আমি একে ধরে রাখছি!" অর্থাৎ আমাকে মারপিটে জড়িয়ে

নিতে পারলে ওর সঙ্গী নির্বিবাদে নিয়ে নিতে পারবে আমার হোমস্টেড। ঠিক সেই মুহূর্তে, চোখের পলকে, এক টনী পাথরের মত কেউ একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল হুরন-ওয়ালার ওপর। "ঢুকে পড়ো, ইঙ্গলস!" প্রচণ্ড হাঁক ছাড়ল লোকটা, "আমি দুরস্ত করছি ব্যাটাকে! ইওউ-ইই-ইই!"'

বাবার তীক্ষ্ণ চিৎকারে চমকে উঠে মা বলল, 'করো কী, চার্লস!'

'তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না লোকটা কে!'

'মিস্টার এডওয়ার্ডস!' বলল লরা।

'আরে!' থ হয়ে গেল বাবা। 'তুমি কী করে বুঝলে, লরা?'

'ইন্ডিয়ান টেরিটোরিতে প্রায়ই এরকম হাঁক ছাড়তেন। বলতেন, উনি নাকি টেনেসির বুনো বেড়াল। কোথায়, বাবা? সঙ্গে করে আনোনি ওঁকে?'

'রাজি করাতে পারলাম না অনেক চেষ্টা করেও। এখান থেকে দক্ষিণে জমির ক্লেইম ফাইল করেছে ও। বলল, ক্লেইম ডাকাতির ভয়ে জমি ছেড়ে নড়তে পারছে না। ওর কথা তোমাদেরকে মনে করিয়ে দিতে বলল। আমি বললাম তোমরা প্রায়ই ওর কথা স্মরণ করো, বিশেষ করে মেয়েরা ওর চল্লিশ মাইল হেঁটে গিয়ে সান্তা ক্লজের কাছ থেকে উপহার এনে দেয়া জীবনেও ভুলবে না। ঠিক সময় মত এডওয়ার্ডসের সাহায্য না পেলে আমার পক্ষে ক্লেইম ফাইল করা সম্ভব হতো না। ওরেব্বাপ! কী মারপিট যে বাধিয়ে দিয়েছিল!'

'ব্যথা পাননি তো?' জানতে চাইল মেরি।

'নাহ্। একটা আঁচড়ও লাগেনি। শুরু করেছে ঠিকই, কিন্তু আমি অফিস-কামরায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সরে গেছে ওখান থেকে।'

'যাক, সব ভাল যার শেষ ভাল,' বলল মা। 'ক্লেইম ফাইল হয়ে গেছে বলে সুস্থির লাগছে মনটা, বড় ভাল লাগছে।'

## নয়

আশ্রয়প্রার্থীদের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করতে মা আর লরা গলদঘর্ম। সন্ধে থেকে আসতে শুরু করে ওরা, দলের পর দল। রান্না করে তাদের খাইয়ে, থালা-বাসন ধুয়ে এক মিনিট সময় পাওয়া যায় না গল্প করার। ক্লান্তিতে ভেঙে আসতে চায় শরীর, ঘুমে জড়িয়ে আসতে চায় চোখ, কিন্তু মেশিনের মত কাজ করে যায় লরা অনেক টাকা জমিয়ে ফেলেছে ওরা, এ-টাকা কাজে লাগবে বাবার।

শহরে বাড়ি বানাতে লেগে গেছে বাবা। খামারে তো ঘর তুলতেই হবে, শহরেও একটা থাকলে অনেক সুবিধে হবে। ছয়মাসের মধ্যে বাড়ি তৈরি করতে হবে খামারে, কিন্তু এরই মধ্যে শহরে কয়েকটা বাড়ি বানিয়ে ফেলা সম্ভব। চাহিদা দেখে মনে হচ্ছে ভাল রোজগার হবে দু-তিনটে বিক্রি করে দিলে।

হুজুগ একদিন শেষ হলো। সবাই যে-যার বাড়ি বানিয়ে বাস করতে শুরু করল শহরে, হোটেলও তৈরি হয়ে গেল একটা –. কাজেই এখন আর কারও

বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার দরকার পড়ছে না। একদিন ওরা দেখল খাবার টেবিলে শুধু ওরা কয়জনই, বাইরের আর কেউ নেই। শান্তি ও শ্রান্তি দুটোই অনুভব করল লরা একই সঙ্গে। একয়দিনে বেয়াল্লিশ ডলার রোজগার করে ফেলেছে ওরা মা-মেয়েতে মিলে।

বাবা বলল, 'এই টাকাটা আলাদা করে রেখে দেব আমরা, নেহায়েত ঠেকায় না পড়লে এতে হাত দেব না।'

'যদি রাখতে পারি,' মনে মনে বলল লরা, 'মেরিকে কলেজে পাঠাবার কাজে কিছুটা সাহায্য হবে।'

'এখন যে-কোনদিন এসে পড়বে সার্ভেয়াররা,' আবার বলল বাবা। 'আমাদের বোধহয় বাঁধা-ছাঁদার কাজ শুরু করে দেয়া উচিত হবে। শহরে একটা বাড়ি থাকার উপযুক্ত হয়ে এসেছে প্রায়, আমরা ওখানে গিয়ে উঠব কোম্পানীর মাল-সামান বুঝিয়ে দিয়ে।'

'ঠিক আছে, চার্লস,' বলল মা। 'কালকেই বিছানা, চাদর সব ধুয়ে প্যাক করার কাজ শুরু করে দেব।'

সার্ভেয়াররা ফিরে এল। ওদের সব বুঝিয়ে দিয়ে শহরে চলে এল বাবা। মিস্টার ও মিসেস বোস্ট চলে গেলেন নিজেদের হোমস্টেডে। শহরে কয়েকদিন থেকেই হাঁপিয়ে উঠল লরা – চারদিকে খালি ঘ্যাচ-ঘোঁচ, খট-খট আওয়াজ, গাদাগাদি লোক, একটু কান পাতলেই লোকজনের কথা শোনা যায়।

লরার কপাল ভাল যে বেশিদিন শহরে থাকতে হলো না। শহরের দক্ষিণে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। হান্টার নামে এক হোমস্টেডারের কুটিরে ঢুকে বসে ছিল ক্লেইম-ডাকাত, এখানে কী করছে জিজ্ঞেস করতেই ওকে গুলি করে মেরে ফেলেছে ডাকাতটা। হান্টারের বাবা অফিসারকে নিয়ে গিয়ে গ্রেপ্তার করিয়েছে লোকটাকে।

এই ঘটনায় ভয় পেল বাবা। খুব শীঘ্রি মোটামুটি বাস করার উপযোগী একটা কুটির তৈরি করে সবাইকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল খামারের উদ্দেশে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল লরা। শহরে মানুষ থাকে কী করে!

হঠাৎ লরার দৃষ্টি আকর্ষণ করল দুটো বাদামি রঙের ঘোড়া। কেশর আর লেজ কালো। রোদ লেগে চকচক করছে ঘাড়ের পশম। হালকা একটা ওয়্যাগন টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঘোড়াদুটো। কমবয়সী একটা ছেলে চালাচ্ছে ওয়্যাগন, ঠিক তার পেছনে তার চেয়ে লম্বা এক যুবক দাঁড়িয়ে রয়েছে চালকের কাঁধে একটা হাত রেখে।

'ইশ্‌শ্‌! কী সুন্দর ঘোড়া!' চেঁচিয়ে উঠল লরা। 'দেখো, দেখো, বাবা!

ঘুরে তাকাল বাবা। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, 'ওরা ওয়াইল্ডার পরিবারের ছেলে। দুই ভাই। আলমানযো চালাচ্ছে, সঙ্গে রয়েছে ওর বড় ভাই রয়াল। শহরের উত্তর দিকে ক্লেইম করেছে ওরা। ওদের ঘোড়াগুলো সত্যিই দেখার মত, দেশের সেরা।'

'আমার যদি থাকত এরকম একজোড়া ঘোড়া!' মনে মনে বলল লরা। জানে না, বলার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর হয়ে গেছে ওর প্রার্থনা।

দক্ষিণে ওদের খামারের দিকে চলছে ওয়্যাগন। জলা থেকে আকাশে উঠল একটা সারস, পা-দুটো ল্যাগব্যাগ করে ঝুলছে।

'কী রকম দাম, বাবা?' জিজ্ঞেস করল লরা।

'কীসের কী রকম দাম, ছটফটি?'

'ওই রকম ঘোড়ার?'

'ও রকম একটা জুটি আড়াইশো ডলারের এক পেনি কম হবে না, তিনশোও হতে পারে।' একটু অবাক হলো বাবা, 'কেন?'

'না, এমনিই জিজ্ঞেস করলাম।' তিনশো ডলার এত বেশি টাকা যে লরার কল্পনাতেও আসে না। খুব ধনী না হলে কেউ এত দামি ঘোড়া কিনতে পারে না। মনে মনে ঠিক করল, যদি ওর কোনদিন অনেক টাকা হয়, তা হলে এইরকম একজোড়া ঘোড়া কিনবে।

কোনরকমে দাঁড় করানো কুটিরে পৌঁছে প্রথমে হাসল মা ঘরের দুরবস্থা দেখে, তারপর বলল, 'যাক, ক্লেইম-ডাকাতির হাত থেকে তো বাঁচা গেল। নিজের বাড়ি! আহা, নিজের বাড়ি! চার্লস, সত্যিই খুশি লাগছে আমার!'

সন্ধ্যায় মস্ত চাঁদ উঠল প্রেয়ারির দিগন্তে। বেহালাটা বের করে সুর বাঁধল বাবা। সবাই মিলে গাইল ওরা:

'আরাম, আয়েস, শান্তির খোঁজে যতই ঘুরি,
সবার সেরা মানতেই হয়, নিজের বাড়ি।
হোক না সেটা পর্ণকুটির, হোক না দীনহীন,
রাজার প্রাসাদ, অট্টালিকার ভ্রান্ত মোহ ছাড়ি,
সবার সেরা মানতেই হয়, নিজের বাড়ি।'

এতদিনে স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে পেল ইঙ্গলস পরিবার। এতদিনে শান্তি এল পশ্চিম-বিদ্বেষী মার মনে।

***

# দ্য লং উইন্টার

## এক

লোহার সীটে বসে আছে বাবা, স্যাম আর ডেভিড টানছে ঘাস কাটার মেশিনটা; ফরর-ফরর আওয়াজ তুলে কাটছে তীক্ষ্ণ ফলাগুলো, লম্বা ঘাস শুয়ে পড়ছে মাটিতে। দুপুরের চড়া রোদ চাঁদি ফাটিয়ে দিতে চায়। এক চিলতে ছায়া নেই প্রেয়ারির কোথাও।

পানি নিয়ে এলো লরা বাবার জন্য। ঢক-ঢক করে পানি খেয়ে ঢাকনি লাগিয়ে কাটা ঘাসের নীচে রেখে দিল বাবা জগটা। তারপর আবার এগোল সামনে।

লরা বসে পড়ল ঘাসের ওপর, বুক ভরে শ্বাস টানল। কাটা ঘাসের তাজা, মিষ্টি, বুনো গন্ধটা ভারি ভাল লাগে ওর। মেশিনের শব্দে পালিয়েছিল, এখন আবার একটা দুটো করে গর্ত থেকে মাথা তুলতে শুরু করেছে বাদামি ডোরাকাটা গোফারগুলো, ছোট ছোট পাখি ফুড়ুৎ করে উড়ে এসে বসছে ঘাসের নরম ডাঁটায়, একটা ছোট্ট গার্টার সাপ এঁকেবেঁকে চলে গেল সামনে দিয়ে।

মোউইং মেশিনের শব্দ বাড়ল, মাথা ঝোঁকাতে ঝোঁকাতে ফিরে আসছে ঘোড়াদুটো। লরা হঠাৎ কথা বলে ওঠায় আঁৎকে উঠল ডেভিড।

'ওয়াও!' চমকে গিয়ে হাঁক ছাড়ল বাবা। 'আরে! আমি মনে করেছি কখন চলে গেছ তুমি! প্রেয়ারি-মুরগির মতন ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে বসে কী করছ, লরা?'

'আমিও তো তোমার সঙ্গে কাজ করতে পারি, বাবা?' বলল লরা। 'দুজনে করলে অনেক ঘাস জমাতে পারব আমরা।'

হ্যাট তুলে উস্কোখুস্কো চুলে আঙুল চালাল বাবা। 'এসব কাজে শক্তি লাগে, আধ-বোতল। তুমি একে মেয়ে, তার ওপর ছোট।'

'চোদ্দ বছর চলছে আমার,' বলল লরা। 'ছোট কোথায়? আমি পারব, বাবা। আমি জানি পারব।'

লরা জানে, মোউইং মেশিনটা কিনতে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে বাবার—কাজের লোক রাখার উপায় নেই। প্রতিবেশীরাও যে-যার মাঠে ব্যস্ত, চাইলেও কেউ সাহায্য করতে পারবে না এখন। অথচ ঘাস গাদা করতে আর অন্তত একজন লাগে।

'হয়তো পারবে,' মাথা চুলকাল বাবা। 'চেষ্টা করে দেখা যায়। সত্যিই যদি পার, দারুণ হবে; আমরা দুজনেই অনেক খড় গাদা করে ফেলতে পারব—লোক ভাড়া করতে হবে না আর।'

লরা বুঝতে পারল, বাবার মনটা ভারমুক্ত হয়ে গেল ওর সাহায্যের সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে। এক দৌড়ে কুটিরে ফিরে গেল মাকে খবরটা দিতে।

'ঠিক আছে,' বলল মা। যদিও মেয়েরা এসব কাজ করুক তা মার খুবই

অপছন্দ। কিন্তু এখন ঠেকার সময় বলে কোন আপত্তি করল না।

'আমি তোমার জন্যে জগে করে পানি নিয়ে যাব,' বলল দশ বছরের ক্যারি।

'আর ঘরের কাজ তোমারগুলোও করে দেব আমি,' বলল মেরি। অন্ধ হলেও বাসন-পেয়ালা ধোয়া-মোছা, বিছানা ঠিক-ঠাক করা ইত্যাদি ঘরের অনেক কাজ স্বচ্ছন্দে করতে পারে মেরি।

কড়া রোদে পরদিনই শুকিয়ে চড়চড়ে হয়ে যায় কাটা ঘাস। আঁচড়া দিয়ে টেনে জায়গায় জায়গায় স্তূপ করে রেখেছে বাবা ওগুলো। আরও জমাবে আজ। আগামীকাল খড়-টানা গাড়িতে চড়ে লরাও যাবে মাঠে বাবার সঙ্গে।

পরদিন। স্তূপগুলোর পাশে থেমে দাঁড়িয়ে আঁচড়া দিয়ে খড় তুলে বাবা গাড়িতে ফেলছে, আর ফুলে থাকা ঘাস পা দিয়ে মাড়িয়ে নিচু করছে লরা। ধীরে ধীরে উঁচু হচ্ছে খড়। ঝুপ-ঝুপ করে বোঝার পর বোঝা এসে পড়ছে গাড়িতে, লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে পা দিয়ে চেপে আরও ঘাস আঁটানোর ব্যবস্থা করছে ও। ঘাসের সঙ্গে উঁচু হচ্ছে লরাও। এক সময়ে ভর্তি হয়ে গেল গাড়ি, তারপরেও আসছে ঘাস। বাবা একটু থামতে চারদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল লরা—বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে গোটা প্রেয়ারি যেন দুলছে হাওয়ায়।

গাড়ির উঁচু বেড়া ছাড়িয়ে আরও অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে ঘাসগুলো, চারদিকের কিনারা নীচের দিকে ঢালু হয়ে আছে বলে এখন সাবধানে লাফাচ্ছে লরা। ঘেমে প্রায় গোসল হয়ে গেছে ও, শিরদাঁড়া বেয়ে নামছে ঘামের ফোঁটা। টুপি খসে ঝুলছে পিঠে, খোঁপা খুলে গিয়ে বাতাসে উড়ছে খোলা চুল।

ডেভিডের কোমরে এক পা রেখে ওপরে উঠে এল বাবা। 'খুব সুন্দর মাড়ানো হয়েছে লরা, প্রায় ডবল ঘাস তুলতে পেরেছি গাড়িতে।'

আস্তাবলের কাছে এসে থামল গাড়ি। লরা নীচে নেমে ওয়্যাগনের ছায়ায় বসল। বাবা একটা সমান জায়গা বাছাই করল ঘাসের গাদা তৈরির জন্য। কয়েক বোঝা ঘাস নীচে ফেলে নেমে এল বাবা, ওগুলো গোল করে বিছিয়ে রেখে আবার ওপরে উঠে আরও ঘাস ফেলল তার ওপর, তারপর ওগুলোও সমান করে বিছিয়ে পা দিয়ে চেপে নিচু করল।

লরা বলল, 'নীচের কাজটা তো আমিই করতে পারি, বাবা। তা হলে তোমার আর বারবার ওঠা-নামা করতে হয় না।'

হ্যাটটা পিছনে ঠেলে দিয়ে পিচফর্কে ভর দিয়ে বিশ্রাম নিল বাবা মিনিট খানেক, তারপর বলল, 'খড়ের গাদা তৈরি আসলে দুইজনের কাজ। একজন করতে গেলে অনেক সময় লাগে, কিন্তু উপায় নেই, তুমি এখনও অনেক ছোট, হাফ-বোতল।'

কিন্তু আবার এক গাড়ি ঘাস আনার পর লরার আগ্রহ দেখে আঁচড়াটা দিল বাবা ওর হাতে। ওর চেয়েও লম্বা আঁচড়ার হাতল। অনভ্যস্ত হাতে যতটা সম্ভব সুন্দর করে বিছাল ও ঘাসগুলো সমান পুরু করে, তারপর পা দিয়ে চেপে চেপে নিচু করল ফুলে থাকা ঘাস। দ্বিতীয় গাড়ির সব ঘাস গাদা করা হয়ে গেলে বাবা নিজেও উঠল গাদার ওপর, চেপে-চুপে চারদিক সমান করে রেখে আবার চলল দুজন আরও ঘাস আনতে।

রোদের তেজ বেড়েছে, বাতাসও যেন আগুনের হল্কা। ক্লান্ত হয়ে পড়ছে লরা, পা দুটো কাঁপছে একটু একটু। মাঠ থেকে ঘাসের গাদা পর্যন্ত যেতে-আসতে যেটুকু বিশ্রাম পাচ্ছে তাতে চলছে না, তা ছাড়া তেষ্টাও পেয়েছে খুব। ওর মনে হলো, অনন্তকাল ধরে ওরা শুধু গাড়ির পর গাড়ি ভর্তি করছে আর আস্তাবলের কাছে এনে উঁচু করছে ঘাসের গাদা। বেলা দশটার দিকে আধ-জগ পানি নিয়ে এল ক্যারি।

লরাকে আগে খেতে বলল বাবা, তবে একবারে বেশি খেতে বারণ করল। এক ঢোক খেয়েই অবাক চোখে ক্যারির দিকে চাইল লরা। খিলখিল করে হেসে উঠল ক্যারি, বলল, 'বোলো না, লরা, আগেই বলে দিয়ো না বাবাকে!'

আদা-জল পাঠিয়েছে মা। কুয়োর ঠাণ্ডা পানিতে সেরকা, চিনি আর আদা মিশিয়ে দিয়েছে, যাতে এই গরমে ঠাণ্ডা পানি খেয়ে সর্দি-গর্মি না লেগে যায় ওদের।

দুপুরের আগেই বিশাল এক খড়ের গাদা তৈরি হয়ে গেল। ওপরটা নিজে পা দিয়ে মাড়িয়ে গোল মত করল বাবা, যাতে বৃষ্টির পানি ভেতরে না ঢুকে গড়িয়ে বাইরে পড়ে।

দুপুরে কুটিরে ফিরে দেখল ওরা ডিনার তৈরি। লরার দিকে চেয়েই বাবাকে জিজ্ঞেস করল মা, 'ওর জন্যে পরিশ্রমটা বেশি হয়ে যাচ্ছে না তো, চার্লস?'

'আরে না!' বলল বাবা। 'ছোট্ট একটা ফরাসী ঘোড়ার শক্তি ওর গায়ে। খুব উপকার হয়েছে আমার ওকে পেয়ে। একটা গাদা করতেই আমার সারাদিন পার হয়ে যেত ও না থাকলে, এখন সারাটা বিকেল পাচ্ছি আমি ঘাস কাটার জন্যে।'

গর্বে মনটা ভরে গেল লরার। যদিও হাত, পা আর পিঠের ব্যথায় রাতে কয়েক ফোঁটা পানি বেরিয়ে এল চোখ দিয়ে, কাউকে কিচ্ছু বলল না ও।

দুই দিনের মধ্যে আর একটা গাদা তৈরি করার মত খড় স্তূপ করে ফেলল বাবা মাঠে। আবার এক দুপুর পরিশ্রম করে আরেকটা গাদা তৈরি করলো ওরা দুজন। এইভাবে একের পর এক ছয়টা মস্ত গাদা তৈরি হয়ে গেল অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই। ওগুলোর দিকে চাইলে তৃপ্তিতে বুকটা ভরে যায় লরার।

'মাঠের সব ঘাস কাটা হয়ে গেছে, এবার বিলের ঘাসগুলোও কাটব ভাবছি,' বলল বাবা। 'আমাদের অত ঘাস লাগবে না, তবে আগামী বসন্তে নতুন সেটলারদের কাছে বেচতে পারব ভাল দামে।'

বিলের ঘাস অনেক বড়, ভারি আর খসখসে। লরার পক্ষে আঁচড়া দিয়ে তোলা সম্ভব নয়, তাই শুধু পায়ে মাড়িয়ে ফুলে থাকা ঘাসগুলো নিচু করার কাজে সাহায্য করতে পারল ও।

একদিন মাস্করাটের কলোনি দেখাল বাবা লরাকে ঘাস আর মাটি মিশিয়ে চমৎকার বাড়ি বানিয়েছে ওরা ঠিক পানির ধারে। বাড়িতে ঢোকার কোন দরজা দেখা গেল না। বাবাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, নীচের দিকে নাকি আছে একটা দরজা। ওটা দিয়ে সরাসরি পানিতে নামে ওরা, রাতভর সাঁতার কাটে; কচি ঘাস ঘাসের শিকড় আর শৈবাল খায়; খেলাধুলা করে তারপর ভোর হলে যার-যার ঘরে ফিরে গিয়ে সারাটা দিন ঘুমায়।

চিন্তিত কণ্ঠে বাবা বলল, 'মনে হচ্ছে, কড়া শীত পড়বে এবার। একেবারে বেমক্কা রকম।'

বাবাকে মাথা নাড়তে দেখে অবাক হলো লরা। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি জানলে কী করে, বাবা?'

'এই মাস্কর্যাটের কলোনি দেখে। এত পুরু করে বাড়ি বানাতে আর দেখিনি কখনও। কী করে যেন আগাম টের পায় ওরা, যত বেশি শীত পড়বে বলে মনে করে, ততই পুরু করে তৈরি করে ওরা ওদের কলোনি।'

রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড শীতের কথা কল্পনাও করতে পারছে না লরা। জিজ্ঞেস করল, 'ওরা টের পায় কী করে, বাবা?'

'তা জানি না। কিন্তু ঠিকই টের পায়। এসব ব্যাপারে ওদের ভুল হয় না কখনও। হয়তো প্রকৃতিই কোনভাবে ওদের জানিয়ে সাবধান করে দেয়।'

'আমাদের করে না কেন?'

'করে না, কারণ আমাদের মাথায় বুদ্ধি দিয়েছে, যেটা আবার ওদের দেয়নি। বুদ্ধি খাটিয়ে অনেক কিছু বুঝে নেয়ার ক্ষমতা দিয়েছে প্রকৃতি আমাদের। যদি না বুঝি, সেটা আমাদের দোষ।'

এর পর থেকে জোরে-শোরে কাজ চালিয়ে গেল বাবা। শীত আসার আগে এদিকের সব কাজ শেষ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কুটিরটা শীত কাটাবার উপযোগী করতে হলে অনেক পরিশ্রম ব্যয় করতে হবে ওর পেছনে।

বিল-পাড়ের সব ঘাস কাটা হয়ে গেল একসময়। দুজনে মিলে আরও কয়েকটা বিশাল গাদা তৈরি করল ওরা।'

অক্টোবরের শুরুতে তিনদিন একটানা বৃষ্টি হলো। তার ফলেই যে-রকম ঠাণ্ডা পড়ল, তাতে ঘাবড়ে গেল মা। 'ওরে বাবা! অক্টোবরেই এত শীত! আসল শীতকালে এই নড়বড়ে ঘরে থাকব কী করে?'

এক সকালে দেখা গেল, তুষারে ছেয়ে গেছে গোটা প্রেয়ারি। আলকাতরা মাখা মোটা কাগজ দিয়ে দেয়ালের ফাঁক-ফোকর বন্ধ করল বাবা, কিন্তু তাতেও মানতে চায় না শীত।

আবার যখন রোদ উঠল, বাবা স্থির করল, এ-বছরের ফলন যা পাওয়া যায় এখনই ঘরে তোলা দরকার। ফসল সামান্যই। প্রথম বছরে খুব বেশি কিছু আশাও করেনি বাবা। প্রথম চাষে ঘাসের শিকড়গুলো আলগা হয়েছে, শীত গেলেই পচে যাবে ওগুলো—তখন হবে ফসল। তারপরেও আলু, টমেটো, শিম, শুঁটি, কুমড়ো, শালগম—সব মিলে খুব খারাপও বলা যায় না। কিছু জমিতে জই লাগিয়েছিল বাবা, সেগুলো আর শুকনো ঘাসের মজুদে গোটা শীত আরামেই কেটে যাবে গরু আর ঘোড়াগুলোর।

বাবার তাড়াহুড়ো দেখে প্রথম দিকে কয়েকদিন হাসি-তামাশা করেছিল মা, কিন্তু অক্টোবর মাসেই তুষার-ঝড় শুরু হয়ে যেতে দেখে কেমন যেন ভড়কে গেল। টানা তিনদিন পর থামল সে ঝড়। এই তিন দিনেই শীতে জমে যাওয়ার মত অবস্থা হলো সবার। আগুন উস্কে দিয়েও গরম রাখা গেল না ঘর। জুতো-মোজা পায়ে দিয়ে; কোট, শাল গায়ে দিয়ে আগুনের ধারে বসেও হি-হি করে কাঁপল ওরা

সবাই মিলে।

ঝড় থামলে বাবা বলল, 'এমন আবহাওয়া জীবনে দেখিনি আমি! গোটা ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না আমার কাছে, ক্যারোলিন। কী যেন একটা ঘনিয়ে আসছে চারপাশে।'

মা বলল, 'কই, আমার তো ঠিকই মনে হচ্ছে সব।'

# দুই

শহরে, হারথর্নের স্টোরে, জমায়েত হয়েছে ওরা কয়েকজন। তুষার-ঝড়ে আটকা পড়া ট্রেন এসে পৌঁছেচে, চারপাশ থেকে লোকজন এসেছে শহরে বাজার করতে, সেই সঙ্গে কার কী সংবাদ খোঁজ নিতে।

রয়াল আর আলমানযো ওয়াইল্ডার এসেছে ওদের হোমস্টেড থেকে। মিস্টার বোস্ট এসেছেন, বাবাও বন্দুক হাতে মাত্র পৌঁচেছে—জ্যাক র‍্যাবিট পায়নি একটাও, তাই লবণ দেয়া মাংস নিয়েই ফিরবে বাড়ি।

পায়ের শব্দ পায়নি যদিও, বাবার মনে হলো কে যেন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কথা থামিয়ে দিলেন মিস্টার বোস্ট। সবাই একসঙ্গে পিছনে ফিরল।

একজন ইন্ডিয়ান দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধ। গাঢ় বাদামি চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ পড়েছে। ধূসর রঙের একটা কম্বল জড়িয়েছে গায়ে, তার নীচে বুকের ওপর দু'হাত বাঁধা। মাথাটা বেশির ভাগই কামানো, পিছনের চুলে জড়ানো ব্যান্ডে গোঁজা একটা ঈগলের পালক। চোখ দুটোয় যেন ক্ষুরের ধার। একে একে সবাইকে দেখল বুড়ো ইন্ডিয়ান, তারপর বলল, 'তুষার, রাশি রাশি তুষার!'

কাঁধ থেকে পিছলে খানিকটা নেমে গেল কম্বল। নীচ থেকে বেরিয়ে এল একটা হাত। উত্তর, পশ্চিম আর পুব থেকে কিছু কাচিয়ে সামনে জড়ো করার ভঙ্গি করল, তারপর হাতটা চর্কির মত ঘুরাল।

'অনেক তুষার, জোর তুফান। খারাপ!'

'কত দিন?' জিজ্ঞেস করল বাবা।

জবাব এল, 'অনেক চাঁদ!' চারটে আঙুল দেখাল, তারপর তিনটে। সাত আঙুল মানে সাত মাস। এর কথা যদি সত্য হয়, সাত মাস ধরে চলবে এখানে প্রচণ্ড তুষার-ঝড়!

সবাই চেয়ে থাকল ওর দিকে। কারও মুখে কথা নেই।

'সাদা মানুষ, কথাটা বললাম তোমাদের।' সাত আঙুল দেখিয়ে বলল, 'বিগ স্নো।' আবার সাত আঙুল, 'বিগ স্নো।' আরও একবার সাত আঙুল দেখিয়ে শেষ করল কথা, 'হীপ বিগ স্নো। অনেক চাঁদ। খুব খারাপ!'

নিজের বুকে তর্জনী দিয়ে টোকা দিল। গর্বের সঙ্গে বলল, 'অনেক বয়স! অনেক! আমি জানি, আমি দেখেছি।'

স্টোর থেকে বেরিয়ে বাইরে রোদে দাঁড়ানো ঘোড়ার পিঠে চেপে চলে গেল

লোকটা পশ্চিম দিকে।

'খুব দেখাল একচোট,' বললেন মিস্টার বোস্ট।

'সাত আঙুল দেখিয়ে কী বোঝাতে চাইল লোকটা?' জিজ্ঞেস করল আলমানযো।

ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল বাবা। বুড়ো বলে গেল, প্রতি সাত বছর পর পর আসে ভারি তুষার ঝড়, কিন্তু তৃতীয়বার, অর্থাৎ একুশ বছর পর আসে তীব্র শীত, ভয়ানক তুষার-ঝড়। একটানা সাত মাস স্থায়ী হয় সেটা।

'কী মনে হয়, পাগলের প্রলাপ বকে গেল বুড়োটা, নাকি এর কথায় কান দেয়ার সত্যি দরকার আছে?' জানতে চাইল রয়াল। কেউ জবাব দিতে পারল না এ প্রশ্নের। একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'বলা যায় না, কথাটা সত্যি হতেও পারে। শীতকালটা শহরে কাটালে কেমন হয়? এখানে আমার ফীড-স্টোরটা মাঠের মাঝখানের ওই নড়বড়ে কুঁড়েঘরের চেয়ে অনেক নিরাপদ। তুমি কী বল, মানযো?'

'আমার আপত্তি নেই,' বলল আলমানযো।

'তুমি কী ভাবছ, বোস্ট?' জিজ্ঞেস করল বাবা, 'শহরে চলে আসবে?'

ধীরে মাথা নাড়লেন মিস্টার বোস্ট। 'পারব বলে মনে হয় না। সমস্ত গরু, ঘোড়া, মুরগি নিয়ে কোথায় উঠব এখানে? ভাড়া দেয়ার সাধ্য থাকলেও নাহয় ভেবে দেখা যেত। নাহ্, ফেঁসে গেছি, ওখানেই কাটাতে হবে আমার শীতটা।'

সবাই গম্ভীর, ভাবনায় পড়ে গেছে। কেনা-কাটা সেরে দাম চুকিয়ে দ্রুত হেঁটে বাড়ি ফিরে এল বাবা।

রুটি সেঁকছিল মা, বাবাকে দেখেই চমকে উঠল। 'কী হয়েছে, চার্লস? এত জলদি ফিরে এলে যে? খারাপ কোন খবর?'

'না, তেমন কিছু না,' বলল বাবা। 'এই যে তোমার চিনি, চা আর নোনা মাংস। খরগোশ পাইনি। খারাপ কোন খবর নেই, তবে যত শীঘ্রি সম্ভব শহরে গিয়ে উঠব আমরা। প্রথমে গরু-ঘোড়ার জন্যে ঘাস নিয়ে যেতে হবে। ভাবছি, আজই সাপারের আগে রেখে আসব একগাড়ি।'

'এত তাড়াহুড়ো কীসের, চার্লস?' বলল মা। কিন্তু কথাটা শেষ হওয়ার আগেই লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেছে বাবা। সবাই অবাক হয়ে এ-ওর মুখের দিকে চাইল।

'এ-রকম তো করেনি ও আগে কখনও!'

'আমি যাই, দেখি বাবার সাহায্য দরকার কিনা,' বলল লরা। 'খারাপ কিছু না, বাবা তো বললই।'

মা-ও লরার সঙ্গে আস্তাবলে চলে এল। ঘোড়া জুতছে বাবা ঘাসের গাড়িতে। কাজ করতে করতে বলল, 'খুব কড়া শীত পড়বে এবার। সত্যি কথা বলতে কী, ঘাবড়ে গেছি আমি। এই পাতলা কাঠের নড়বড়ে বাড়ি তুষার-ঝড় ঠেকাতে পারবে না। গত ঝড়েই দেখো, কী অবস্থা হয়েছে আলকাতরা মাখা কাগজের। শহরের বাড়িতে চলে যাচ্ছি আমরা।'

'কিন্তু এত তাড়াহুড়োর কী হলো?' জানতে চাইল মা।

'আমার মনে হচ্ছে, আরও আগেই সরে যাওয়া উচিত ছিল। মাস্করাটদের মত আমারও ধারণা, এবার শীত ঠেকাতে শক্ত, পুরু, নিশ্ছিদ্র দেয়াল দরকার হবে। বেশ কিছুদিন ধরেই এরকম একটা অনুভূতি হচ্ছিল–তোমাকে আর মেয়েদের নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়া দরকার। আজ যখন ইন্ডিয়ানটা–'

থেমে গেল বাবা।

'কীসের ইন্ডিয়ান?' চমকে গেল মা। ইন্ডিয়ানদের দুচোখে দেখতে পারে না মা, ভয়ও পায়।

'আগে ফিরে আসি,' বলল বাবা। 'সন্ধের সময় খেতে বসে বলব সব।'

গাদা থেকে পিচফর্ক দিয়ে ঘাস-খড় তুলতে শুরু করল বাবা গাড়িতে, আর পা দিয়ে মাড়িয়ে ওগুলোকে নিচু করতে থাকল লরা। শুকনো ঘাস ঘোড়ার পিঠের চেয়ে আর কিছুটা উঁচু হতেই নামতে বলল ওকে বাবা। বলল, 'শহরে আমি একাই যাব, ওখানে তো আর ছেলেদের কাজ তোমাকে দিয়ে করানো ঠিক হবে না।'

গাড়ি থেকে পিছলে নামল লরা গাদার অবশিষ্ট খড়ের ওপর। শহরে চলে গেল বাবা গাড়ি নিয়ে।

# তিন

বাড়ির পিছনে এনে থামাল বাবা ওয়্যাগন। আস্তাবলের পাশে খড়ের গাদা দেখতে পেল লরা। ঘেরা বারান্দা পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকল ওরা পিছন দরজা দিয়ে। সবাই হাত লাগিয়ে গোছগাছ করে নিতে বেশি সময় লাগল না।

শহরে আসতে পেরে মা খুশি–পুরো শীতটা স্কুলে যেতে পারবে লরা আর ক্যারি। মেরি খুশি–খামার-বাড়িতে যেটা যেখানে যেমনভাবে ছিল, এখানেও মা সে-সব ঠিক একই ভাবে সাজিয়ে রেখেছে; নতুন কোথাও এসেছে বলে মনেই হচ্ছে না ওর, সবকিছু হাতে পাচ্ছে ঠিক আগের মত। বাবা খুশি–স্ত্রী-সন্তানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গেছে বলে। শুধু লরা আর ক্যারি অস্বস্তি বোধ করছে অপরিচিত স্কুলে যাওয়ার চিন্তায়।

পরদিন সকালে উঠে গরম জামাকাপড় আর হুড পরে রওনা হলো ওরা দুজন স্কুলের পথে। কাছাকাছি গিয়ে দেখল, স্কুলের সামনের রোদেলা মাঠে হ্যান্ডবল নিয়ে খেলা করছে অচেনা কয়েকটা ছেলে। দুটো মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্কুলে ঢোকার দরজার সামনে লম্বা একটা ছেলে সাবলীল ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠল শূন্যে, খপ্ করে বলটা ধরেই লরার ওপর আটকে গেল ওর চোখ, ঝিক্ করে হেসে উঠল গোটা মুখ। পরমুহূর্তে ছুঁড়ে দিল বলটা লরার দিকে।

বাঁকা হয়ে নেমে আসছে বল, কিছু না ভেবেই দু'পা সামনে এগিয়ে লাফিয়ে ধরে ফেলল লরা বলটা।

হৈ-হৈ করে উঠল মাঠের সব ছেলে। একজন চেঁচিয়ে বলল, 'অ্যাই, ক্যাপ, মেয়েরা আবার বল খেলে নাকি!'

'আমি ভাবতেও পারিনি ধরে ফেলবে,' বলল ক্যাপ।

'তাই বলে আমি খেলছি না,' বলে বলটা ছুঁড়ে দিল লরা ওদের দিকে।

'আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলার ক্ষমতা রাখে ও!' চেঁচিয়ে আর সবাইকে বলল ক্যাপ, তারপর লরার দিকে ফিরে বলল, 'চলে এসো, সবাই মিলে খেলি।' দরজায় দাঁড়ানো মেয়েদুটোর দিকে ফিরল এবার, 'মিনি আর মেরি পাওয়ার, তোমরাও এসো না, সবাই খেলি?'

কারও কথায় কান না দিয়ে হাত থেকে ছেড়ে দেয়া বইগুলো তুলে নিয়ে ক্যারির হাত ধরে এগিয়ে গেল লরা দরজায় দাঁড়ানো মেয়েদুটোর দিকে।

'আমার নাম মেরি পাওয়ার,' বলল লম্বা মেয়েটা, 'আর এ হচ্ছে মিনি জনসন।'

'আমি লরা ইঙ্গলস, আর এ আমার ছোট বোন, ক্যারি।'

মেরি পাওয়ারের গাঢ় নীল চোখে হাসির ঝিলিক দেখে লরাও হাসল।

'তোমার দিকে যে বল ছুঁড়েছিল, ওর নাম ক্যাপ গারল্যান্ড।'

আর কোনও কথা হওয়ার আগেই দরজায় এসে দাঁড়ালেন টীচার, হাতের বেলটা নেড়ে ভেতরে ডাকলেন সবাইকে। সবাই ঢুকে পড়ল স্কুলঘরে।

দুই সারিতে বারোটা করে ঝকঝকে নতুন ডেস্ক সাজানো রয়েছে ঘরে। ঠিক মাঝখানে বসানো হীটিং স্টোভটার সামনে-পিছনেও রয়েছে চারটে করে ডেস্ক। বেশিরভাগ ডেস্কই খালি। মেয়েদের সারিতে পিছন দিকের একটা ডেস্কে পাশাপাশি বসল মেরি পাওয়ার ও মিনি জনসন। ছেলেদের সারিতে পিছনের দুটো ডেস্কে বসল ক্যাপ গারল্যান্ড ও আরও তিনজন ছেলে। জনা কয়েক ছোট ছেলেমেয়ে বসল সামনের দিকের ডেস্কে।

'তোমরা নতুন, তাই না?' লরা আর ক্যারিকে জিজ্ঞেস করলেন টীচার। মুখে হাসি। 'নাম বলো।'

ওদের নাম লিখে নিলেন টীচার, নিজের পরিচয় দিলেন, 'আমি ফ্লোরেন্স গারল্যান্ড। তোমাদের বাড়ির ঠিক পেছনেই আমাদের বাড়ি; পরের রাস্তাটা দিয়ে যেতে হয়।'

ও, ক্যাপ গারল্যান্ড তা হলে টীচারের ভাই হয়, ভাবল লরা।

'ফোর্থ রিডার শেখা আছে তোমার?' জানতে চাইলেন টীচার।

'হ্যাঁ, ম্যা'ম!' বলল লরা। বলল না, শুধু শেখা নয়, পুরোটা মুখস্থ আছে।

'তা হলে তো দেখতে হয় ফিফ্থ্ রিডার কতটা পার।' লরাকে মাঝের সারির পিছনের সীটে বসতে বললেন টীচার, মেরি পাওয়ার আর মিনি যে ডেস্কে বসেছে তার পাশের ডেস্কে। ছোট মেয়েদের সঙ্গে সামনের সীটে গিয়ে বসল ক্যারি। নিজের সীটে বসে এবার রুলার ঠুকলেন টীচার।

'স্কুল শুরু হচ্ছে,' বলে বাইবেল খুললেন প্রথমে। 'আজ সকালে তেইশতম সাম্ পড়ছি।'

প্রতিটা স্তোত্র লরার মুখস্থ, কিন্তু তারপরেও খুব ভাল লাগল ওর কাছে টীচারের আবৃত্তি। বাইবেল বন্ধ হতেই সবাই যার যার পাঠ্যবই খুলল।

স্কুলের ভয় দূর হয়ে গেল লরার খুব অল্পদিনেই। যতই দিন গেল ততই প্রিয়

হয়ে উঠল ওর কাছে স্কুলের পরিবেশ। একটা ডেস্কে একা বসে ও, কিন্তু মিনি ও মেরির সঙ্গে খুবই ভাব হয়ে গেছে, একই সঙ্গে স্কুলে আসে ওরা, বাড়িও ফেরে এক সঙ্গে। বিরতির সময় বেশ কয়েকবার বল খেলতে ডেকেছে ওদেরকে ক্যাপ গারল্যান্ড, কিন্তু ওরা রাজি হয়নি।

বড় ছেলেদের মধ্যে ক্যাপ গারল্যান্ড ছাড়াও রয়েছে পাতলা-সাতলা আর্থার জনসন আর খয়েরি চোখের বেন উডওয়ার্থ। বেন উডওয়ার্থ রেলওয়ের ডিপো এজেন্টের ছেলে, আর্থার মিনি জনসনের ভাই।

মিনি আর মেরি দুজনেই পুবের স্কুলে নিয়মিত পড়াশোনা করেছে। কিন্তু লরা দেখল, বাসায় ওকে এত সুন্দর করে পড়িয়েছে মা যে কোনও বিষয়েই ও কারও চেয়ে পিছিয়ে নেই। অঙ্কেও ও সবার সেরা।

রোজ সন্ধ্যায় সাপার শেষে মেরিকে নিয়ে পড়তে বসে লরা। প্রথমে অঙ্কের প্রশ্নটা পড়ে শোনায় ও মেরিকে, তারপর স্লেটে কষে ফেলে অঙ্কটা, ওদিকে মেরিও মনে মনে বের করে ফেলে সমাধান। ইতিহাস ও ভূগোলের পাঠও মেরিকে পড়ে শোনায় প্রথমে, তারপর দুজন মিলে প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর শিখে নেয়। মেরিকে অন্ধদের কলেজের জন্য এগিয়ে রাখছে লরা, যদি কোনদিন বাবা ওকে ওখানে পাঠাবার মত যথেষ্ট টাকা উপার্জন করতে পারে, সেই আশায়।

বেশ অনেক দিন নিয়মিত ক্লাস করে এখন সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলো অস্থির লাগে ক্যারি আর লরার, কাটতেই চায় না কিছুতে, সোমবারের জন্য ছটফট করে মন। এমনি এক সোমবারের দুপুরে এল প্রথম তুষার-ঝড়।

হঠাৎ মেঘে ঢাকা পড়ল সূর্য। মনে হলো কেউ যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল বাতিটা। আঁধার ঘনিয়ে এল চারপাশে, পরমুহূর্তে প্রবল হাওয়া এসে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকি দিল স্কুলহাউসটাকে। কেঁপে উঠল গোটা বাড়ি, খটাখট আওয়াজ হলো দরজা-জানালায়।

চমকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মিস গারল্যান্ড। ছোট একটা মেয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল, সাদা হয়ে গেল ক্যারির মুখ।

জানালা দিয়ে দেখা গেল ধূসর হয়ে গেছে চারদিক, সাঁই-সাঁই ছুটছে তুষার, স্টোভপাইপে শিস কেটে বিলাপ করছে বাতাস।

'ভয়ের কিছু নেই,' বললেন টীচার। 'সাধারণ ঝড় উঠেছে। তোমরা যে যার পড়া তৈরি করো।'

লরা ভাবছে, বাড়ি যাবে কী করে। মেইন রোড স্কুল থেকে অনেক দূর। পথ হারালেই সব শেষ। এখানে আর সবাই এসেছে পুব থেকে–প্রেয়ারির তুষার-ঝড় সম্পর্কে কারও কোনও ধারণা নেই। কিন্তু লরা আর ক্যারি ভাল করেই জানে কী রকম মারাত্মক এই ঝড়। তবে বাড়ি থেকে এতদূরে তুষার-ঝড়ে আটকা পড়লে কী করতে হবে জানা নেই ওদের। এটুকু স্পষ্ট বুঝতে পারছে লরা, এই স্কুলে আটকা পড়লে অসুবিধে আছে। কয়লা সামান্য যা আছে তাতে আজকের দিনটাও চলবে না, ডেস্কগুলো ভাঙা গেলে ওগুলো পুড়িয়ে আজ রাতটা হয়তো কাটতে পারে; কিন্তু ঝড় যদি তিনদিন স্থায়ী হয় তা হলে জমে বরফ হয়ে যাবে ওরা প্রত্যেকে।

মাথা না নেড়ে শুধু চোখ তুলে মিস গারল্যান্ডের দিকে চাইল লরা। ঠোঁটে কামড় দিয়ে ভুরু কুঁচকে ভাবছেন তিনি, কিন্তু কী করা উচিত সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। ভয় লাগছে বটে, কিন্তু ভাবছেন, ঝড়ের কারণে স্কুল ছুটি দেয়া কি উচিত হবে?

দরজায় জোর করাঘাতের শব্দে চমকে উঠল সবাই। ওভারকোট, টুপি আর মাফলার পরা সাদা একটা মূর্তি ঢুকল ঘরে। প্রথমে কেউ চিনতে পারল না লোকটাকে, বরফ জমে শক্ত হয়ে যাওয়া মাফলারটা সরাতেই চেনা গেল–মিস্টার ফস্টার। একজন হোমস্টেডার। টীচারের বাড়ির ঠিক সামনেই শেরউডদের বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন তিনি শীতকালটা শহরে কাটাবেন বলে।

'আপনাকে নিতে এলাম,' বললেন তিনি টীচারকে।

মিস গারল্যান্ড তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন, তারপর ডেস্কের ওপর রুলার ঠুকে বললেন, 'শোনো তোমরা! স্কুল ছুটি হয়ে গেল। তোমরা যে-যার কোট আর হুড এনে স্টোভের ধারে দাঁড়িয়ে পরে নাও।'

ক্যারিকে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে বলে লরা গেল এন্ট্রিতে। কাঠের তক্তার ফাঁক গলে হু-হু বাতাস আর তুষার ঢুকে ঠাণ্ডা বরফ করে ফেলেছে এন্ট্রি-ঘরটাকে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে দুজনের কোট আর হুড নিয়ে দৌড়ে ফিরে এল লরা ক্লাসরুমে।

ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ক্যারি। ওকে ওর কোট, হুড আর দস্তানা পরিয়ে দিল লরা। মাফলারটা এমনভাবে জড়িয়ে দিল, যেন চোখদুটো ছাড়া গোটা মুখ ঢাকা পড়ে। বলল, 'কোনও চিন্তা নেই, ক্যারি, আমরা নিরাপদেই পৌঁছে যাব বাড়ি।'

'এবার এসো সবাই আমার পিছন পিছন,' টীচারের হাত ধরে এগোলেন মিস্টার ফস্টার। 'গায়ে গায়ে লেগে থাকবে সবাই।'

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেলেন তিনি। সবাই সার বেঁধে চলল তাঁর পিছনে। মেরি আর মিনি ধরেছে বিয়ার্ডস্লিদের দুই ছোট্ট মেয়ের হাত। ওদের ঠিক পিছনেই বেন ও আর্থার। তাদের পিছনে হাঁটছে লরা আর ক্যারি। ক্যারির দস্তানা পরা একটা হাত শক্ত করে ধরে আছে লরা। স্কুলঘরের দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে সবার শেষে আসছে ক্যাপ।

বাতাসের প্রচণ্ড ধাক্কায় টলে উঠল ওরা। কয়েক পা এগিয়েই দেখল স্কুলঘরটা হারিয়ে গেছে। চারপাশে শুধু সাদা তুষারের ঘূর্ণি, ছায়া মত দেখা যাচ্ছে সামনেরজনকে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, বরফের কুচি লেগে জ্বালা করছে চোখের পাতা।

এভাবে অন্ধের মত চলতে গিয়ে যদি সামান্য দিক ভুল হয়, তা হলে শহরকে পাশ কাটিয়ে প্রেয়ারিতে গিয়ে পড়বে ওরা–চিরকাল হাঁটলেও পৌঁছতে পারবে না কোথাও। বাতাসে হোঁচট খেতে খেতে যতই সামনে এগোচ্ছে ততই বাড়ছে লরার দুশ্চিন্তা: ওরা কি ভুল পথে চলেছে? বাড়িঘরগুলো কোথায়, কোন্ দিকে?

হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে, বাতাসের তোড়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে স্কার্ট। এভাবে খোলা জায়গায় আর বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না, বুঝতে পারল লরা।

মিস্টার ফস্টার কি দিগভ্রান্ত হয়ে গেলেন? ক্যাপ গারল্যান্ড অন্যদিকে চলল কেন?

লরার মনে হলো, ক্যাপ যেদিকে যাচ্ছে সেটাই সঠিক পথ; কিন্তু টীচারের নির্দেশ অমান্য করে ওর পিছনে গেল না ও, সামনের ছায়ামূর্তিকেই অনুসরণ করে চলল।

আরও কিছুক্ষণ চলার পর নিশ্চিত হলো লরা, পথ হারিয়েছে ওরা। এতক্ষণে শহরে পৌঁছে যাওয়ার কথা। ভুল পথে নিয়ে চলেছেন ওদেরকে মিস্টার ফস্টার। ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেল লরার, থমকে দাঁড়াল, কয়েক সেকেন্ড দিশে পেল না কী করবে। সামনের ছায়াটা মিলিয়ে যাচ্ছে দেখে দ্রুত পা বাড়াল সামনে।

দড়াম করে কাঁধে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লরা। পতন ঠেকাবার জন্য হাত বাড়াতেই শক্ত কিছু ঠেকল হাতে। হাত বুলিয়ে দেখে বুঝল কোনও বাড়ির দুই দেয়ালের কোণে ধাক্কা খেয়েছে ও। চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যে, এদিকে! এদিকে আসুন! একটা বাড়ি!'

বাতাসের সাঁই-সাঁই শব্দে লরার গলা শুনতে পেল না কেউ। তুষার জমে শক্ত হয়ে যাওয়া মাফলারটা মুখের সামনে থেকে সরিয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচাল আবার। একটু পর দেখতে পেল একটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে, তার পিছনে আরও কয়েকটা ছায়া।

কেউ কোন কথা বলল না। ক্যাপ ছাড়া সবাই ওরা আছে একসঙ্গে। দেয়াল ধরে ধরে সামনে এগিয়ে দেখা গেল ওটা মীডের হোটেল, অর্থাৎ এই রাস্তার সবশেষের বাড়িটা। কপাল গুণে ধাক্কা খেয়েছে এখানে লরা, সম্ভবত একটু পিছিয়ে পড়েছিল বলেই। তা নইলে চলতেই থাকত ওরা উত্তরের প্রেয়ারির দিকে।

একটা বাড়ি চিনতে পারা মানে গোটা শহরটাই চিনতে পারা। এর পর আর কোনও অসুবিধে হলো না, একে একে সবাই ঢুকে পড়ল যে-যার বাড়িতে। শুধু বেন উডওয়ার্থ আশ্রয় নিল হোটেলে, কারণ এই ঝড়ে ডিপোর দিকে রওনা হলে আবারও পথ হারাতে পারে ও।

অসাড় হয়ে যাওয়া হাতে দরজার নব ঘুরাতে চেষ্টা করছে লরা, এমনি সময় দরজা খুলে ওদেরকে ভিতরে টেনে নিল বাবা।

ওভারকোট, টুপি আর মাফলার পরে একগাছি কুণ্ডলী পাকানো দড়ি আর বাতি নিয়ে এইমাত্র বোরোতে যাচ্ছিল বাবা ওদের খোঁজে।

ঘরে ঢুকে লম্বা করে বুক ভরে দম নিল লরা আর ক্যারি। এখানে বাতাসের এলোপাতাড়ি ধাক্কা আর সোঁ-সোঁ গর্জন নেই, তুষারের অত্যাচার নেই—নীরব, নিস্তব্ধ যেন সব।

লরা টের পেল, ওর জমে যাওয়া মাফলার থেকে বরফ ভাঙছে মা। বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'ক্যারি ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' বলল বাবা।

লরার হুড আর কোট খুলে দিল মা। বলল, 'যাক, কপাল ভাল, তুষার-ক্ষত হয়নি। যাও, আগুনের ধারে চলে যাও।'

রকিং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মেরি, 'এই যে, এখানে বসো। এখানটা সবচেয়ে গরম।'

মেরির চেয়ারে বসেও গা গরম হচ্ছে না লরার, স্টোভের ধারে বাবার কোলে বসে থর-থর করে কাঁপছে শাল দিয়ে জড়ানো ক্যারি। ছুটে গিয়ে দুই কাপ গরম চা করে আনল মা, আদার সুবাসে জিভে জল এসে গেল সবার। লরার হাঁটুতে চড়ে বসে লোভী দৃষ্টিতে কাপের দিকে চাইছে গ্রেস, কাপটা ওর ঠোঁটের কাছে ধরতেই খুশি হয়ে চুমুক দিল।

'আমরা সবাই এক কাপ করে পেলে ভালই হোত, কী বলো?' বলল বাবা মৃদু হেসে।

তাই শুনে আবার ছুটল মা রান্নাঘরে। সবাই মিলে তৃপ্তির সঙ্গে আদা দেয়া চায়ে চুমুক দিচ্ছে। লরার মনে হলো স্বর্গটা খুব সম্ভব এই রকমই সুখের। ঘুমে জড়িয়ে আসছে ওর দুচোখ। তাই দেখে মা বলল, 'এবার শুয়ে পড়ো গিয়ে তোমরা দুজন। লম্বা একটা ঘুম দরকার তোমাদের।'

## চার

একটানা তিনদিন বইল তুমুল তুষার-ঝড়।

তারপর আকাশ পরিষ্কার। ঝলমলে সূর্য কিরণে তুষার ছাওয়া মাঠঘাটের দিকে চাওয়া যায় না। কিন্তু বাবা খুশি, আশা করছে, এবার কিছুদিন আবহাওয়া ভাল যাবে।

শহরের সবার চিন্তা–রেল লাইনের ওপর, বিশেষ করে সুড়ঙ্গগুলোর ভিতর জমে যাওয়া বরফ সরিয়ে কত দিনে আসতে পারবে ট্রেন। ট্রেন আসতে না পারলে মহা বিপদ হয়ে যাবে। খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছে স্টোরগুলোর জিনিস-পত্র।

বাবা খবর আনল, ট্রেসির কাছে আটকা পড়েছে ট্রেন, তবে শীঘ্রিই তুষার সরিয়ে সুড়ঙ্গ পরিষ্কার করে ফেলবে রেলওয়ের লোকেরা। বড়জোর দুদিন লাগবে ওদের ট্রেন চালু করতে।

পরদিন সকালে ফুলারের দোকান থেকে তাড়াহুড়ো করে ফিরে এল বাবা। শহরের কয়েকজন নাকি ডিপো থেকে একটা হ্যান্ডকার নিয়ে ভোল্‌গা পর্যন্ত লাইন পরিষ্কার করতে করতে যাবে, তারপর ওখান থেকে ফিরে আসবে ট্রেনে চড়ে। বাবা যদি যায়, মিস্টার ফস্টার বলেছেন, বাবার গরু-ঘোড়ার দেখ্‌ভাল্‌ উনি করবেন।

'বহুদিন একজায়গায় বসে থেকে একদম হাঁপিয়ে উঠেছি, ক্যারোলিন। একটু বাতাস খেয়ে আসতে খুব ইচ্ছে করছে।'

'তা যাও না,' এক কথায় রাজি হয়ে গেল মা। 'কিন্তু মাত্র একদিনে এত পথ তোমরা পরিষ্কার করবে কী করে?'

'এত পথ কোথায়–মাত্র পঞ্চাশ মাইল। তা ছাড়া এদিকের সুড়ঙ্গগুলো সব ছোট ছোট। ভোল্‌গার পুবের অবস্থা শুনছি খুবই খারাপ। জোর কাজ চলছে ওখানে। আমরা এদিকটা পরিষ্কার করে ফেললে পরশু ফিরে আসতে পারব ট্রেনে

চড়ে।'

গরম পোশাক পরে বেরিয়ে গেল বাবা তার বেলচাটা কাঁধে ফেলে। স্কুলে যাবার পথে লরা আর ক্যারি দাঁড়াল রাস্তার ওপর ওদের রওনা হওয়া দেখবে বলে।

সবাই উঠে পড়েছে আগেই। বাবা উঠে একটা হ্যান্ডবার ধরল। একদিকে দাঁড়িয়েছেন মিস্টার ফুলার, মিস্টার মীড আর মিস্টার হিন্‌য্‌, তাঁদের মুখোমুখি দাঁড়ানো বাবা, মিস্টার উইলমার্থ আর রয়াল ওয়াইল্ডার। প্রথম দল তাদের হ্যান্ডবারের ওপর ঝুঁকে চাপ দিল। মাথাগুলো নিচু হয়ে হ্যান্ডবার সহ আবার যখন সোজা হলো, দ্বিতীয় দল তখন ঝুঁকে পড়ল তাদের হ্যান্ডবারের ওপর। চলতে শুরু করল হ্যান্ডকার, প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর জোরে।

বেশ কিছুদূর গিয়ে তুষারে আটকে গেল হ্যান্ডকার, বেলচা নিয়ে লাফিয়ে নামল সবাই, রাস্তা পরিষ্কার হতেই রওনা হলো আবার। গান গাইতে গাইতে চলেছে ওরা। ছোট হতে হতে কালো একটা বিন্দুতে পরিণত হলো হ্যান্ডকার, সমবেত কণ্ঠের গান আর শোনা যাচ্ছে না। দীর্ঘ একটা শ্বাস ছেড়ে চলল দু'বোন স্কুলের পথে।

বাবা না থাকলে বাড়িটা একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়। সকাল-বিকেল মিস্টার ফস্টার এসে গরু-ঘোড়ার দেখাশোনা করে যান, দুধ দুইয়ে দিয়ে যান। তিনি চলে গেলেই লরাকে পাঠায় মা সব ঠিক-ঠাক মত করা হয়েছে কিনা দেখে আসার জন্য।

বৃহস্পতিবার রাতে মা বলল, 'দেখো, কাল ঠিক এসে যাবে ও।'

সত্যি, পরদিন দুপুরে তীক্ষ্ণ, টানা, লম্বা সিটি শোনা গেল। তুষার ছাওয়া প্রেয়ারির মধ্য দিয়ে আসছে ট্রেন। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে ধোঁয়া দেখা গেল।

'এসো, লরা,' ডাকল মা। 'ডিনার তৈরি করে ফেলি।'

বিস্কিটগুলো প্লেটে তুলছে লরা, এমনি সময়ে দরজা ঠেলে হুড়মুড় করে ঢুকল বাবা। 'দেখো, ক্যারোলিন, কাকে সঙ্গে করে এনেছি!'

বাবার দিকে দৌড় দিয়েছিল গ্রেস, থমকে দাঁড়াল, বড় বড় চোখ করে পিছিয়ে এল—হাতের আঙ্গুলগুলো মুখে।

'আরে! মিস্টার এডওয়ার্ডস!' অবাক কণ্ঠে বলল মা।

'তোমাকে বলেছিলাম না, আবার দেখা হবে। এই দেখো, ঠিকই ধরে এনেছি!'

আলুর বাটিটা টেবিলে রাখতে রাখতে মা বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার সুযোগ খুঁজছিলাম আমরা। ক্লেইম ফাইল করার সময় মিস্টার ইঙ্গলসকে আপনি সাহায্য না করলে নির্ঘাৎ আমরা হোমস্টেডটা হারাতাম।'

'ও কিছু না,' লজ্জিত হাসি হেসে বললেন মিস্টার এডওয়ার্ডস।

লরা দেখল, তেমনি লম্বা, পাতলা, হাসি-হাসি চেহারা—ঠিক আগের মতই রয়েছে টেনেসির বুনো-বেড়ালের হাবভাব। খুশি হয়ে বলল, 'কেমন আছেন, মিস্টার এডওয়ার্ডস!'

'সান্তা ক্লজের কাছ থেকে আমাদের উপহার এনে দিয়েছিলেন আপনি!' বলল

মেরি।

'বৃষ্টির মধ্যে আশি মাইল হেঁটেছিলেন, তারপর সাঁতার কেটে ক্রীক পেরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন আপনি সেই উপহার!' বলল লরা।

মেঝেতে জুতো ঘষে মাথা ঝোঁকালেন মিস্টার এডওয়ার্ডস। 'মিসেস ইঙ্গলস, আর মেয়েরা, আবার দেখা হয়ে যাওয়ায় সত্যিই খুব ভাল লাগছে আমার।'

মেরির অবস্থা টের পেয়ে গেছেন, নরম গলায় বললেন, 'ইঙ্গলস, এই সুন্দর দুই ভদ্রমহিলাই কি ইন্ডিয়ান টেরিটোরির সেই ছোট্ট দুই মিষ্টি মেয়ে, আমার ঘাড়ে-পিঠে চড়ত যারা?'

হেসে উঠল সবাই।

মা বলল, 'সময় কী তাড়াতাড়ি যায়! ক্যারি তখন সবার ছোট, কোলে।' হাসল, 'এখন গ্রেস হচ্ছে সবার ছোট।' গ্রেসকে সামনে ঠেলল মা, কিন্তু নড়ল না ও, মার স্কার্ট খামচে ধরে ঝুলে থাকল। বড় বড় চোখ দিয়ে যেন গিলছে আগন্তুককে।

'বসে পড়ুন, মিস্টার এডওয়ার্ডস,' বলল মা, 'এক মিনিটে ডিনার এসে যাবে টেবিলে।'

ওঁকে ইতস্তত করতে দেখে বাবা বলল, 'লজ্জা কোরো না, এডওয়ার্ডস, বসে পড়ো। এখন যা আছে তাই খাবে। সাপারে তোমার পছন্দের কিছু আইটেম তৈরি করবে ক্যারোলিন।'

শক্তপোক্ত বাড়িটার প্রশংসা করলেন মিস্টার এডওয়ার্ডস, তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে প্রশংসা করলেন মার রান্নার, কিন্তু যেই ট্রেনের হুইসেল বাজল অমনি উঠে দাঁড়ালেন। অনেক দূর পশ্চিমে চলে যাচ্ছেন তিনি এদিকের হোমস্টেড বিক্রি করে দিয়ে।

বাবা অনুরোধ করল কয়েকটা দিন এখানে বেড়িয়ে যেতে, কিন্তু রাজি হলেন না তিনি। এখুনি ট্রেন ছেড়ে দেবে বলে সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদায় নিলেন।

এতক্ষণ জবান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল গ্রেসের, মিস্টার এডওয়ার্ডস বেরিয়ে যেতেই লম্বা করে দম নিয়ে মেরিকে জিজ্ঞেস করল, 'এই লোকটার সঙ্গে সত্যিই দেখা হয়েছিল সান্তা ক্লজের?'

'হ্যাঁ,' বলল মেরি। 'আমরা তখন ছোট ছিলাম। ক্রিসমাসের সময় চল্লিশ মাইল হেঁটে গিয়ে আমার আর লরার জন্যে উপহার নিয়ে এসেছিলেন উনি সান্তা ক্লজের কাছ থেকে।'

'সত্যিই,' বলল মা, 'সত্যিকার একজন হৃদয়বান মানুষ।'

সবাই টেবিল ছেড়ে উঠে পড়তেই কী যেন মাটিতে পড়ল মেরির কোল থেকে। ঝুঁকে পড়ে তুলল মা ওটা, বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জিনিসটার দিকে। চেঁচিয়ে উঠল লরা, 'আরে! মেরি! বিশ ডলার! বিশ ডলারের একটা নোট পড়েছে তোমার কোল থেকে!'

'কী করে...অসম্ভব!' বলল মেরি।

থমকে দাঁড়িয়ে দেখল ওটা বাবা, তারপর বলল, 'এ নিশ্চয়ই এডওয়ার্ডসের কাজ।'

'এ টাকা তো আমরা রাখতে পারি না,' বলল মা। 'নিশ্চয়ই ভুল করে…' কথা শেষ হওয়ার আগেই লম্বা হুইসেল দিয়ে রওনা হয়ে গেল ট্রেনটা।

'কিছু করার আছে?' বলল বাবা। 'চলে গেল এডওয়ার্ডস। বলছিল অরিগনে যাবে। আবার কত বছর পর দেখা হবে কেউ বলতে পারে?'

'কিন্তু, চার্লস, এ-কাজটা করল কেন ও?'

'ওটা ও আমাদেরকে না, দিয়েছে মেরিকে। রেখে দাও, ওর কলেজে ভর্তি হতে কাজে লাগবে।'

'ঠিক আছে,' বলে নোটটা মেরির হাতে দিল মা।

হাতে নিয়ে মেরি বলল, 'ধন্যবাদ জানানো গেল না।'

বিড় বিড় করে মা বলল, 'প্রার্থনা করি, এ-টাকার জন্যে যেন ছেলেটা কোথাও কোনদিন ঠেকে না যায়!'

# পাঁচ

পরদিনই দুপুর থেকে শুরু হয়ে গেল আবার।

বাবা হোমস্টেডে গেছে ডেভিড আর স্যামকে নিয়ে খড় আনতে। গা গরম রাখবার জন্য প্রচুর খড় লাগে গরু-ঘোড়াদের। আঁধার হয়ে আসায় সবাই দুশ্চিন্তা শুরু করতে না করতেই একগাড়ি খড় নিয়ে পৌঁছে গেল বাবা। পরমুহূর্তে এসে গেল তুষার ঝড়, বাড়িটাকে জোর এক ঝাঁকুনি দিয়ে জানান দিল তার আগমন-বার্তা।

'আবার বোধহয় বন্ধ হয়ে গেল ট্রেন!' ককিয়ে উঠল মা। 'এ-ঝড় আবার ক'দিন থাকে কে জানে!'

পরদিন সকালে টের পেল লরা, নীচের ঘরটা গরম করতে পারছে না স্টোভ। হিটারের ফুটরেস্টে পা রেখে বসলেও শিউরে শিউরে উঠছে গা। ফুলারের দোকানে গিয়ে সবার খোঁজ খবর নিয়ে ফিরল বাবা। শহরের কারও কোনও বিপদ-আপদ হয়নি, কিন্তু শীতের প্রকোপ কাবু করে ফেলেছে সবাইকে। হিমাঙ্কের চল্লিশ ডিগ্রী নীচে নেমে গেছে তাপ মাত্রা।

দুদিন পর থামল ঝড়। ঝলমলে রোদ দেখে মা খুশি হয়ে বাবাকে বলল, 'তোমার সেই ইন্ডিয়ানের ভয়ঙ্কর তুষার-ঝড় বোধহয় গেল এবার।'

মাথা নাড়ল বাবা, 'বলা যায় না, ক্যারোলিন, বলা যায় না।'

স্কুলে যাওয়ার পথে দেখল লরা, গোটা রাস্তায় উঁচু হয়ে জমে আছে বরফ। মানুষজন বেরিয়ে পড়েছে বাইরে। স্কুলের ছেলেরা উঁচু উঁচু ঢিবিতে চড়ে সড়-সড় করে পিছলে নেমে যাচ্ছে নীচে। চারদিকে যেন উৎসবের ভাব। স্কুলে সবাই সবাইকে দেখে খুশি।

দুপুরে বাসায় খেতে এসে দেখল লরা ওদের জন্য মাখন নিয়ে এসেছেন মিস্টার বোস্ট। বাবা তাঁকে ডেকে বসাল ডিনার টেবিলে। খেতে খেতে বললেন

মিস্টার বোস্ট পর পর দুটো তুষার ঝড়ের মধ্যে হোমস্টেডে কেমন কাটল ওঁদের। বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন ট্রেনের খবর।

'বাড়তি লোক লাগিয়েছে রেলওয়ে ট্রেসি সুড়ঙ্গের ওদিকে। ডিপোর উডওয়ার্থ বলছে স্নোপ্লাউ আনিয়ে জোরে-শোরে কাজ করছে ওরা ওখানে। মনে হয় ছয়-সাত দিনের মধ্যে এসে পড়বে ট্রেন।' একটু থেমে বলল, 'না এলে মুশকিল হয়ে যাবে। শহরে লবণ দেয়া মাংস শেষ।'

'চা, চিনি আর ময়দা নিয়ে যেতে বলেছে এলি,' বললেন মিস্টার বোস্ট। 'এরা আবার দাম বাড়িয়ে দেয়নি তো?'

'না। দাম বাড়ানোর কথা শুনিনি কোথাও,' বলল বাবা।

ডিনারের পরপরই উঠে পড়লেন মিস্টার বোস্ট, বললেন সন্ধের আগে বাড়ি পৌঁছতে হলে এখনই রওনা হওয়া দরকার। ক্লাসে ফিরে গেল লরা আর ক্যারি। মহানন্দে কাটল সারাটা দিন। উজ্জ্বল একটা দিন পেয়ে সবার মন থেকে কেটে গেছে তুষার-ঝড়ের দুঃস্বপ্ন।

কিন্তু গভীর রাতে আবার শুরু হলো তুমুল ঝড়। সেই সঙ্গে তুষার।

সকালে মনটা খারাপ হয়ে গেল লরার। হিটার জ্বালা হয়নি আজ, খাবার টেবিলটা নিয়ে আসা হয়েছে রান্নাঘরে। ব্যাপার কী জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল মাকে, বাবার পায়ের আওয়াজ পেল, পিছনের বারান্দায় পা ঠুকে বরফ ঝাড়ছে।

দরজা খুলে দিল লরা। মন মরা ভাব লক্ষ করল বাবার মধ্যে। দুধের বালতিতে সামান্য দুধ জমে শক্ত হয়ে আছে।

'আজ ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়েছে, ক্যারোলিন,' বলল বাবা স্টোভে হাতদুটো সেঁকতে সেঁকতে। 'হিটারটা আর জ্বাললাম না। কয়লা কমে এসেছে আমাদের। আর যে ঝড় উঠেছে, ট্রেন আসতে মনে হয় বেশ দেরি হবে।'

'বুঝতে পেরেছি,' বলল মা। 'হিটার জ্বালোনি দেখে টেবিলটা এখানে এনে রাখলাম। মাঝের দরজাটা বন্ধ রাখলে স্টোভের আঁচেই অনেকটা গরম থাকবে রান্নাঘর।'

'ঠিক করেছ,' বলল বাবা। 'নাস্তাটা সেরেই হালচাল বোঝার জন্যে একটু ফুলারের দোকানে যাব। অবস্থা ভাল ঠেকছে না আমার কাছে।'

দ্রুত নাস্তা খেয়ে নিয়ে গায়ে কোট চাপিয়ে তৈরি হলো বাবা বাইরে যাবে বলে। এরই মধ্যে মা ঘুরে এল ওপর থেকে, বাবার দিকে বাড়িয়ে ধরল একটা লাল পকেটবই। লরার বুকটা ধ্বক করে উঠল। ও জানে, এর মধ্যে মেরির লেখাপড়ার জন্য জমানো টাকা রাখে মা।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাত বাড়িয়ে নিল ওটা বাবা, তারপর গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'মেরি, খুব সম্ভব স্টক শেষ হয়ে এসেছে দোকানগুলোর। যদি জিনিসপত্রের দাম অতিরিক্ত বাড়িয়ে দেয় ওরা...'

চট করে বুঝে ফেলল মেরি সমস্যাটা। বলল, 'আমার কলেজে ভর্তির টাকা আছে মার কাছে। ওটা তুমি খরচ করতে পারো, বাবা।'

'যদি খরচ করতেই হয়, তুমি নিশ্চিন্তে থেকো, মেরি, সময়মত সব টাকা

আমি ফিরিয়ে দেব,' বলে বেরিয়ে গেল বাবা।

মেরির রকিং চেয়ারটা সামনের ঘর থেকে এনে ঠিক চুলোর সামনে রাখল লরা মেরি ওটায় বসতেই ওর কোলে উঠে বসল গ্রেস।

'নামো, গ্রেস,' মা বলল। 'তুমি এখন তিন বছরের মস্ত বড় মেয়ে। মেরির কষ্ট হবে।'

'থাক না, মা,' চট করে বলল মেরি। 'ওকে কোলে রাখতে ভালই লাগে আমার।'

মা গেল দোতলায় ঠাণ্ডার মধ্যে বিছানা ঠিকঠাক করতে, লরা ডিশগুলো ধুয়ে মুছে রাখল, স্টোভটা পালিশ করে বাতির কাঁচ পরিষ্কার করল, তারপর তেল ভরল বাতিতে।

'কেরোসিন শেষ। বাবাকে কেরোসিন আনতে বলা উচিত ছিল।'

'অ্যাঁ?' ভড়কে গেল ক্যারি। 'কেরোসিন ছাড়া চলবে কী করে!'

'জানি না। আমাদের শেষ, কিন্তু স্টোরে থাকতেও পারে,' বলল লরা। 'এবার তুমি ঝাড়ু দাও, আমি ঘর মুছি।'

ওপর থেকে কাঁপতে কাঁপতে নেমে এল মা, চুলোর ধারে গা গরম করতে করতে চারদিকে চেয়ে বলল, 'বাহ্, একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ফেলেছ দেখছি, লরা-ক্যারি!'

অল্পক্ষণ পরেই ফিরে এল বাবা। ওভারকোট আর টুপিতে তুষার লেগে আছে। আগুনের ধারে গরম হয়ে নিয়ে তারপর কথা বলতে পারল। 'তোমার টাকাগুলো খরচ করা গেল না, মেরি,' বলল বাবা। 'কয়লা শেষ। এখন কাঠ বিক্রি হচ্ছে অসম্ভব চড়া দামে। ও কেনা আমাদের সাধ্যের বাইরে।'

'অতিরিক্ত দাম দিয়ে কেনার কোন মানে হয় না,' বলল মা। 'কয়েক দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই এসে পড়বে ট্রেন।'

'একফোঁটা কেরোসিন নেই আর শহরে,' বলল বাবা। 'মাংস শেষ। স্টোরগুলো খালি হয়ে গেছে—কিচ্ছু নেই কোথাও। দুই পাউন্ড চা পেলাম, ক্যারোলিন, এগুলোও শেষ হয়ে যাওয়ার আগে চট্ করে কিনে নিলাম।'

'ভাল করেছ,' বলল মা। 'শীত কাটাতে চায়ের জুড়ি নেই।'

লরা, মেরি আর ক্যারিকে পড়তে বসতে দেখে বাবার মনে পড়ল, 'ওহ্-হো! কয়লা না আসা পর্যন্ত স্কুল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।'

'আমরা নিজেরাই পড়ে নেব,' বলল লরা।

ঠাণ্ডা বাড়ছে। দরজার নীচে ছালা গুঁজেও লাভ হচ্ছে না। দুপুরে গরু-বাছুর আর ঘোড়াগুলোর অবস্থা দেখতে গেল বাবা। ফিরে এসে বলল, 'আবহাওয়া আরও খারাপ হতে যাচ্ছে।'

কেরোসিন বাঁচাবার জন্য সাপারের পরপরই আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল সবাই, থালা-বাসন ধোয়া হবে কাল সকালে। সারাটা রাত চলল ঝড়ের তাণ্ডব, বাড়িটাকে হঠাৎ হঠাৎ এত জোরে ঝাঁকি দেয় যে চমকে জেগে যেতে হয়। মনে হয় তীব্র বিদ্বেষে ফুঁসছে যেন কেউ বাইরে।

পরদিনও কাটল একই ভাবে, বিরামহীন, একটানা ঝড় আর তুষারপাত।

তার পরের দিন সন্ধ্যায় থামল ঝড়। বাবা বলল, 'কাল সকালে খড় আনতে যাব। এখন থেকে সুযোগ পেলেই খড় নিয়ে আসতে হবে হোমস্টেড থেকে।' কোট আর টুপি পরে বলল, 'যাই, সাপারের আগে চট্ করে দেখে আসি আমরা ছাড়া এই মরা শহরে আর কেউ বেঁচে আছে কি না।'

কয়েক মিনিটেই ফিরে এল বাবা। বলল, 'সবকিছু ঠিক-ঠাকই আছে। ডিপোর খবর হচ্ছে: কাল সকাল থেকে ট্রেসির এদিকটায় খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হবে আবার।'

মা জানতে চাইল, 'কবে নাগাদ ট্রেন আসতে পারবে কেউ বলল কিছু?'

'নাহ্!' মাথা নাড়ল বাবা এপাশ-ওপাশ। 'গতবার ঝড় থামার পর ওরা প্রায় পরিষ্কার করে ফেলেছিল সুড়ঙ্গটা, কিন্তু এখন নাকি আগের চেয়েও খারাপ অবস্থা। তিরিশ ফুট জমাট বরফের নীচে চাপা পড়েছে রেল লাইন।'

'আবহাওয়া ভাল থাকলে এই বরফ সরাতে খুব বেশি সময় লাগার কথা না,' বলল মা। 'আমার তো মনে হয় এইবার ক্ষান্ত দেবে। গতবছর গোটা শীতে যা হয়েছে, তার কয়েকগুণ বেশি ঝড়-তুফান আর তুষার হয়ে গেছে এ-বছর এরই মধ্যে। এবার থামা উচিত।'

## ছয়

পরদিন হোমস্টেড থেকে শুকনো খড় আনতে গেল বাবা। রাস্তাঘাট নেই, সম্পূর্ণ আন্দাজের ওপর চলতে হচ্ছে বলে বেশ কয়েকবার খানা-খন্দে পড়তে হলো, আর এর ফলে ভয় পেয়ে এতই লাফঝাঁপ দিল স্যাম যে ওকে নিয়ে আর খড় আনতে যাবে না বলে স্থির করল বাবা। ডেভিড অবশ্য বারবারই ধীর-স্থির ভঙ্গিতে বাবার দেখানো পথ ধরে উঠে এসেছে ওপরে, খুশিমনেই টেনেছে গাড়ি।

একা ডেভিড বেশি খড় টানতে পারবে না, কিন্তু উপায় নেই, বিকেলে ওকে নিয়েই আবার গেল বাবা খড় আনতে। সন্ধের আগে আরও দুই গাড়ি খড় আনতে পারল বাবা। সাপার খেয়ে ফুলারের হার্ডওয়্যার স্টোরে গিয়ে খবর নিয়ে এল, স্নোপ্লাউ দিয়ে ট্রেসি সুড়ঙ্গের প্রায় অর্ধেক বরফ পরিষ্কার করে ফেলেছে রেলের লোকেরা। এই হারে কাজ এগোলে আগামী পরশুই এসে পড়বে ট্রেন।

'ভাল খবর।' মা খুশি হলো। 'এবার এসে যাবে মাংস।'

'আরও খবর আছে,' বলল বাবা। 'ট্রেন আসুক বা না আসুক, ডাক আসা-যাওয়া করবে এখন থেকে। স্লেডে করে পাঠানো হচ্ছে গিলবার্টকে, কাল সকালে রওনা হয়ে যাবে প্রেস্টনের পথে। কাউকে চিঠি দিতে হলে এই সুযোগ।'

উইসকনসিনের আত্মীয়-স্বজনের কাছে অনেকদিন ধরে একটু একটু করে চিঠি লিখছে মা, এবার সবাই মিলে বসে লিখে শেষ করে ফেলল। সকালে সেটা দিয়ে এল বাবা পোস্ট অফিসে। মেইল ব্যাগ নিয়ে রওনা হয়ে গেল গিলবার্ট, পুব থেকে পাঠানো ডাক নিয়ে ফিরবে প্রেস্টন থেকে।

পরদিন ডেভিডকে নিয়ে বাবা গেল খড় আনতে। সকালে একগাড়ি খড় আনা গেল, কিন্তু দুপুরে ওরা যখন ডিনার খেতে বসল, ঠিক তখনই আবার আঁধার করে এল চারদিক, সোঁ-সোঁ ডাক ছেড়ে এসে পড়ল ঝড়। শুরু হলো বাতাসের করুণ বিলাপ আর আহাজারি।

মনটা কালো হয়ে গেছে লরার। হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করেও কোন ফল হচ্ছে না। কারণ, ও জানে রেল লাইনের ওপর আবার জমে যাচ্ছে তুষার, ট্রেন আসতে পারবে না। কয়লা ফুরিয়ে এসেছে ওদের, শহরেও আর এক টুকরো কয়লা নেই। ল্যাম্পের কেরোসিন শেষ হয়ে এসেছে। ট্রেন না এলে মাংসও পাওয়া যাবে না। মাখন নেই, সামান্য কিছুটা চর্বি আছে রুটিতে মাখাবার জন্য। আলু আছে এখনও, কিন্তু আর একটা পাউরুটি তৈরি করার মত ময়দাও নেই।

এসব ভাবনা কিছুতেই দূর করতে পারছে না ও মাথা থেকে। এখন ট্রেন আসা খুবই জরুরী, কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না লরা সত্যি কোনদিন আসবে ট্রেন।

রয়্যালের ফীডস্টোরের পিছনের ঘরে কাজে ব্যস্ত আলমানযো। পিছনের দেয়ালের এক ফুট সামনে আর একটা দেয়াল তৈরি করছে ও ফ্রেমের গায়ে পেরেক ঠুকে তক্তা বসিয়ে।

ও ভয় পাচ্ছে, ট্রেনের যা অবস্থা, শহরের মানুষ খেতে না পেয়ে ওর বীজ-শস্য চাইবে। অনেক কষ্টে নিজে ফলিয়েছে ও গমের এই উন্নতমানের বীজ, সেই মিনেসোটা থেকে বয়ে নিয়ে এসেছে এখানে–এখন কিছুতেই খোয়াতে চায় না ও এগুলো।

দেয়ালটা কোমর সমান উঁচু হতেই একটা বস্তার মুখ খুলল ও জ্যাকনাইফ দিয়ে, তারপর সাবধানে ঢেলে দিল দুই দেয়ালের মাঝখানে।

'তক্তা খসিয়ে ছিটকে বেরিয়ে না এলেই হয়,' বলল ও একখানা লাঠি চাঁছায় ব্যস্ত রয়ালকে। 'কী মনে হয়? ছাদ পর্যন্ত উঁচু করলে টিকবে এই তক্তা?'

'আমি কী জানি?' বলল রয়াল। 'তোমার গম, তুমিই বোঝো।'

'গম যে আমার তাতে কোনও সন্দেহ নেই,' বলল আলমানযো। 'আর এই গম যে আগামী বসন্তে আমার জমিতে বুনব, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই।'

'তোমার গম আমি বেচে দেব এইরকম সন্দেহ হচ্ছে কেন তোমার?'

'কারণ, তুমি তোমার গম প্রায় সবই বেচে দিয়ে বসে আছো,' জবাব দিল আলমানযো। 'শহরের সব গম প্রায় শেষ। বড়দিনের আগে মনে হয় আর ট্রেন আসতে পারছে না। সব লোক যখন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে তোমার দোকানের সামনে...'

'তার মানে এই নয় যে তোমার গম বেচে দেব আমি,' বলল রয়াল।

'তুমি যদি কৃষক হতে, তা হলে বেচতে না। কিন্তু তুমি একজন ব্যবসায়ী। লাভ দেখলে লোভ সামলানো তোমার জন্যে কঠিন। কেউ এসে গমের দাম জিজ্ঞেস করল, তুমি বলবে: গম নেই, শেষ হয়ে গেছে। ও তখন বলবে: তা হলে ওই বস্তায় কী? তুমি বলবে: ওই গম আমার না, আলমানযোর। এবার লোকটা

জানতে চাইবে: বেশ তো, কত হলে বেচবে তোমরা এই গম? এরপর আর তোমাকে সামলানো যাবে বলতে চাও? হাড়ে হাড়ে চিনি আমি তোমাকে, ব্যবসা ঢুকে গেছে তোমার রক্তে; ওই কথা শুনে তুমি একগাল হেসে বলবে: তুমি কত দেবে?'

'বেশ, সেটা হয়তো সম্ভব,' স্বীকার করল রয়াল। 'কিন্তু এর মধ্যে দোষটা কোথায় তা তো আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'আমি বলছি কোথায়,' খালি বস্তাটা একপাশে নামিয়ে রাখল আলমানযো। 'যতক্ষণ না ট্রেন আসছে ততক্ষণ আকাশ-ছোঁয়া দাম দিতে রাজি থাকবে শহরের লোকেরা। আমি হয়তো খড় আনতে গেছি হোমস্টেডে, তুমি ভেবে নেবে যে অত দাম পেলে আমি কিছুতেই অমত করতে পারব না, ভেবে নেবে আমার কীসে মঙ্গল হবে সেটা আমার চেয়ে তুমিই বেশি বোঝো। তোমার বোঝার ক্ষমতা নেই যে আমি যা বলি, জেনে-শুনে-বুঝেই বলি। তোমার ধারণা তুমি...'

'ব্যস, ব্যস, ব্যস! চেতে ওঠার কোনও দরকার নেই। তবে এটা তো ঠিক, তোমার চেয়ে বয়সে আমি বড়, বুঝিও বেশি?'

'হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। যাই হোক, আমি আমার মত করেই চলতে চাই। আমার গম আমি লোকের চোখের আড়ালে রাখতে চাই। কেউ জানবেও না, কোন প্রশ্নও উঠবে না।'

'ঠিক আছে, বাবা, ঠিক আছে,' বলল রয়াল, 'তোমার গমে কেউ হাত দেবে না।' একমনে পাইনের ডাল থেকে একটা শেকল বানাচ্ছে রয়াল, মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখছে আলমানযোর কাজ। একটার পর একটা বস্তার মুখ খুলে নকল দেয়ালের ওপাশে ঢালছে আলমানযো। মাঝে মাঝে প্রবল দাপটে বাড়িটাকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে তুষার-ঝড়। কাজ থামিয়ে চোখ পাকাচ্ছে রয়াল, বলছে, 'বাপরে! তুফান কাকে বলে!'

'রয়, সুন্দর করে একটা ছিপি বানিয়ে দাও তো—ঠিক এই গর্তের সমান। আস্তাবলে যাওয়ার আগেই হাতের কাজটা শেষ করতে চাই আমি।'

রয়াল উঠে এসে দেখল গর্তটা, হাতের ছুরি দিয়ে গর্তটা সুন্দর করে গোল করল, তারপর একটা কাঠের টুকরো নিয়ে ছিপি বানাবার কাজে লেগে গেল।

'সত্যিই যদি দাম অতটাই চড়ে যায়, বিক্রি না করে গমগুলো রেখে দিলে তুমি গাধামি করবে,' বলল রয়াল। 'বসন্তকালের অনেক আগেই চালু হয়ে যাবে ট্রেন। আক্রার সময় বেচে দিয়ে তখন আবার কিনে নিলে মাঝখান থেকে ভাল লাভ করে নিতে পারতে।'

'এই একই কথা এরইমধ্যে কয়েকবার বলে ফেলেছ,' জবাব দিল আলমানযো। 'আমি পরে পস্তানোর চেয়ে আগেই সাবধান হতে চাই। কবে ট্রেন চালু হবে কেউ জানে না। এপ্রিলের আগে বীজ-গম এসে পৌঁছবে কিনা তা-ও কেউ বলতে পারে না।'

'তা ঠিক,' স্বীকার করল রয়াল, 'মৃত্যু আর ট্যাক্স ছাড়া আর কিছুরই নিশ্চয়তা নেই।'

'ফসল বোনার সময়টা ঠিকই আসবে,' বলল আলমানযো। 'আর ভাল ফসল

পেতে হলে ভাল বীজ দরকার।'

'বাবা ঠিক এইভাবেই কথা বলে।' উঠে গিয়ে ছিপিটা গর্তে বসিয়ে মাপ নিল, তারপর আবার চাঁছতে চাঁছতে বলল, 'কিন্তু সত্যিই যদি আর দুটো সপ্তাহ ট্রেন না আসে, শহরের কী অবস্থা হবে ভেবে ভয়ই লাগছে। খাবার জিনিস কোনও দোকানে কিচ্ছু নেই।'

'মনে হয় সবাই যার যার মত কিছু না কিছু উপায় বের করে নেবে। প্রয়োজনে কম কম খেয়ে পার করে দেবে শীতটা।'

তিনদিন পর থামল ঝড়।

বাবা গেল খড় আনতে। কিন্তু এক গাড়ি খড় এনেই ডেভিডকে আস্তাবলে ঢোকাতে দেখে অবাক হলো লরা। পিছনের ঘেরা বারান্দা দিয়ে বাবা ঢুকতেই মা জিজ্ঞেস করল, 'কী হলো, চার্লস? ফিরে এলে যে?'

'প্রেস্টন থেকে ডাক নিয়ে ফিরেছে গিলবার্ট। দেখি গিয়ে আমাদের জন্যে কিছু আছে কিনা।'

এক বোঝা কাগজপত্র নিয়ে ফিরল বাবা। হুড়োহুড়ি লেগে গেল সবার মধ্যে।

মার জন্য এসেছে 'অ্যাডভান্সেস', লরা আর ক্যারির জন্য এসেছে 'ইউথস্ কম্প্যানিয়ন্স্', বাবার জন্য 'ইন্টার ওশন' আর 'পায়োনিয়ার প্রেস' আর মেরির জন্য চিঠি।

মোটাসোটা খামটা হাতে নিয়ে মেরির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল 'মা, পড়ো না চিঠিটা?'

চিঠি খুলে জোরে জোরে পড়ে শোনাল মা সবাইকে। রেভারেন্ড অ্যালডেনের চিঠি। গত বসন্তে এদিকে আসার সুযোগ হয়নি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন তিনি। অনেক উত্তরে চলে যেতে হয়েছিল কাজ নিয়ে। আশা করছেন, আগামী বসন্তে দেখা হবে আবার। মিনেসোটার ছেলেমেয়েরা মেয়েদের জন্য এক বান্ডিল পত্রিকা পাঠিয়েছে, আগামী বছর পাঠাবে আর এক বান্ডিল। তাঁদের গির্জা থেকে সবার জন্য কাপড় পাঠানো হয়েছে ব্যারেলে করে। তাঁর নিজের উপহার একটা ক্রিসমাস টার্কি তিনি ভরে দিয়েছেন ব্যারেলে রেভারেন্ড স্টুয়ার্ট আর তাঁকে সিলভার লেকে যে চমৎকার আন্তরিকতার সঙ্গে আদর যত্ন করা হয়েছিল সেজন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবার জন্য মেরি ক্রিসমাস আর হ্যাপি নিউ ইয়ার।

চিঠি শেষ হওয়ার পর সবাই চুপ করে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। মা বলল, 'ব্যারেল না আসুক, চিঠিটা তো পেলাম!'

'গিলবার্ট খবর এনেছে, জোরেশোরে কাজ চলছে ওদিকে। বলা যায় না, ক্রিসমাসের আগেই এসে পড়তে পারে ব্যারেল।'

'এসে পড়লেই ভাল,' বলল ক্যারি।

'এদিকে হোটেলগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। এতদিন কাঠ জ্বালাচ্ছিল ব্যাঙ্কার রুথ গোটা কাঠের গুদামটাই কিনে নিয়েছে।'

'নিক,' বলল মা। 'কাঠ কিনে জ্বালাবার সঙ্গতি আমাদের নেই। কিন্তু, চার্লস, কয়লা যে একদম শেষ, এখন কী করি?'

'কুছ পরোয়া নেই,' বলল বাবা। 'খড় জ্বালাব এরপর।'

'খড়?' অবাক হলো লরা। 'খড় কীভাবে জ্বালাব বাবা?'

'কিচ্ছু ভেবো না, কায়দা একটা কিছু বেরিয়েই যাবে। প্রয়োজনের তাগিদ বড় তাগিদ।'

দুপুরের আগে অন্তত আর এক বোঝা খড় এনে রাখার জন্য বেরিয়ে গেল বাবা। মার সঙ্গে কাপড় ধোলাইয়ে লেগে গেল লরা আর ক্যারি।

এ-বছর খুব সাদামাঠা ভাবে কাটল বড়দিন। ট্রেনটা এই আসে এই আসে করে আটকে গেছে আবার। আবার শুরু হয়েছে তুষার-ঝড় কয়লা যা আছে, সন্ধে পর্যন্ত চলবে, তারপর থেকে জ্বালাতে হবে খড়।

সন্ধের আগেই পরদিন সকালে ব্যবহারের জন্য একবোঝা খড় পেঁচিয়ে তৈরি করা লাকড়ি এনে রাখল বাবা চুলোর ধারে। কয়লার আঁচ কমে আসতেই সবাই ঢুকে পড়ল যে যার লেপের নীচে।

খুব দ্রুত পুড়ে যায় খড়। পিছনের ঘেরা বারান্দায় বসে সারাদিন খড় পেঁচিয়ে শক্ত আঁটি বাঁধে বাবা, আর সারাদিন একের পর এক সেগুলো চুলোয় ঢুকায় মা। কিন্তু এত করেও শীত ঠেকানো মুশকিল হয়ে পড়ল। ঝড়-তুফান যত বাড়ছে, ততই বাড়ছে শীতের কামড়। খানিক পর পর চুলোর ধারে এসে হাত সেঁকতে হচ্ছে বাবাকে।

'আমাকে শিখিয়ে দাও, বাবা, আমিও আঁটি বাঁধি,' বলল লরা বাবার কষ্ট দেখে।

প্রথমে রাজি হলো না বাবা, বলল, 'তোমার হাত ছোট, এটা ব্যাটাছেলের কাজ।' খানিক পর বলল, 'অবশ্য কাউকে না কাউকে তো সাহায্য করতেই হবে, এটা একা একজনের কাজ না। যখন খড় আনতে যাব, চুলোটা চালু রাখতে হলে তখন তো কাউকে আঁটি বাঁধতেই হবে।' শেষে খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'ঠিক আছে, এসো, আধ-বোতল, শিখিয়ে দিচ্ছি।'

বাবার পুরনো একটা কোট গায়ে দিয়ে, নিজের হুড আর মাফলার পরে ঘেরা বারান্দায় গিয়ে বসল লরা বাবার পাশে। বাবার কাছ থেকে শিখে নিয়ে শুরু করল কাজ। কিন্তু ছয়টা আঁটি বানাতেই শীতে অসাড় হয়ে এল ওর হাতের আঙ্গুলগুলো।

'হয়েছে,' বলল বাবা, 'এখনকার মত যথেষ্ট হয়েছে। চলো, এগুলো চুলোর পাশে রেখে হাত গরম করে নিই।'

হাত-পা সেঁকে নিয়ে আবার আঁটি বাঁধতে গেল লরা বাবার সঙ্গে ঘেরা বারান্দায়। মা চুলোয় খড় যোগাচ্ছে। ক্যারি সামলে রাখছে গ্রেসকে সেই সঙ্গে মাকে সাহায্য করছে ধোয়া-মোছার কাজে। দুপুরে সেঁকা আলু আর শালগমের ভর্তা দিয়ে ডিনার সারল ওরা। রাতে কুচি-কুচি করে আলু কেটে আভেনে গরম করে খেয়ে নিল—সামান্য চর্বিও নেই যে ওগুলো ভেজে নেবে। সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে চা থাকায় তেমন একটা খারাপ লাগল না কারও।

এই একই রুটিনে চলল পরপর দুই দিন। দ্বিতীয় দিন সাপারের পর মা ঘোষণা দিল: আটা শেষ। বাবা বলল, আগামীকাল চেষ্টা করে দেখবে সংগ্রহ করা যায় কিনা।

কেরোসিন নেই বলে বাতি জ্বলল না ঘরে। শুতে যাওয়ার আগে মা বলল, 'কিছুটা গ্রীজ পেলেও কোনও রকমে একটু আলোর ব্যবস্থা করা যেত। আমাদের ছোটবেলায় কেরোসিনের নামও শোনেনি কেউ।'

'ঠিক বলেছ,' বলল বাবা। 'নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার হওয়ায় মানুষের সুবিধা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ওসবের ওপর নির্ভরশীলও হয়ে পড়েছে।'

দুপুরের দিকে ঝড়টা কিছুক্ষণের জন্য থামলে আটা সংগ্রহের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়ল বাবা। ঘণ্টা দুয়েক পর ছোট একটা বস্তা কাঁধে নিয়ে ফিরে এল। ধপ্ করে ফেলল মেঝের ওপর।

'এই নাও, ক্যারোলিন,' মাথা নাড়ল বাবা। 'কোথাও কিচ্ছু নেই। এইটুকু শুধু পাওয়া গেল রয়াল ওয়াইল্ডারের স্টোরে। আটা ময়দা নেই, কয়েক দানা গম। ময়দার শেষ বস্তাটা কিনেছে ব্যাঙ্কার রুথ পঞ্চাশ ডলার দিয়ে।'

চোখ কপালে উঠল মার। 'বলো কী, চার্লস!'

'হ্যাঁ। ভাবা যায়? পাউন্ড প্রতি এক ডলার!' হাসল বাবা। 'অত দামে আমরা কিনতেও পারতাম না। ভালই হয়েছে কিনে নিয়েছে রুথ। এখন এই গম কীভাবে খাওয়া যায়, বুদ্ধি বের করো। সেদ্ধ করে?'

'দেখি কী করা যায়,' বলল মা।

'শহরে একটা আটা ভাঙানোর কল থাকা দরকার ছিল,' দুঃখ করল বাবা।

'আমাদের আছে একটা কল,' বলে তাক থেকে কফি গুঁড়ো করবার মেশিনটা নামিয়ে আনল মা।

'বাহ্, ভাল বুদ্ধি তো!' প্রশংসা করল বাবা। 'দেখা যাক কেমন কাজ হয়।'

আধ কাপ গম ঢেলে দিয়ে হাতল ঘোরানো শুরু হলো। কফি ভাঙার মতই খড়মড় আওয়াজ হলো বটে, কিন্তু কলের নীচের ড্রয়ারটা টেনে দেখা গেল ভাঙা ভাঙা গম চ্যাপ্টা হয়ে আছে। গমের দানাগুলো কফির মত ভাজা হয়নি বলে কাঁচা রয়ে গেছে ভেতরটা।

'এ দিয়ে রুটি হবে?' জানতে চাইল বাবা।

'নিশ্চয়ই হবে। তবে একটা রুটি হওয়ার মত গম ভাঙতে হলে সারাদিন চালাতে হবে এই মেশিন।'

'ভেরি গুড, আমি তা হলে রুটি সেঁকার জন্যে একগাড়ি খড় নিয়ে আসি চটপট।' পকেটে হাত ভরে একটা কৌটা বের করল বাবা। 'আর এই নাও তোমার বাতির উপকরণ।'

'ট্রেনের কোনও খবর হলো, চার্লস?'

'কাজ চলছে ট্রেসির সুড়ঙ্গে। গতবার বরফ সরিয়ে উঁচু করে ফেলা হয়েছিল গর্তের দুইপাশে, এবার ঠিক ততটাই উঁচু হয়ে জমে গেছে বরফ। আরও বেশি সময় লাগবে সাফ করতে।'

আস্তাবলের দিকে চলে গেল বাবা। কৌটা খুলে গ্রীজ দেখল মা, কিন্তু এখুনি

আলোর ব্যবস্থার চেয়ে নিভু নিভু আগুনটা টিকিয়ে রাখা অনেক বেশি জরুরী, তাই চুলোর ধারে গিয়ে শেষ খড়ের আঁটিটা ঢুকিয়ে দিল ভিতরে। লরা ছুটল আরও আঁটি তৈরি করতে। একটু পরেই মা এসে জুটল। বলল, 'মেরি গম ভাঙছে, আমরা ঘরটা গরম রাখার চেষ্টা করি। কারণ, ফিরতে ফিরতে একেবারে ঠাণ্ডায় জমে যাবে তোমাদের বাবা।'

বাবা যখন ফিরল তখন প্রায় বিকেল। শীতে জমে গেছে, তবু গাড়িটা ঘেরা বারান্দার ঠিক বাইরে রেখে প্রথমে ডেভিডের পরিচর্যা করল আস্তাবলে নিয়ে, তারপর খড়গুলো ঠেসে ঠেসে ভরল বারান্দায়, বেরোবার জন্য সামান্য ফাঁক রইল কেবল। এবার চুলোর ধারে এসে ঠক-ঠক করে কাঁপতে থাকল, কথা বলার ক্ষমতা নেই।

বেশ কিছুক্ষণ হাত-পা সেঁকে কাঁপুনি একটু কমলে বলল, 'তোমাদের খাওয়ার অনেক দেরি করিয়ে দিলাম, ক্যারোলিন। আসলে পুরু বরফে ঢাকা পড়েছে খড়ের গাদা, খুঁড়ে বের করতে হয়েছে।'

'দেরিতে কোনও অসুবিধে হয়নি আমাদের,' বলল মা। 'আমি ভাবছি, এখন থেকে রোজই এরকম সময়ে খেলে কেমন হয়। দিন ছোট হয়ে এসেছে, তিন বেলা খাওয়ার আসলে দরকারই পড়ে না। এরকম সময়ে খেলে দু'বেলা খাওয়াই যথেষ্ট, সাপার আর লাগবে না।'

মা নতুন গম দিয়ে চমৎকার রুটি বানিয়েছে। গমে বাদামের একটা গন্ধ মাখনের অভাব প্রায় দূর করে দিল। একটা আলু ছিলে লবণ মাখাতে মাখাতে বাবা বলল, 'বাহ্, লবণ মাখালেই আলুর সত্যিকার সুগন্ধ বেরিয়ে আসে, মাখন-ঘিয়ের দরকার পড়ে না, কী বলো হাফ-পাইন্ট?'

'হ্যাঁ,' বলল লরা। 'চিনিও বাদ দেয়া যায়। চিনি না দিলে বেরিয়ে আসবে চায়ের আসল সুগন্ধ!'

হেসে উঠল সবাই। বাবা বলল, 'আসলে চিনির সুগন্ধ পাওয়ার জন্যেই তো গরম চায়ের দরকার।' মাকে জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাক্সেল গ্রীজ দিয়ে কী রকম বাতি বানালে, ক্যারোলিন?'

'এখনও সময় পাইনি,' বলল মা। 'খেয়ে নিয়ে একটা বোতাম বাতি বানাব ভাবছি।'

'বোতাম বাতি আবার কী?'

'দাঁড়াও না, দেখতেই পাবে।' রহস্যময় হাসি হাসল মা।

বাবা আস্তাবলের কাজে যেতেই একটা পুরনো তস্তরিতে কিছুটা গ্রীজ মাখাল মা, তারপর পুঁটুলি থেকে কাপড় বের করে চারকোনা করে কাটল। এবার বড়সড় একটা বোতাম মাঝখানে বসিয়ে কাপড়টার চারকোনা ওপরে তুলে নীচের দিকটা কষে বাঁধল সুতলি দিয়ে। কোনাগুলো একসাথে ধরে পাক দিয়ে সরু করে সেখানে গ্রীজ মাখাল এবার। সবশেষে বোতামটা তস্তরির মাঝখানে বসিয়ে বলল, 'তোমাদের বাবা ফিরে আসুক।'

লরা আর ক্যারি চট করে সেরে ফেলল ধোয়া-মোছার কাজ। বাবা ফিরতে ফিরতে আঁধার হয়ে এলো চারদিক। মা বলল, 'তোমার ম্যাচটা একটু দেবে,

চার্লস?'

বোতাম-বাতির সরু আগায় ছোঁয়াল মা ম্যাচের আগুন। ছোট্ট একটা শিখা জ্বলে উঠল ওখানে। তেমন বড় হলো না আগুন, কিন্তু ঠিক প্রদীপেরই মত জ্বলতে থাকল কাপড় থেকে গ্রীজ টেনে নিয়ে।

অকুণ্ঠ প্রশংসা করল বাবা। বলল, 'তোমার তুলনা হয় না, ক্যারোলিন! এই একটু আলোতেই দেখো কেমন বদলে গেল পরিবেশটা!' চুলোয় হাত সেঁকে নিয়ে বাবা গেল খড় পেঁচিয়ে লাকড়ি বানাতে। মেরিকে বিশ্রাম দিয়ে গম পেষার জন্য বসল লরা। ছোট্ট কফি মিলটা সারাদিন হাতল ঘুরালে একটা পাউরুটি বানানোর মত গম পিষতে পারে।

প্রথমে গ্রেস আর ক্যারিকে শুতে পাঠিয়ে দিল মা। তারপর লরাকে বলল, 'যাও, মেরিকে নিয়ে শুয়ে পড়োগে। বাকিটুকু আমি পিষছি।'

# সাত

কয়েক দিন পর ঝলমলে রোদ উঠেছে।

শহরের পশ্চিমে একপাল অ্যান্টিলোপ দেখা গেছে। খবর পেয়েই বন্দুক নিয়ে ছুটল বাবা। শহরের আরও কয়েকজন বন্দুক-রাইফেল নিয়ে তৈরি। লরা বলল, 'ইশ্‌শ্! বাবা যদি দুটো মেরে আনতে পারে তা হলে দারুণ হয়!'

'ডিম ফোটার আগেই বাচ্চা গুনতে লেগো না, লরা,' মা বলল। 'তবে হ্যাঁ শুকনো রুটির সঙ্গে খানিক মাংস পেলে আমিও খুশি হব।'

কফি মিলের জন্য বাসনে করে গম এনে রাখল ক্যারি মেরির সামনে। বলল, 'রোস্ট! ভেনিসন রোস্ট! সেইসঙ্গে মাংসের ঝোল দিয়ে আলু আর রুটি, ওফ্!'

জানালার ধারে গিয়ে লরা দেখল, দুই দলে ভাগ হয়ে এগোচ্ছে লোকজন। পায়ে হেঁটে একদল চলেছে–উত্তর দিক দিয়ে ঘিরে ফেলবে অ্যান্টিলোপের পালটাকে; আর একদল চলেছে ঘোড়ায় চেপে–দক্ষিণ দিক দিয়ে পৌঁছবে ওগুলোর কাছে। আলমানযো আছে ওর প্রিয় ঘোড়া প্রিন্সের পিঠে, আর লেডির পিঠে উঠেছেন মিস্টার ফস্টার।

ওরা চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে থাকল লরা। তারপর রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে অপেক্ষায় থাকল গুলির আওয়াজ শুনবে বলে। বেশ কিছুক্ষণ পর একটা গুলির আওয়াজ শুনতে পেল লরা, গল্পের বাকিটুকু শুনল বাবার মুখে।

সবাই যখন প্রায় ঘিরে ফেলেছে পালটাকে, ঠিক তখনই বিগড়ে গেল শিকারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ মিস্টার ফস্টারের মাথা। ঘোড়ার পিঠে বসেই পাগলের মত লাফালাফি শুরু করলেন তিনি, চেঁচিয়ে উঠলেন গলা ফাটিয়ে। পরমুহূর্তে উত্তেজনার বশে নেমে পড়লেন ঘোড়ার পিঠ থেকে এবং রেঞ্জের অনেক বাইরে থেকেই গুলি ছুঁড়ে বসলেন অ্যান্টিলোপের দিকে।

যেন পাখা গজিয়েছে, দৌড় তো নয়, হাওয়ায় ভেসে উড়ে চলে গেল

অ্যান্টিলোপের পাল, আর তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়াচ্ছে আলমানযোর মর্গান, লেডি। পায়ে হাঁটা দলটার সামনে দিয়ে ছুটে চলে গেল অ্যান্টিলোপগুলো, একটা গুলিও ছুঁড়তে পারল না কেউ লেডির গায়ে লেগে যাওয়ার ভয়ে। ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল ওগুলো বহুদূরে।

'দারুণ শিকারী তুমি, ফস্টার!' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন মিস্টার জেরাল্ড ফুলার।

'তবু তো উনি একটা গুলি ছুঁড়েছেন,' টিটকারী মারল ক্যাপ গারল্যান্ড, 'আমরা তো একটাও পারলাম না!'

'আমি দুঃখিত,' বললেন মিস্টার ফস্টার। 'জীবনে অ্যান্টিলোপ দেখিনি আমি, আর...আর আমি ভেবেছিলাম আমি নেমে গেলেও দাঁড়িয়েই থাকবে বুঝি ঘোড়াটা।'

কেউ কিছু বলল না।

'ওয়াইল্ডারের ঘোড়াটার কী হবে, মিস্টার ইঙ্গলস?' জিজ্ঞেস করল ক্যাপ গারল্যান্ড।

'খুব সম্ভব স্পিরিট লেকের দিকে গেছে ওগুলো,' বলল বাবা। আলমানযোর দিকে ফিরল, 'তুমি যদি পিছু নিতে চাও, তা হলে এক্ষুণি নয়, একটু দেরি করে যাও। তাড়া করলে থামবে না অ্যান্টিলোপ, তোমার মর্গানটাও ওদের সঙ্গে সমান তালে দৌড়াতে গিয়ে কলজে ফেটে মরবে। আর,' আকাশের দিকে চাইল বাবা, 'ঘোড়ার দেখা পাও বা না পাও, বেশিদূর যেয়ো না, সময় থাকতে ফিরে এসো, তুষার-ঝড়ের আগেই।'

'তাই করব,' বলল আলমানযো। 'আমি আশেপাশে একটা চক্কর দিয়ে দেখি ওদের খোঁজ পাওয়া যায় কিনা। না পেলে উত্তর দিক থেকে ফিরে আসব শহরে। আর তো কিছু করার নেই। এমনও হতে পারে, ও হয়তো নিজেই ফিরে আসবে পথ চিনে।'

রওনা হয়ে গেল আলমানযো। বাকি সবাই বন্দুক কাঁধে ফিরে এল শহরে। ডিনারের আগে বাবা রয়াল ওয়াইল্ডারের সীড স্টোরে গিয়ে খবর নিয়ে এল, ফিরিয়ে এনেছে আলমানযো তার লেডিকে। দু'ভাই অনেক সাধাসাধি করে তাকে প্যানকেক আর ভাজা বেকন খাইয়ে ছেড়েছে।

কয়েকদিন তুষার-ঝড়ের পর আবার এক সকালে সূর্য উঠল। বাবা ডেভিডকে নিয়ে ছুটল এই সুযোগে কিছু খড় এনে রাখার জন্য। লরা, ক্যারি আর মা বারবার উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাল উত্তর-পশ্চিম আকাশের দিকে। কিন্তু রোদ থাকতে থাকতেই ফিরে এল বাবা।

বিকেলের দিকে আলু আর আটার রুটি দিয়ে দিনের দ্বিতীয় এবং শেষ খাওয়া সেরে বাবা গেল খবরাখবর আনতে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এল হাসতে হাসতে। 'বলো দেখি কী এনেছি?'

হাতের প্যাকেটটা টিপেটাপে দেখল ক্যারি আর গ্রেস। ক্যারি বলল, 'মনে হচ্ছে...মনে হচ্ছে...' আন্দাজ করতে পারছে ঠিকই, কিন্তু বলতে ভয় পাচ্ছে—যদি তা না হয়!

'গরুর গোস্ত!' বলল বাবা দরাজ গলায়। মার হাতে প্যাকেটটা দিয়ে বলল, 'চার পাউন্ড গরুর গোস্ত। আলু আর রুটির সঙ্গে দারুণ জমবে, ক্যারোলিন।'

অবাক হয়ে গেল মা। 'গোস্ত কোথায় কী করে পেলে, চার্লস?'

'ফস্টার ওর ষাঁড়দুটো জবাই করেছে,' বলল বাবা। 'ভাগ্যিস ঠিক সময়মত পৌঁছেছিলাম! হাড়-মাংস সব ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে শহরের লোকেরা–প্রতি পাউন্ড পঁচিশ সেন্ট। এখন কদিন রাজার হালে খাব আমরা!'

খুশি হয়ে উঠল মা। বলল, 'হ্যাঁ, অন্তত সাতদিন চালিয়ে নিতে পারব এটা দিয়ে। ততদিনে তো ট্রেন এসেই যাবে, তাই না?' হাসিমুখে বাবার দিকে চাইল মা, ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল মুখের হাসি। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, চার্লস? কিছু হয়েছে?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল বাবা, 'ট্রেন আসছে না, ক্যারোলিন। রেল কোম্পানী আগামী বসন্ত পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে ট্রেন চলাচল।'

হাঁ হয়ে গেল মা। 'তা কী করে হয়, চার্লস? এখন সবে জানুয়ারির শুরু, ওরা ভাল করেই জানে, সাপ্লাই ছাড়া এখানে ধুঁকছি আমরা এতগুলো লোক। বসন্ত পর্যন্ত ট্রেন বন্ধ করে দেয় কীভাবে?' ধপ্ করে বসে পড়ল মা চেয়ারে।

'অনেক চেষ্টা করেছে ওরা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছে হাল ছেড়ে দিতে।' মার কাঁধে হাত রাখল বাবা। নরম গলায় বলল, 'ট্রেন ছাড়াই এতগুলো দিন কাটিয়ে দিয়েছি আমরা, ক্যারোলিন। তাই না?'

'হ্যাঁ,' বলল মা।

'কিচ্ছু ভেবো না তুমি,' মাকে সান্ত্বনা দিল বাবা। 'শুধু এই একটা মাস, তারপর ফেব্রুয়ারি ছোট্ট একটা মাস, তারপরেই মার্চ মাসে এসে পড়বে বসন্ত।'
চার পাউন্ড মাংসের দিকে চাইল লরা। মনের চোখে স্পষ্ট দেখতে পেল গোটা কয়েক আলু আর প্রায়-খালি গমের বস্তাটা। জিজ্ঞেস করল, 'গম কি শহরে আর একটুও নেই, বাবা?'

'ঠিক জানি না, লরা,' কেমন অদ্ভুত শোনাল বাবার গলাটা, যেন দ্বিধা আছে কোথাও। 'ভেবো না, এখনও কিছু গম তো আছে আমাদের। কারও কারও হয়তো তাও নেই।'

একের পর এক একঘেয়ে দিন কাটছে লরার।

টেবিলে কমে এসেছে খাবারের পরিমাণ। মা চালাকি করে একটা আলু বেশি রাখে, সবার দুটো করে নেয়া হয়ে গেলে বাড়তি আলুটা বাবার আপত্তি সত্ত্বেও তুলে দেয় তার পাতে, জোর-জুলুম করে ওটা খেতে বাধ্য করে তাকে।

অনেক শুকিয়ে গেছে বাবা, চোখ বসে গেছে গর্তে। অভ্যাস বশে কাজ করে যাচ্ছে বটে, কিন্তু প্রাণবন্ত ভাবটা আর নেই। খড় মুচড়ে জ্বালানি তৈরি করতে গিয়ে, এবং সেইসঙ্গে ঠাণ্ডার কামড়ে জায়গায় জায়গায় ফেটে গেছে আঙুল। এখন আর বেহালা বাজাতে পারে না।

নিয়ম ধরে পড়তে বসে লরা, কিন্তু মাথা চলে না। সারাক্ষণ কেমন একটা ঘুম-ঘুম আলস্য আচ্ছন্ন করে রাখে ওকে, খিদে চাপতে চাপতে এখন আর তেমন

খিদেও পায় না। মাঝে মাঝে ঝড়-তুফান থামে, ঝলমলে সূর্য ওঠে, কিন্তু এখন আর এসব ওর মনে কোন রেখাপাত করে না। কোন কিছুতেই যেন আগ্রহ নেই আর। সব অর্থহীন।

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত কোনমতে টেনেটুনে চালিয়ে নিল মা। তারপর একদিন শেষ হয়ে গেল গম।

ভয় পেল লরা। জিজ্ঞেস করল, 'মা, গম তো শেষ। আমরা সবাই কি না খেয়ে মারা যাব?'

'না, লরা,' শান্ত গলায় বলল মা। 'যদি প্রয়োজন পড়ে, তোমার বাবা এলেন আর তার বাছুরটাকে জবাই করবে।'

'না, না!' চেঁচিয়ে উঠল লরা।

'চুপ করো, ছোটরা ভয় পাবে। শুধু জেনে রাখো, তোমাদেরকে না খেয়ে মরতে দেবে না বাবা কিছুতেই।'

'আচ্ছা মা, ওই যে একটা গুজব শোনা গিয়েছিল, গত গ্রীষ্মে কোন্ চাষী নাকি প্রচুর গম ফলিয়েছিল–তার কাছ থেকে কিছু গম আনানোর ব্যবস্থা করা যায় না?'

'কে যাবে অতদূর? শোনা গিয়েছিল লোকটা তার হোমস্টেডের কুটিরেই শীত কাটাচ্ছে। কিন্তু কে যাবে সেখানে? সে তো আঠারো-বিশ মাইল দূরে। এই ঝড়-তুফানে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কে যাবে অতদূর?'

ঘরে ঢুকে কথাটা শুনতে পেয়ে বাবা বলল, 'যাওয়া কিন্তু যায়, ক্যারোলিন। পরিষ্কার দুটো দিন পেলে আঠারো-বিশ মাইল গিয়ে আমি ...'

'না!' বলল মা।

চমকে গিয়ে মার দিকে চাইল বাবা। মায়ের গলা শুনে সবার চোখ গেল তার দিকে। মার এই মূর্তি আগে কোনদিন দেখেনি ওরা কেউ। শান্ত কণ্ঠে বলল মা, 'তুমি যাবে না।'

'কেন ... ক্যারোলিন!'

'খড় নিয়ে আসছ হোমস্টেড থেকে, এ-ই যথেষ্ট,' বলল মা। 'জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওই গমের পেছনে ছুটতে হবে না তোমার।'

'ঠিক আছে,' বলল বাবা। 'তোমার আপত্তি ঠেলে আমি যাচ্ছি না। কিন্তু

'কোনও "কিন্তু" শুনব না আমি,' বলল মা। 'আর, আপত্তি নয়, আমি বারণ করছি।'

'ব্যস, ব্যস! তা হলে তো প্রশ্নই ওঠে না।' ঘরের কোণে রাখা প্রায়-শূন্য বস্তার দিকে চাইল বাবা। 'গম তো শেষ দেখতে পাচ্ছি, আলুর কী অবস্থা?'

মা বলল, 'গম যা আছে তাতে কাল সকালের রুটি হয়ে যাবে। আর আলু আছে ছয়টা।'

'দুধের বালতিটা কোথায়?'

'দুধের বালতি?'

'হ্যাঁ। ওটা নিয়ে আমি বাইরে থেকে চট্ করে এক চক্কোর ঘুরে আসব।'

লরা বালতিটা এনে দিতেই কিছু না বলে বেরিয়ে গেল বাবা।

সাপার খাচ্ছে আলমানযো আর রয়াল। প্যানকেকের ওপর বাদামি গুড় মাখানো। দুই ডজন করে নিয়ে বসেছে একেকজন। আধা-আধি শেষ করেছে, এমনি সময় দরজায় টোকা দিল বাবা। উঠে গিয়ে দরজা খুলল রয়াল।

'আসুন, মিস্টার ইঙ্গলস, আমাদের সঙ্গে বসে কটা প্যানকেক খান।'

'ধন্যবাদ,' বলল বাবা। 'সামান্য কিছু গম কি হবে তোমাদের কাছে বিক্রির জন্যে?'

'দুঃখিত,' বলল রয়াল। 'সব বিক্রি হয়ে গেছে, আর নেই।'

'একেবারে সাফ?'

'হ্যাঁ, এক্কেবারে।'

'কিছু গম না হলে যে চলছে না,' বলল বাবা। 'অনেক বেশি দাম দিতেও রাজি আছি আমি।'

'এখন বুঝতে পারছি, আরও একগাড়ি গম আনা উচিত ছিল আমার,' বলল রয়াল। 'যাই হোক, আসুন, বসে পড়ুন। আলমানযো বড়াই করে, ওর মত প্যানকেক নাকি কেউ বানাতে পারে না। একটু পরীক্ষা হয়ে যাক।'

কোন জবাব না দিয়ে পিছনের দেয়ালের কাছে চলে গেল বাবা, তারপর দেয়ালে টাঙানো একটা জিন সরাল। বিস্মিত আলমানযো বলে উঠল, 'করেন কী!'

দুধের বালতিটা দেয়ালে ঠেসে ধরে টান দিয়ে ছিপিটা খুলে ফেলল বাবা। গোল গর্ত দিয়ে হড়হড় করে নামছে গমের ধারা।

'তোমাদের কাছ থেকে অল্পকিছু গম কিনছি,' জবাব দিল বাবা।

'আরে! ওগুলো আমার বীজ-গম। এই গম তো আমি বেচব না!'

'আমাদের গম শেষ। না নিলে কাল সকাল থেকে উপোস থাকতে হবে সবাইকে। তাই তোমার বীজ-ধানই কিনতে বাধ্য হচ্ছি।'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল আলমানযো, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে মিটিমিটি হাসছে রয়াল।

বালতিটা ভরে যেতেই ছিপিটা জায়গা মত ভাল করে ঠুকে বসিয়ে দিল বাবা, তারপর দেয়ালের এখানে ওখানে টোকা দিয়ে বলল, 'যথেষ্ট গম আছে তোমার এখানে। এবার দামের কথায় আসা যাক। এই এক বালতির জন্যে কত দেব বলো দেখি?'

'আপনি জানলেন কী করে যে ওখানে গম আছে?' জিজ্ঞেস করল আলমানযো।

'দেখার চোখ থাকলে যে-কেউ বুঝে নেবে,' বলল বাবা। 'এ-ঘর বাইরে থেকে যত বড়, ভেতরে তার চেয়ে ফুটখানেক ছোট। নিশ্চয়ই কিছু লুকানো আছে ওখানে।'

'আশ্চর্য!' বলল আলমানযো।

'তা ছাড়া গত দিন তোমার খবর জানতে এসে ছিপিটা দেখেছি আমি, জিন দিয়ে ঢাকা ছিল না ওটা তখন। বুঝলাম, গর্ত দিয়ে গড়িয়ে নামার মত জিনিস

আছে ওখানে—নিশ্চয়ই শস্য।'

'শহরের আর কেউ জানে?' আলমানযোর প্রশ্ন।

'আর কেউ জানে বলে শুনিনি,' বলল বাবা। 'আমিও বলিনি।'

রয়াল কথা বলে উঠল এই সময়ে। 'দেখুন, মিস্টার ইঙ্গলস, আপনার গম শেষ, একথা আমরা জানতাম না। ওগুলো আলমানযোর গম, আমার নয়। তবে এটুকু বলতে পারি, কেউ না খেয়ে আছে জেনেও গম মজুদ করে রাখার মত মানুষ ও নয়।'

'ওগুলো আমার আগামী মরশুমের বীজ,' ব্যাখ্যা করল আলমানযো 'খুবই উন্নত মানের বীজ। বসন্তকালে যে ট্রেন চালু হয়ে যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সেইজন্যে লুকিয়ে রেখেছি। এটা ঠিক, কেউ না খেয়ে থাকলে আমাকে এ-গম বের করে দিতেই হবে; কিন্তু শহরের দক্ষিণে কে নাকি প্রচুর ফসল তুলেছে গতবার, তার কাছ থেকে কিনে আনতে যাচ্ছে না কেন কেউ?'

'দক্ষিণ-পুবে, যতদূর শুনেছি,' বলল বাবা। 'আমি নিজে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ...'

'আপনার যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না,' বলে উঠল রয়াল। 'পরিবারের প্রতি একটা দায়িত্ব আছে না, আপনার কিছু একটা হয়ে গেলে ওদের কী অবস্থা হবে?'

'তা ঠিক। কিন্তু তোমরা এখনও এই গমের একটা দাম ধরোনি।' কাজের কথায় ফিরে এল বাবা।

'প্রতিবেশী একটু গম নিলে সেটার দাম ধরতেই হবে কেন?' বলল আলমানযো। 'ওর জন্যে আর দাম দিতে হবে না। তার চেয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ুন, মিস্টার ইঙ্গলস, প্যানকেকগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার আগেই।'

বাবার পীড়াপীড়িতে পঁচিশ সেন্ট দাম ধরল আলমানযো। টাকা পরিশোধ করে তারপর ওদের আতিথ্য গ্রহণ করল বাবা। কাপড় সরিয়ে গুড় মাখানো সুস্বাদু প্যানকেকের স্তূপ থেকে কয়েকটা নামিয়ে একটা প্লেটে নিল। রয়াল ফ্রাইং প্যান থেকে একটুকরো মাংস তুলে দিল, আলমানযো কাপ ভরে এগিয়ে দিল গরম কফি। খেয়ে উঠে বাবা বলল, 'এর চেয়ে সুস্বাদু খাবার কবে, কোথায় খেয়েছি মনে পড়ে না। তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমাদের সঙ্গ আমার খুব ভাল লাগল।'

কিছুক্ষণ আবহাওয়া, রাজনীতি, রেলরোড এসব নিয়ে কথা বলে উঠে পড়ল বাবা। যখন খুশি চলে আসার জন্য অনুরোধ করল রয়াল। শেষে বলল, 'এখন তো জেনে গেছেন কোথায় লুকানো আছে আলমানযোর গম, যখন প্রয়োজন চলে আসবেন। আমরা কিছু মনে করব না।'

ঘরে একটা ঝাঁকি লাগতেই বোঝা গেল আবার আসছে ঝড়। উঠে পড়ল বাবা। যখন বাড়ির দরজায় পৌঁছল, তখন পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে ঝড়ের তাণ্ডব।

অন্ধকার রান্নাঘরে বসে আছে সবাই। বাবা ঢুকে বলল, 'এই নাও, ক্যারোলিন। কয়েকটা দিন চলে যাবে এতে। গম।'

বালতিতে হাত ডুবিয়ে অনুভব করল মা গমের দানা। তারপর বলল, 'চার্লস,

আমি জানতাম একটা কিছু ব্যবস্থা তুমি করবেই। কিন্তু কোথায় পেলে গম?'

'কোথায় পেয়েছি তা বলতে পারব না, ক্যারোলিন। ওদের কথা দিয়েছি বলব না কাউকে। তবে তুমি কিচ্ছু ভেবো না, ক্যারোলিন, ঠেকে গেলে আরও আনা যাবে ওখান থেকে।'

খুশি মনে সবাইকে বিছানায় পাঠিয়ে দিল মা। নিজে বসল কফি মিলের হাতল ঘুরিয়ে আটা তৈরির কাজে।

# আট

দুদিন ধরে অনেক চিন্তা করল আলমানযো। তারপর রয়ালকে বলল, 'আমি কি ভাবছি জান?'

'চুপচাপ ভাবলে কী করে জানব?'

'আমার ধারণা, শহরের বেশ কিছু লোক অনাহারে আছে।'

'এই যেমন আমি,' তাওয়ায় প্যানকেক উল্টে দিয়ে বলল রয়াল। 'রীতিমত ক্ষুধার্ত!'

'অনাহারের কথা বলছি আমি,' আলমানযো গম্ভীর। 'ইঙ্গল্‌স্‌দের কথাই ধরো। পরিবারের সদস্য ছয়জন। তুমি লক্ষ করেছ কী রকম শুকিয়ে গেছে মানুষটা? চোখ বসে গেছে গর্তে। বলল, গম শেষ। তাই না? সোয়া এক পেক (দশ কেজির মত) গমে কদিন চলবে এই পরিবারের? ভেবে দেখো।'

'নিশ্চয়ই অন্য আরও কোন ব্যবস্থা আছে ভদ্রলোকের,' বলল রয়াল।

মাথা নাড়ল আলমানযো। 'হোমস্টেড নিয়ে গত গ্রীষ্মেই প্রথম চাষ দিয়েছে মিস্টার ইঙ্গলস। তুমি ভাল করেই জান, ঘাসের চাপড়ার মধ্যে প্রথম ফসল কী পাওয়া যায়। আর এই শহরে মজুরীর বিনিময়ে কোন কাজ নেই।'

'যা বলতে চাও অত ভণিতা না করে বলে ফেলো। তুমি কী করবে? তোমার বীজ-গম বেচে দেবে?'

'একান্ত বাধ্য না হলে বেচব না,' ঘোষণা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল আলমানযো। 'আমার ধারণা, শুধু ইঙ্গলসরা নয়, আরও অনেক পরিবারই আধ-পেটা খেয়ে কোনমতে টিকে আছে। একটানা এতদিন ধরে সবরকম সাপ্লাই বন্ধ থাকবে, আমরা কেউ কি ভাবতে পেরেছিলাম? বুড়ো ইন্ডিয়ানটা সাত মাস তুষার-ঝড়ের কথা বলেছিল, মনে আছে? তাই যদি সত্যি হয়, তা হলে ধরে নাও, এপ্রিলের আগে ট্রেন আসছে না। তা হলে কী দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা? আমার সব গম মানবতার খাতিরে খাইয়ে দিতে হচ্ছে, এবং তার পরেও অভুক্ত থাকতে হচ্ছে অনেক মানুষকে। আর আমি তো মারা পড়ছি ধনে-প্রাণে। আগামী মরশুমে বীজের অভাবে একটা দানা ফসল তুলতে পারছি না মাঠ থেকে।'

'অতএব?' বক্তব্য সংক্ষেপ করবার ইঙ্গিত দিচ্ছে রয়াল।

'অতএব যেমন করে হোক, রক্ষা করতে হবে আমার বীজগুলো। এবং তাই

করব আমি।' কথা শেষ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল আলমানযো গরমাগরম প্যানকেকের স্তূপের ওপর। প্লেটে একগাদা তুলে নিয়ে অকৃপণ হাতে তরল চিটাগুড় ঢালল তার ওপর।

অবাক দৃষ্টিতে ওর কার্যকলাপ দেখল রয়াল, তারপর আগের কথার খেই ধরে প্রশ্ন করল, 'কীভাবে?'

'ঝড়টা থামলেই এদের গমের ব্যবস্থা করে দেব।' প্যানকেকে কামড় দিল আলমানযো।

আবার প্রশ্ন করল রয়াল, 'কীভাবে?' পরমুহূর্তে চমকে উঠে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই বিশ মাইল দূরের ওই চাষীর খোঁজে বেরোবার কথা ভাবছ না?'

'ভাবছি। কাউকে না কাউকে তো যেতেই হবে।'

'চল্লিশ মাইল!' হাঁ হয়ে গেল রয়াল। 'বরফ-ঢাকা খোলা প্রেয়ারিতে যেতে চাইছ খড়ের গাদায় সুঁই খুঁজতে! জান না, আবার কখন বিনা নোটিসে শুরু হবে ব্লিযার-ঝড়! না, আলমানযো, এই কাজে আমার অনুমতি পাবে না তুমি।'

হেসে উঠল আলমানযো। 'চেয়েছি?'

'অসম্ভব, এভাবে বোকার মত প্রাণের ঝুঁকি নিতে তুমি পার না। তোমার একটা কিছু হয়ে গেলে বাবাকে আমি কী জবাব দেব?'

'বলবে, তোমার করার কিছুই ছিল না। বাবা জানে, আমার খুশিমত চলি আমি, তোমাকে প্রশ্নই করবে না।'

'বুঝতে পারছি, কথা শুনবে না। ঠিক আছে। একা তোমাকে যেতে দেব না আমি। গাধার মত যদি বিপদে ঝাঁপ দিতে চাও, আমিও যাব তোমার সঙ্গে!'

'তোমাকে আমি নিলে তো!' হাসল আলমানযো।

পরদিন খবর আনল বাবা, আলমানযো ওয়াইল্ডার আর ক্যাপ গারল্যান্ড যাচ্ছে দক্ষিণের সেই গমের খোঁজে।

মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মা'র মুখ, চোখে ভয়। 'কত দূর যেন বলেছিলে?'

'আসলে সঠিক করে কেউ কিছু বলতে পারে না। সবই শোনা কথা। জায়গাটা যে ঠিক কোথায়, তাও জানে না কেউ। গুজব উঠেছে, ওইদিকের এক চাষী ভাল গম ফলিয়েছে গত মরশুমে। এদিকের কেউ যখন শহরে গম বিক্রি করেনি, তখন ধরে নেয়া হচ্ছে যে চার-পাঁচশো বুশেল গম আছে ওর কাছে। ফস্টার বলছে, কার কাছে যেন শুনেছে, শীতকালটা ওই সেটলার নিজের হোমস্টেডেই কাটাচ্ছে। তাই ছুটছে ছেলে দুটো। টাকা দিচ্ছে লোফটাস, যতটা বয়ে আনা সম্ভব, ততটা কিনে আনবে ওরা সেই চাষীর কাছ থেকে…অন্তত চেষ্টা করবে।'

'কবে রওনা হচ্ছে ওরা?' জিজ্ঞেস করল মা।

'ঝড়টা থামলেই। দুজন দুটো স্লেড নিয়ে যাচ্ছে।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল বাবা, 'হয়তো ঠিকই কাজ সেরে ফিরবে ওরা। আকাশটা পরিষ্কার থাকলে পথ চলা খুব একটা কঠিন হবে না। বলা যায় না, আগামী দু-তিনটে দিন আবহাওয়া ভালও থাকতে পারে।'

'অসুবিধে তো ওখানেই,' বলল মা। 'বলা যায় না।'

'ওরা যদি আনতে পারে, তা হলে আগামী মার্চ পর্যন্ত অন্তত গমের অভাব থাকবে না এই শহরের কারও। মানে, গম যদি সত্যিই থাকে, আর ওরা যদি জায়গাটা খুঁজে পায়।'

তৃতীয় রাতে থামল ঝড়।

চারদিক স্তব্ধ হয়ে যেতেই ভেঙে গেল আলমানযোর ঘুম। ঘড়িতে দেখল তিনটে বাজে। নাহ্, আর শুয়ে থাকা যায় না। উঠে পড়ল ও। বাইরে উঁকি দিয়ে দেখল পুব আকাশে জ্বলজ্বল করছে শুকতারাটা। বাতাস আছে সামান্য। ঠাণ্ডা শূন্যের দশ ডিগ্রী নীচে। মনে হলো দিনটা ভালই যাবে।

নাস্তা সেরে আলমানযো যখন ওর খড়-টানা স্লেডটা নিয়ে রাস্তায় উঠল, তখনও সূর্যের দেখা নেই। শুকতারাটা ম্লান হয়ে মিলিয়ে গেছে ফরসা হয়ে আসা পুব আকাশে। বড় রাস্তার পুব দিকে ইঙ্গলসদের বাড়িটা পিছনের তুষার ছাওয়া প্রেয়ারির পটভূমিতে কালো দেখাচ্ছে। তার পিছনে গোলাঘরের সামনে খড়ের গাদা। তার পিছনে গারল্যান্ডদের বাড়ির রান্নাঘরে আলো দেখা যাচ্ছে। আর একটু এগোতেই দেখা গেল ওর বাকস্কিন গেলডিং নিয়ে রাস্তায় উঠে আসছে ক্যাপ গারল্যান্ড।

দক্ষিণ-পুব দিকে এগোল ওরা, বড় বিলটা যেখানে সবচেয়ে সরু সেখান দিয়ে পার হবে বলে। পথ নেই, কাজেই পথ চিনে এগোবার উপায় নেই। সম্পূর্ণ আন্দাজের ওপর নির্ভর করে আগে আগে চলেছে আলমানযো, পিছন পিছন নিরাপদ দূরত্বে থেকে সাবধানে আসছে ক্যাপ গারল্যান্ড।

বড় বিলের গলার কাছে এসেই প্রথমবারের মত গর্তে পড়ল আলমানযোর প্রিন্স। 'ওয়াও-ওয়া, স্টেডি!' বলল আলমানযো নরম গলায়। স্লেডটা থেমে দাঁড়াতেই নেমে গিয়ে প্রিন্সকে অভয় দিয়ে নিরাপদে শক্ত বরফের ওপর তুলে আনল সে, তারপর আবার ওকে স্লেডের সঙ্গে জুড়ে নিয়ে এগোল সামনের দিকে।

বড় বিল পার হয়ে দক্ষিণে জোড়া লেক হেনরি আর থমসনের দিকে ছুটল ওরা। কোথাও প্রাণের কোন চিহ্ন নেই, মাইলের পর মাইল শুধু ঢেউ খেলানো তুষার আর তুষার। উজ্জ্বল রোদ সেখানে প্রতিফলিত হয়ে চোখ ঝলসে দিচ্ছে ওদের। ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গেছে হাত। পা দুটো জমে যেতে চাইলে স্লেড থেকে নেমে কিছুক্ষণ দৌড়ে শরীর গরম করে নিচ্ছে ওরা। বুকে থাবড়া মেরে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখছে হাতের।

'একা একটা কটনউড গাছ দেখতে পাচ্ছ কোথাও?' জিজ্ঞেস করল আলমানযো।

'নাহ্,' জবাব দিল ক্যাপ। 'চোখ ঝলসে গেছে আমার। দূরের কিছুই ঠাহর করতে পারছি না ভাল মত।'

'আমারও একই...' অবস্থা বলার আগেই আবার একটা গর্তে পড়ল প্রিন্স। আবার থেমে গর্ত থেকে তোলা হলো ওকে, গর্ত এড়িয়ে স্লেড এগিয়ে নিয়ে আবার জোতা হলো স্লেডে।

আবার শুরু হলো অনিশ্চিত যাত্রা। কিছুদূর গিয়ে সেই কটনউড গাছের দেখা পেল ওরা। ওটা দেখা মাত্র পশ্চিম দিকে এগোল আলমানযো, যাতে জোড়া লেকের গর্তে পড়ে হাবুডুবু না খেতে হয়।

কটনউড গাছটা পেরিয়ে এসে আর কোনও চিহ্ন পেল না ওরা যা দেখে নিশ্চিন্তে এগোনো যায়। এখন শুধু গুজবের ওপর নির্ভর করে আন্দাজে এগিয়ে যাওয়া। মাঝে মাঝে পিছনে ফিরে ক্যাপের দিকে চাইছে আলমানযো, মাথা নাড়ছে ক্যাপ, না, ধোঁয়ার কোনও আভাস চোখে পড়েনি ওর।

'আর কতদূর?' একসময় জিজ্ঞেস করল ক্যাপ।

'যতক্ষণ গমের সন্ধান না পাচ্ছি,' জবাব দিল আলমানযো। মাথার ওপর উঠে এসেছে সূর্য। অর্থাৎ দিনের অর্ধেক কেটে গেছে। আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই। তবে কখন হঠাৎ করে শুরু হয়ে যাবে আবার, কেউ বলতে পারে না। এখুনি ফিরতি পথ ধরা উচিত, বুঝতে পারছে আলমানযো, কিন্তু ক্ষুধার্ত একটা শহরে শূন্য স্লেড নিয়ে কী করে ফিরবে বুঝতে পারছে না।

'আমরা এলাম কতদূর?' আবার জিজ্ঞেস করল ক্যাপ।

'মাইল বিশেক্...বা তার কাছাকাছি,' আন্দাজ করল আলমানযো। 'তোমার কী মনে হয়, এখন ফেরা উচিত?'

'শেষ না দেখেই?' চওড়া হাসি হাসল ক্যাপ। 'আগে হেরে তো নিই, তারপর নাহয় হার স্বীকার করা যাবে।'

উঁচু একটা ঢিবি মত জায়গায় থেমে দাঁড়িয়ে চারদিকে চাইল ওরা। দিগন্তের কাছে ঝাপসা একটা ভাব না থাকলে পরিষ্কার দেখতে পেত ওরা বিশ মাইল পর্যন্ত। উত্তর-পশ্চিম দিকে শহরের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। আকাশ পরিষ্কার, ঝড়ের আভাস নেই কোথাও। জমাট বরফের ওপর পা ঠুকে আর দুই হাতে বুক চাপড়ে রক্ত চলাচল ঠিক রাখার চেষ্টা করছে ওরা, আর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে কোনও দিকে ধোঁয়া দেখা যায় কিনা। কোথাও কোন ধোঁয়ার আভাস নেই।

'কোন্‌দিকে যাব এবার?' জানতে চাইল ক্যাপ।

'যে-কোনও দিকে গেলেই হয়,' হালকা সুরে বলল আলমানযো। মাফলারটা আবার জড়াতে জড়াতে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার পায়ের কী অবস্থা?'

'সাড়া দেয় না,' বলল ক্যাপ। 'একটা দৌড় দিলেই মনে হয় ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমাকেও তাই করতে হবে। দৌড়ে যদি সাড়া না ফেরে, থেমে তুষার ঘষতে হবে পায়ে। চলো, আগে পশ্চিমে কিছুদূর গিয়ে দেখি। যদি কিছু চোখে না পড়ে তা হলে ওখান থেকে আরও দক্ষিণে চক্কোর দিয়ে দেখব।'

উঁচু জমিটা হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। সামনে ঢাল দেখে প্রিন্সের রাশ টানল আলমানযো, এক-পা দু-পা করে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল গর্তে পড়ার ভয়ে। হঠাৎ নিচু জমিটার ওপাশে সামান্য ধোঁয়া দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল ও, 'ওই যে, ক্যাপ! ওই দেখো ধোঁয়া!'

'উঁচু পাড়টার ওপাশ থেকে উঠছে মনে হয়,' খুশি হয়ে বলল ক্যাপ।

ছুটল ওরা। উত্তেজনার বশে আলমানযোর পাশে চলে এল ক্যাপ, এবং

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গর্তে পড়ে গলা পর্যন্ত তলিয়ে গেল ওর বাকস্কিন। অনেক কষ্ট করে তুলতে হলো ঘোড়াটাকে, গর্তের কিনার থেকে স্লেড ঘুরিয়ে আবার রওনা হতে অনেক সময় লেগে গেল। আর একবার গর্তে পড়লে এখানেই রাত হয়ে যাবে বুঝে সাবধানে এগোল ওরা এবার।

তুষারের উঁচু পাড়ের কাছে পৌঁছে কোথাও কারও পায়ের চিহ্ন দেখা গেল না। পাড়ের কিনার ধরে দক্ষিণ দিকে এসে দেখা গেল তুষার সরিয়ে একটা পথ মত করা হয়েছে। একটা দরজার সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে পথ। স্লেড থামিয়ে দ্বৈতকণ্ঠে হাঁক ছাড়ল ওরা।

দড়াম করে খুলে গেল দরজা। দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে ওদের দিকে চেয়ে রয়েছে এক লোক। লম্বা চুল, অনেকদিন না-কামানো দাড়িতে নাক-মুখ প্রায় অদৃশ্য।

'আরে! কারা তোমরা?' বিস্মিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, 'আরে! দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে চলে এসো! কোত্থেকে এলে, যাচ্ছই বা কোথায়? ভেতরে, ভেতরে চলে এসো! কটা দিন থাকছ তো আমার এখানে? ঢুকে পড়ো, ঘরে ঢুকে পড়ো!' এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে যে জবাবের অপেক্ষায় না থেকে প্রশ্ন করে চলেছে একের পর এক।

'আগে আমাদের ঘোড়াদুটোর ব্যবস্থা করতে হবে,' বলল আলমানযো।

'বেশ তো,' এক খাবলা দিয়ে একটা কোট সংগ্রহ করল লোকটা, সেটা গায়ে চড়িয়ে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। 'এই দিকে, এই দিকে আস্তাবল। এসো আমার সঙ্গে। কোথা থেকে এসেছ তোমরা?'

'শহর থেকে,' জবাব দিল ক্যাপ। ঘোড়ার সাজ খুলতে খুলতে নিজেদের পরিচয় দিল ওরা। লোকটাও নিজের পরিচয় দিল, নাম অ্যান্ডারসন।

আস্তাবলের একধারে সার বেঁধে খুঁটি গেড়ে দেয়াল তোলা হয়েছে, দেয়ালের গায়ে একটা দরজা বসানো। দেয়ালের একটা ছোট্ট ফাঁক গলে কয়েক দানা গম পড়েছে এপাশের মেঝেতে। তাই দেখে হাসিমুখে পরস্পরের দিকে তাকাল ক্যাপ আর আলমানযো।

ঘোড়া দুটোকে পানি আর জই খাইয়ে, সামনের গামলায় একগাদা খড় দিয়ে অ্যান্ডারসনের একজোড়া কালো ঘোড়ার পাশে বেঁধে রাখল ওরা, তারপর লোকটার পিছু পিছু ওর মাটির ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ঘরটা গরম। স্টোভে পানি ফুটছে। দেয়ালের গায়ে লাগানো একটা টেবিলে অ্যান্ডারসনের ডিনার সাজানো। ওদেরকে বসে পড়তে অনুরোধ করল সে, বলল, অক্টোবরের পর থেকে আর কোনও মানুষের সাক্ষাৎ পায়নি।

বিনা বাক্য ব্যয়ে বসে গেল ওরা। বীন সেদ্ধ, সাওয়ারডাফ বিস্কিট আর শুকনো আপেলের সস্ দিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে ডিনার খেয়ে উঠল। গরম খাবার আর কফি পেটে পড়তে অর্ধেক শরীর গরম হয়ে গেল, কিন্তু চুলোর ধারে পা সেঁকতে গিয়ে টের পেল ওরা ব্যথা কাকে বলে। তবে এটুকু নিশ্চিত হওয়া গেল যে জমে অকেজো হয়ে যায়নি পা। কথায় কথায় অ্যান্ডারসনকে জানাল আলমানযো, ওরা কিছু গম কিনতে চায়।

'কিন্তু আমি তো গম বেচব না,' পরিষ্কার জানিয়ে দিল অ্যান্ডারসন। 'আগামী মরশুমের বীজ হিসেবে রেখেছি আমি ওগুলো। কিন্তু এই অসময়ে গম কিনতে বেরিয়েছ কেন তোমরা?'

ট্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা, শহরের ক্ষুধার্ত লোকেদের কথা ভেঙে বলল ওকে আলমানযো। 'বিশেষ করে কষ্টে আছে নারী আর শিশুরা। সেই ক্রিসমাসের আগে থেকেই আধ-পেটা খেয়ে কোনমতে টিকে আছে ওরা। ওদের জন্যে খাবারের ব্যবস্থা করা না গেলে বসন্ত আসার আগেই না খেয়ে মরে যাবে অনেক মানুষ।'

'সেটা আমার দেখার বিষয় নয়,' বলল অ্যান্ডারসন। 'কেউ যদি নিজের অদূরদর্শিতার কারণে কষ্ট ভোগ করে, তার দায়-দায়িত্ব অন্যের ওপর বর্তায় না।'

'তোমাকে কেউ দায়ী করছে না, মিস্টার অ্যান্ডারসন,' বলল আলমানযো। 'কেউ তোমার কাছে ভিক্ষাও চাইছে না। এলিভেটর পর্যন্ত পৌঁছলে যে দাম হয়, আমরা সেই দামে তোমার গম কিনে নেয়ার প্রস্তাব দিচ্ছি। পরিবহন খরচ আমাদের।'

'বুঝলাম। কিন্তু বিক্রি করার মত গম নেই আমার কাছে। যা আছে, সেটা আমি বেচব না।'

উজ্জ্বল হাসি হেসে ক্যাপ বলল, 'আমরা তোমাকে সবই খুলে বলেছি, মিস্টার অ্যান্ডারসন। তোমার কিছু গম না পেলে না খেয়ে থাকবে শহরের বহু লোক। বেশি দাম দিতেও রাজি আছে তারা। তুমি বলো, কত চাও।'

'তোমাদের কাছ থেকে কোনও সুবিধে আদায় করার চেষ্টা করছি, ভুলেও একথা ভেবো না,' বলল অ্যান্ডারসন। 'আসল কথা আমার বীজ-গম আমি বিক্রি করতে চাই না। ওগুলো আমার আগামী বছরের ফসল। বেচতে চাইলে গত শরতেই বেচে দিতাম।'

'ঠিক আছে, বুশেল প্রতি এক ডলার করে দেব আমরা। বাজার দর থেকে আঠারো সেন্ট বেশি। তার ওপর পরিবহন খরচ আমাদের।'

'আমার বীজ আমি বেচব না,' বলল মিস্টার অ্যান্ডারসন। 'আগামী মরশুমে ফসল ফলাতে হবে আমাকে।'

'আগামী মরশুমে বীজ কিনে নিতে পারবে তুমি,' ধ্যানমগ্ন ভঙ্গিতে বলল আলমানযো। 'বেশিরভাগ মানুষই তাই করবে। তুমি প্রতি বুশেলে আঠারো সেন্ট লাভকে ধর্তব্যের মধ্যে আনছ না, মিস্টার অ্যান্ডারসন।'

'কী করে জানব যে ঠিক সময় মত বীজ এসে পৌঁছবে শহরে? তোমরাই তো বলছ কবে ট্রেন আসে তার ঠিক নেই,' গম্ভীর অ্যান্ডারসন।

জবাব দিল ক্যাপ। 'ঠিক তো কোন কিছুরই নেই, মিস্টার অ্যান্ডারসন। এই বীজ বুনে তুমি ফসল ঘরে তুলতে পারবেই তার কোনও নিশ্চয়তা আছে? ধরো, ক্যাশ টাকা না নিয়ে তুমি সব গম বুনলে জমিতে। শিলাবৃষ্টি হতে পারে, পঙ্গপাল আসতে পারে ঝাঁক বেঁধে, পারে না?'

'তা ঠিক,' মেনে নিল অ্যান্ডারসন।

'একমাত্র পকেটের ক্যাশ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়,' চট করে বলল

আলমানযো।

'না হে,' ধীরে মাথা নাড়ল অ্যান্ডারসন। 'এ গম আমি বেচব না। আরও চল্লিশ একর জমিতে চাষ দেব আমি আগামীবার। আমার নিজেরই লাগবে এগুলো।'

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল আলমানযো। 'ঠিক আছে, যাও, প্রতি বুশেল এক ডলার পঁচিশ সেন্ট। ক্যাশ।' নোটগুলো বের করে টেবিলে রাখল ও।

দ্বিধায় পড়ল অ্যান্ডারসন। চোখ সরিয়ে নিল টাকার ওপর থেকে। ভাবছে।

'সুযোগ এলে তার সদ্ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ,' বলল ক্যাপ।

নিজের অজান্তেই টাকাগুলোর ওপর ফিরে এল অ্যান্ডারসনের দৃষ্টি। চেয়ারের পিছনে হেলান দিয়ে চেষ্টা করছে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে। মাথাটা চুলকে নিয়ে নিচু গলায় বলল, 'কিছু জমিতে অবশ্য জই বোনা যায়।'

চুপ করে থাকল আলমানযো আর ক্যাপ। বুঝতে পারছে হ্যাঁ আর না-র ঠিক মাঝখানে দুলছে এখন লোকটার মন। এখন যে সিদ্ধান্ত নেবে তার থেকে আর নড়বে না। হিসেবি লোক – অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'মনে হচ্ছে এই দামে ষাট বুশেলের মত বিক্রি করা যায়।'

চট করে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আলমানযো আর ক্যাপ।

'চলো, তা হলে তুলে ফেলি স্লেডে,' বলল ক্যাপ। 'যেতে হবে বহুদূর।'

রাতটা থেকে যেতে বলল ওদের অ্যান্ডারসন, কিন্তু ঝড়ে আটকা পড়ে যাওয়ার ভয়ে রাজি হলো না ওরা। তবে ধন্যবাদ জানাতে কসুর করল না।

তিনজন মিলে ঝটপট ছালায় ভরে ফেলল ওরা গম, ভাগাভাগি করে তুলল স্লেডে। তারপর বিদায় নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

ফেরার পথে পালা করে গর্তে পড়তে শুরু করল ঘোড়া দুটো। ওদের গর্ত থেকে তুলে আবার স্লেডে জুতে নিয়ে রওনা হতে সময় লাগছে অনেক। যতই সময় যাচ্ছে, ততই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে আলমানযো, আঁধার হয়ে গেলে শহরে পৌঁছানো মুশকিল হবে। মোটামুটি উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে ওরা। কোথাও পুকুর বা বিল আছে বলে সন্দেহ হলে অনেকদূর ঘুরে তারপর আবার এগোচ্ছে।

ঘোড়া দুটো খুব ধীরে এগোচ্ছে। বারবার গর্তে পড়ে ভয় ধরে গেছে ওদের মনে। তা ছাড়া ত্রিশ বুশেল গমের ওজনও কম না (প্রায় বাইশ মন)। দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ছে ওরা, বিশ্রাম দিতে হচ্ছে।

হিম শীতল বাতাস ঠেলে এগোচ্ছে ওরা দুজন, মাঝে মাঝেই দুহাতে বুক চাপড়াচ্ছে, পা ঠুকছে শক্ত বরফের ওপর। কিন্তু হাত-পায়ের অবশ ভাব তেমন দূর হচ্ছে না।

'এই যে, ওয়াইল্ডার,' ডাকল ক্যাপ, 'আমরা একটু বেশি সরাসরি উত্তরে চলেছি না?'

'কী করে বলি?' জবাব দিল আলমানযো। 'মনে হয়, আর কিছুদূর গেলে ওই উঁচু জায়গা থেকে কটনউড গাছটা দেখা যাবে।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' বলল ক্যাপ।

কিন্তু পরপর বেশ কয়েকটা ঢাল বেয়ে উঠেও দেখা গেল না গাছটা। সামনে

শুধু ঢেউ খেলানো তুষার আর তুষার। সূর্যটা যখন লাল হয়ে ডুবে যাচ্ছে তখন উত্তর-পুব দিকে দেখা গেল কটনউডের মাথা, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম দিগন্তে আবার দেখা দিয়েছে মেঘ। আসছে তুষার-ঝড়!

'আসিতেছে!' বলল আলমানযো।

'হ্যাঁ, আমিও দেখছি কিছুক্ষণ ধরে। এবার একটু তাড়াহুড়ো করতে হয়,' জবাব দিল ক্যাপ।

তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে প্রথমে গর্তে পড়ল প্রিন্স, ওটাকে তুলে রওনা হতে না হতেই পড়ল ক্যাপের বাকস্কিন। দুজন মিলে অনেক সাধ্য সাধনা করে তোলা হলো বাকস্কিনটাকে। ততক্ষণে গাঢ় হয়ে এসেছে আঁধার। আর উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এক-এক করে উজ্জ্বল তারাগুলোকে নিভিয়ে দিতে দিতে এগিয়ে আসছে তুষার-ঝড়।

ক্লান্ত ঘোড়াদুটোকে অনেক সাধাসাধি করেও আর বেশি জোরে ছুটানো যাচ্ছে না। কোনমতে বড় বিলটার সরু জায়গাটা দিয়ে নিরাপদেই পেরিয়ে এল ওরা। এখন শুধু আবছাভাবে সামনে কয়েক গজ দেখতে পাচ্ছে ওরা। একটা তারা নেই, যা দেখে আন্দাজ করবে কোন্‌দিকে এগোচ্ছে।

সন্ধের দিকে ঘরে ফিরল বাবা। গম্ভীর।

'আবার আসছে ঝড়,' বলল বাবা কোট খুলতে খুলতে।

'ওরা ফেরেনি?' জিজ্ঞেস করল মা।

'না।'

আর একটি কথা বলল না কেউ। সবাই অপেক্ষায় আছে, কখন ঝড়ের ধাক্কায় কেঁপে উঠবে বাড়িটা, তারপর শুরু হয়ে যাবে বাতাসের করুণ বিলাপ। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ল তুফান।

সেই রাতে লেপের নীচে আস্তে করে ডাকল মেরি, 'লরা!'

'কী?'

'ওদের জন্যে প্রার্থনা করেছ?'

'করেছি,' জবাব দিল লরা। 'তোমার মনে হয়েছে করা উচিত?'

'হ্যাঁ। নিজেদের জন্যে না। গম পেলে বেঁচে যাবে সবাই, সেজন্যেও না। আমি শুধু বলেছি, প্রভু যেন ওদের জীবন রক্ষা করেন।'

চারদিন ধরে চলল তুমুল ঝড় আর তুষারপাত। ইতোমধ্যে শেষ হয়ে এসেছে গম, অবশিষ্ট গম দিয়ে আজ ছোট্ট একটা পাউরুটি তৈরি করেছে মা। চতুর্থ দিন সন্ধের দিকে থামল ঝড়। গায়ে কোট চড়াল বাবা বাইরে যাবে বলে।

## নয়

ওরা বুঝতে পারছে, শহরের কাছাকাছি এসে পড়েছে। কিন্তু অবাক হলো একটা আলোও চোখে পড়ছে না বলে। একবার ওরা যদি শহরটাকে পাশ কাটিয়ে যায়,

ঝড় এসে পড়লে আর কোনদিনই পথ চিনে পৌঁছতে পারবে না সেখানে। তুষার শুরু হয়ে গেলে দশ গজ দূরের কিছুও দেখা যায় না।

'এতক্ষণে তো আমাদের পৌঁছে যাবার কথা, তাই না?' বলে উঠল ক্যাপ।

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' জবাব দিল আলমানযো। 'কিন্তু আশ্চর্য! একটা আলো চোখে পড়ছে না। ভুল পথে যাচ্ছি নাকি?'

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে আলমানযোর মনে হলো সামান্য একটা আলোর আভাস যেন চোখে পড়ল ওর। বুঝতে পারল, একটা দরজা খুলেই বন্ধ হয়ে গেল। হাঁক ছাড়ল, 'এইদিকে, ক্যাপ! আমরা পশ্চিমে সরে গেছি!'

সোজা উত্তরে ছুটল এবার ওরা। আবার আলোর ঝলকানি দেখতে পেল আলমানযো। বুঝল, ঝড়ের আগেই স্টোর থেকে পালাচ্ছে লোকজন। ওরা যখন লোফটাসের স্টোরের সামনে পৌঁছল, ঠিক তখনই প্রবল বিক্রমে ঝাপটা মারল ঝড়, সেই সঙ্গে তুষার।

'স্লেড থাক,' বলল আলমানযো ক্যাপকে। 'ঘোড়াটা খুলে নিয়ে ভাগো!'

ঘোড়া খুলে নিয়ে একলাফে ওটার পিঠে উঠে বসল ক্যাপ, মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল বাড়ির পথে।

স্টোরে ঢুকল আলমানযো। গরম হয়ে আছে স্টোরটা। মিস্টার লোফটাস ছাড়া আর কেউ নেই। ওকে দেখে বলে উঠলেন লোফটাস, 'ফিরেছ তা হলে! পেয়েছিলে সেই চাষীকে?'

'ষাট বুশেল কিনে এনেছি। ওগুলো ভেতরে এনে রাখতে হবে। হাত লাগাবেন, প্লিজ?'

গম ভরা ছালাগুলো দেয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে রাখল ওরা। বাইরে প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে ঝড়ের তাণ্ডব। কোনমতে মিস্টার লোফটাসের হাতে গমের রসিদ আর বাকি টাকা গুঁজে দিয়ে আলমানযো বলল, 'আপনি আমাকে আশি ডলার দিয়েছিলেন, বেঁচেছে এই পাঁচ ডলার।'

'অ্যাঁ!' তাজ্জব হয়ে গেলেন মিস্টার লোফটাস, 'বুশেল প্রতি সোয়া ডলার! এর কমে আর পারলে না?'

বিরক্ত হলো আলমানযো। বলল, 'আপনার কাছে খুব বেশি মনে হলে যখন বলবেন, এই দামে আমি কিনে নেব।'

'না, না। সে-কথা বলছি না,' বললেন মিস্টার লোফটাস। 'পরিবহনের জন্যে কত পাওনা হলো তোমাদের?'

'এক পয়সাও না,' বলে বেরিয়ে গেল আলমানযো।

ঝড়ের মধ্যেও পথ চিনে ফিরে এল ও সীড-স্টোরের সামনে। আস্তাবলে ঢুকিয়ে প্রথমেই প্রিন্সকে দানাপানি খাওয়াল, তারপর নিজের কষ্ট উপেক্ষা করে ওর সারা গা ভালমত ব্রাশ করে দিল। তারপর একটা বালতিতে করে তুষার নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। পা দুটোতে প্রাণ ফিরে পেতে হলে ওগুলো আচ্ছামত ডলতে হবে এই তুষার দিয়ে।

জুতো মোজা খোলার পর ওর পায়ের অবস্থা দেখে আঁৎকে উঠল রয়াল। রক্তশূন্য অবশ হয়ে যাওয়া পা দুটোয় তুষার ডলতে শুরু করল সে আলমানযোর

পাশে হাঁটু গেড়ে বসে। যতক্ষণ না রক্ত চলাচল শুরু হওয়ায় ব্যথায় ককিয়ে উঠল আলমানযো, ততক্ষণ একনাগাড়ে ডলেই চলল। ব্যথা একটু কমতেই ঘুমে ঢলে পড়ল আলমানযো।

যে কয়দিন তুষার-ঝড় চলল, সে কয়দিনের বিশ্রামে ফোলা পা দুটো প্রায় আগের আয়তনে ফিরে এল, ফলে ঝড়টা থামলে নিজের বুটজোড়া পায়ে গলিয়ে রাস্তায় বেরোতে পারল আলমানযো।

রাস্তায় বেরিয়েই দেখল ফুলারের হার্ডওয়্যার স্টোরের সামনে অনেক লোকের ভিড়। উত্তেজিত কণ্ঠে কী সব বলছে।

'কী খবর? কীসের গোলমাল?' জিজ্ঞেস করল আলমানযো কাছে গিয়ে।

ওর গলার আওয়াজ পেয়ে পিছন ফিরলেন মিস্টার হারথর্ন। বললেন, 'এই যে, আলমানযো, গম বয়ে আনার জন্যে কি তুমি কোন টাকা নিয়েছ লোফটাসের কাছ থেকে? ক্যাপ বলছে ও নেয়নি। তুমি নিয়েছিলে?'

আলমানযোকে দেখে হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ক্যাপের মুখটা। বলল, 'হ্যাল্লো, ওয়াইল্ডার! নিলে একেবারে চামড়া ছিলে নিয়ো। আমি ওই জোঁকটাকে বলে ফেলেছি, এক পয়সাও দিতে হবে না। আগে জানলে একেবারে ছিলে ফেলতাম!'

'ব্যাপারটা কী বলো তো?' অবাক হয়ে গেল আলমানযো। 'আমিও তো ওই একই কথা বলে ফেলেছি–আমাকে কিছু দিতে হবে না। কেন, আমরা টাকার জন্যে গিয়েছিলাম একথা বলছে নাকি কেউ?'

জেরাল্ড ফুলার বললেন, 'এক বুশেলের দাম চাইছে লোফটাস তিন ডলার!'

এবার সবাই একসঙ্গে হাউ-মাউ শুরু করে দিল। স্টোভের পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল বাবা। লম্বা, শীর্ণদেহ, উঁচু হয়ে উঠেছে চোয়ালের হাড়–জ্বলজ্বল করছে নীল দুই চোখ।

'এখানে হল্লা করে কোন লাভ হচ্ছে না,' বলল বাবা। 'তারচেয়ে চলো, সবাই মিলে গিয়ে লোফটাসকে বোঝাই।'

'ঠিক বলেছ!' লাফিয়ে উঠল একজন। 'চলো সবাই, ওই গম আমরা কেড়ে নেব!'

'বোঝানোর কথা বলেছি আমি,' কঠোর গলায় বলল বাবা। 'আমি যুক্তি আর বিচার-বিবেচনার কথা বলেছি। কারও জিনিস লুট করার কথা নয়।'

'তুমি তা বলতে পার,' একজন চেঁচিয়ে বলল। 'কিন্তু আমি আমার বাচ্চাদের মুখে খাবার তুলে দেয়ার কথা বলছি। গম ছাড়া বাড়ি ফিরতে পারব না আমি! তোমরা পারবে?'

'না, না!' কয়েকজন সমর্থন দিল ওকে।

কথা বলে উঠল ক্যাপ। 'ওয়াইল্ডার আর আমার দুয়েকটা কথা বলার আছে। গম নিয়ে এসেছি আমরা, ঠিক। তবে এখানে গোলমাল পাকানোর জন্যে গম আনিনি আমরা।'

'ঠিক বলেছ,' বললেন জেরাল্ড ফুলার। সবার ওপর চোখ বুলালেন। 'শহরে কোনরকম গোলমাল চাই না আমরা।'

'মাথা গরম করবার কী আছে, আমি বুঝতে পারছি না,' আলমানযো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাধা দিল একজন।

'হ্যাঁ, প্রচুর খাবার মজুদ আছে তো তোমার, তাই বুঝতে পারছ না। তোমার বা ফুলারের যথেষ্ট আছে, খিদের কষ্ট কী বুঝবে তোমরা? তবে আমি বলে দিচ্ছি, যেমন করে হোক, গম না নিয়ে আমি...'

'আপনার ঘরে কী পরিমাণ খাবার আছে, মিস্টার ইঙ্গলস?' লোকটাকে বাধা দিয়ে কথা বলে উঠল ক্যাপ গারল্যান্ড।

'এক দানাও নেই,' বলল বাবা। 'গতকাল কফি মিলে গুঁড়ো করেছি আমরা আমাদের শেষ গম, আজ সকালে খেয়েছি সে রুটি।'

থমকে গেল সবাই বাবার স্বীকারোক্তি শুনে। চট্ করে আলমানযো বলল, 'শুনলে তোমরা। ব্যাপারটা মিস্টার ইঙ্গলসকেই সামলাতে দাও না কেন?'

'ঠিক আছে, তোমরা রাজি থাকলে নেতৃত্ব দিতে আমার আপত্তি নেই,' বলল বাবা। সবাই রাজি হয়ে গেল। 'বেশ, তা হলে চলো সবাই, দেখি কী বলার আছে লোফটাসের।'

তুষার ছাওয়া রাস্তা ধরে সবাই চলল মিস্টার লোফটাসের স্টোরের দিকে। ওদের আসতে দেখে কাউন্টারের পেছনে চলে গেলেন লোফটাস। ভেতরে ঢুকে দেখা গেল গমের বস্তা পিছনের ঘরে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

বাবা তাঁকে বলল, গমের দাম মাত্রাতিরিক্ত ধরা হয়েছে।

'ব্যবসাটা আমার,' বললেন মিস্টার লোফটাস। 'আমার গমের দাম আমি কত ধরব সেটা আমার ব্যাপার। অনেক বেশি দামে কিনতে হয়েছে ওই গম।'

'শুনলাম, বুশেল প্রতি সোয়া ডলার,' বলল বাবা।

'আমি কত নেব সেটা আমার ব্যাপার!' গোঁ ধরলেন মিস্টার লোফটাস।

'একটু পরেই টের পাবে এটা কার ব্যাপার!' বলল একজন।

'আমার সম্পত্তি একবার ছুঁয়ে দেখো না, আইনের আশ্রয় নেব আমি!' শাসালেন মিস্টার লোফটাস। অনেকেই বাঁকা হাসি হাসল এই কথা শুনে, কিন্তু দমলেন না তিনি। দুম করে ডেস্কের ওপর একটা কিল মেরে বললেন, 'আমার গম, যা খুশি দাম ধরার অধিকার আমার আছে।'

'তা ঠিক, লোফটাস, অধিকার আছে তোমার,' বলল বাবা। 'দেশটা স্বাধীন, নিজের সম্পদ নিয়ে যা খুশি করবার অধিকার রয়েছে সবার।' জনতার দিকে ফিরল বাবা, 'তোমরা সবাই জান, কথাটা সত্য।' আবার চাইল লোফটাসের দিকে, 'কিন্তু, লোফটাস, তুমিও ভুলো না, আমরাও সবাই মুক্ত-স্বাধীন। এই শীত থাকবে না চিরকাল, মনে হয় তার পরেও তোমার ব্যবসা করার ইচ্ছে আছে?'

'আমাকে হুমকি দিচ্ছ তুমি?' ভুরু কুঁচকালেন মিস্টার লোফটাস।

'তার প্রয়োজন পড়ে না,' বলল বাবা শান্ত গলায়। 'এটা তো সোজা কথা। যা খুশি দাম ধরার অধিকার যদি তুমি প্রয়োগ করো, আমরাও আমাদের অধিকার প্রয়োগ করব যেমন খুশি। আজ আমাদের ওপর একহাত নেবে তুমি, কারণ, তুমি বলছ, এটা তোমার ব্যবসা। কিন্তু তোমার ব্যবসাটা নির্ভর করে খদ্দেরের ওপর, অর্থাৎ, আমাদের ওপর। এখন হয়তো খেয়াল করছ না, কিন্তু আগামী গ্রীষ্মে ঠিকই

টের পেয়ে যাবে।'

'ঠিক তাই,' বললেন জেরাল্ড ফুলার। 'মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্কের মাধ্যমেই চালাতে হয় ব্যবসা, তা নইলে টেকা যায় না – অন্তত এদেশে নয়।'

জটলার মধ্যে থেকে রাগী গলা শোনা গেল, 'আমরা এখানে তোষামোদ করতে আসিনি। গম কোথায়?'

'তুমি কিন্তু বোকামি করছ, লোফটাস,' বললেন মিস্টার হারথর্ন।

'টাকা তোমার খাটল কোথায়?' বলল বাবা। 'তা ছাড়া ছেলেরা এগুলো বয়ে আনার জন্যে একটা পয়সাও নেয়নি। ন্যায্য লাভে বিক্রি করো, দেখবে এক ঘণ্টার মধ্যে লাভসহ ফিরে এসেছে তোমার মূলধন।'

'কাকে বলবে তুমি ন্যায্য লাভ?' জানতে চাইলেন মিস্টার লোফটাস। 'ব্যবসার নীতিই হচ্ছে: যতটা সম্ভব কম দামে কিনে যতটা সম্ভব বেশি দামে বিক্রি করা–অন্তত আমি তো তাই জানি।'

'আর আমি বুঝি: সময়ে-অসময়ে মানুষের সুবিধে-অসুবিধে দেখা, প্রয়োজনে তাদের পাশে দাঁড়ানোই একজন ভাল ব্যবসায়ীর নীতি হওয়া উচিত,' বললেন মিস্টার ফুলার।

'তোমার এই দামে আমরা আপত্তি করতাম না,' বলল বাবা, 'যদি ওয়াইল্ডার আর গারল্যান্ড বিপদ মাথায় করে এগুলো বয়ে আনার জন্যে তোমার কাছ থেকে টাকা নিত।'

'কে বারণ করেছিল?' মিস্টার লোফটাস ফিরলেন আলমানযো আর ক্যাপের দিকে, 'তোমাদেরকে বয়ে আনার খরচ দিতে চাইনি আমি?'

হাসিখুশি ভাবটা দূর হয়ে গেল ক্যাপের চেহারা থেকে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'আপনার নোংরা টাকার আমাদের প্রয়োজন নেই, মিস্টার লোফটাস! ক্ষুধার্ত মানুষের চামড়া ছিলে লাভ করবেন আপনি, সেজন্যে ওগুলো আনতে যাইনি আমরা।'

'ঠিক!' বলল আলমানযো। 'আপনার জন্যে যাইনি আমরা, মিস্টার লোফটাস, গিয়েছি শহরবাসীর জন্যে। আমাদের মজুরী দেয়ার মত টাকা আপনার ক্যাশবাক্সে নেই।'

ক্যাপ আর আলমানযোর মুখ থেকে চোখ সরিয়ে উপস্থিত আর সবার মুখের ওপর চোখ বুলালেন মিস্টার লোফটাস। মুখটা একবার খুলে বন্ধ করে ফেললেন। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে। কেনা দামেই বেচব আমি এই গম–বুশেল প্রতি সোয়া ডলার।'

'তোমাকে ন্যায্য লাভ দিতে তো আমাদের আপত্তি নেই,' বলল বাবা।

মাথা নাড়লেন মিস্টার লোফটাস। 'না। কেনা দামেই বেচব আমি ওগুলো।'

এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে ব্যাপারটা মীমাংসা হলো যে সবাই কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। তারপর বাবা বলল, 'এবার আমরা সবাই মিলে যার যতটা প্রয়োজন তার ভিত্তিতে ভাগাভাগি করে নিতে পারি গমগুলো।'

তাই করল সবাই। দেখা গেল প্রতিটা পরিবারের আট-দশ সপ্তাহ চলার মত গম আছে ওখানে। কেউ কম নিল, কেউ বেশি। আলমানযো নিলই না। ক্যাপ

গারল্যান্ড নিল আধ বুশেল। বাবা নিল দুই বুশেল।

ধুপ করে ভারি বস্তা মেঝেতে পড়তেই চমকে উঠল রান্নাঘরের সবাই।

ফিরে এসেছে বাবা। বলল, 'ছেলে দুটো সেদিনই গম নিয়ে ফিরে এসেছিল, ক্যারোলিন। এই যে ওদের আনা গম।'

# দশ

মার্চ গিয়ে এপ্রিল এল, কিন্তু তুষার-ঝড়ের বিরাম নেই। আকাশ পরিষ্কার হলেই বাবা ছোটে খড় আনার জন্য, যতটা সম্ভব এনে রাখে। সবাই মিলে আঁটি বাঁধে। সারাদিন খড়-খড় শব্দে চলে কফি মিল।

'আর কতটা খড় আছে, চার্লস?' জানতে চাইল মা।

'অনেক, অনেক!' বলল বাবা, 'ভাগ্যিস খড় গাদা করার সময় সাহায্য করেছিল আমাদের ছোট্ট আধ-বোতল। তা নইলে আগেই শেষ হয়ে যেত সব খড়। এখন যা আছে, তাতে অনায়াসে কেটে যাবে এই লম্বা শীতকাল।'

আরও বেশ অনেকদিন জাঁকিয়ে বসে থাকল শীত, তারপর একদিন হঠাৎ করেই বইতে শুরু করল 'চিনুক' হাওয়া, এসে পড়ল বসন্তকাল। অবশেষে বিদায় নিল ঝড়-ঝঞ্ঝা আর তুষার। একদিনের মধ্যে গলে দূর হয়ে গেল জমাট বরফ। হাসি ফুটল সবার মুখে। আর দেরি নেই, এইবার এসে পড়বে ট্রেন।

মাঠ-ঘাটে পানি জমে আছে, তাই রেললাইন ধরে হেঁটে চলে এলেন মিস্টার বোস্ট। শহরের সবার খবরাখবর নিয়ে গেলেন। বহুদিন পর মেরি পাওয়ার এল, ও আর লরা মেরিকে নিয়ে শহরের পশ্চিমের মাঠ থেকে বেড়িয়ে এল। অনেক উঁচুতে বুনো হাঁসের ডাক শোনা যাচ্ছে, ঝাঁকের পর ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে উত্তরে। শহরের সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ট্রেনের জন্য।

মে মাসের শুরুতে এল ওদের জন্য পাঠানো সেই ক্রিসমাস ব্যারেল। সবার জন্য জামা-কাপড় আছে ওর মধ্যে, আর আছে রেভারেন্ড অ্যালডেনের পাঠানো সেই ক্রিসমাস টার্কি। ঠিক হলো, মে মাসেই ক্রিসমাস ডিনার খাওয়া হবে, দাওয়াত দেয়া হবে মিস্টার ও মিসেস বোস্টকে।

নিয়মিত ট্রেন আসায় সব ধরনের রসদ পৌঁছে গেছে শহরে, কোনকিছুরই অভাব নেই আর। বাবা কদিন খেটে সারিয়ে ফেলল হোমস্টেডের ঘর-দুয়ার।

এবার ফিরে যাবে ওরা ওদের খামারে।

# লিটল্ টাউন অন দ্য প্রেয়ারি

## এক

বাবা তার নতুন লাঙল দিয়ে একরের পর একর জমি চষে ফেলছে। প্রেয়ারির মাটিতে ঘাসের শিকড় এক মহা সমস্যা। এ-লাঙল চাষের সঙ্গে সঙ্গে শিকড়গুলোকে কেটে কুচি কুচি করে দেয়ার জন্য বিশেষ ভাবে তৈরি। নতুন খেলনা পেয়ে বাবা মহানন্দে কাজ করছে। এবার অনেক বেশি জমিতে ফসল বুনবে। গতবছর যতটা জমিতে লাঙল দিতে পেরেছিল, সেখানে এবার ভুট্টার দানা বুনেছে বাবা।

এদিকে মা ব্যস্ত ঘর-দুয়ার ধোয়া-মোছার পর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার কাজে। লরা সাহায্য করছে মাকে। বিছানার চাদর আর জানালার পর্দা ধুয়ে ইস্তিরি করা সারা, এবার লেপ-তোশক-বালিশ সব রোদে শুকিয়ে ঝরঝরে করে আবার বিছানো হচ্ছে। বেশ গরম পড়েছে। এখন কল্পনাও করা যায় না এই অল্প কদিন আগেই কী প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কাবু হয়ে ছিল ওরা।

'নাহ্, আবার বুনতে হবে আমার ভুট্টা,' একদিন মাঠ থেকে ফিরে বলল বাবা।

'কেন, বাবা?' জিজ্ঞেস করল লরা।

'গোফার। অসংখ্য গোফার জুটেছে মাঠে, মাটি খুঁড়ে বের করে আনছে দানা, সোজা হয়ে বসে দুইহাতে ধরে মজা করে কুটুর-মুটুর খাচ্ছে ওগুলো। যা বুনেছিলাম তার অর্ধেক প্রায় শেষ করে এনেছে। ব্ল্যাক সুসানের মত একটা বেড়ালের দরকার ছিল এখন।'

'এখানেও,' বলল মা। 'ইঁদুরের অত্যাচারে অস্থির হয়ে গেলাম! কাবার্ডের মধ্যেও কোনকিছু খোলা রাখা যায় না। একটা বেড়াল পাওয়া যায় না কোথাও, চার্লস?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল বাবা। 'গোটা এলাকায় একটাও বেড়াল নেই। শহরের স্টোরকীপাররাও পাগল হয়ে উঠেছে ইঁদুরের জ্বালায়।'

সেই রাতেই ঘুম থেকে চেঁচিয়ে জেগে উঠল বাবা। কে নাকি তার চুল ছাঁটছিল। প্রথমে স্বপ্ন মনে হলেও বাবার মাথায় হাত দিয়ে অবাক হয়ে গেল মা। 'আরে! এখানের চুল গেল কোথায়?'

'হাত দিয়েই কী একটা যেন ধরলাম,' বাবা বলল।

'কী, কী সেটা?'

'মনে হয় একটা ইঁদুর।'

'কোথায় ওটা!' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল মা।

'ছুঁড়ে মারলাম কোনদিকে জানি।'

আবার হাত দিল মা বাবার মাথায়। 'দেখো দেখি! এতটা জায়গা সাফ করে

দিয়েছে। ইঁদুরেরই কাজ। নিশ্চয়ই বাসা বানাবার জন্যে কেটে নিচ্ছিল চুলগুলো।'

সকালে উঠে সত্যিই একটা মরা ইঁদুর পাওয়া গেল দেয়ালের ধারে। নাস্তার টেবিলে বসে সবাই দেখল বেশ বড়সড় একটা টাক দেখা যাচ্ছে বাবার মাথায়।

টাকে বাবার তেমন আপত্তি নেই, কিন্তু আজই কাউন্টি কমিশনারদের একটা মীটিং আছে। এলাকায় জনবসতি ঘন হচ্ছে বলে একটা কাউন্টি গঠনের প্রয়োজন অনুভব করছে সবাই, মীটিং ডাকা হয়েছে মিস্টার হোয়াইটিঙের হোমস্টেড ক্লেইমে, বাবাকে যেতেই হবে। ওখানে মিসেস হোয়াইটিংও থাকবেন, কাজেই মাথা থেকে টুপি বাবাকে খুলতেই হবে। অসুবিধেটা এখানেই।

'তাতে কী,' মা সান্ত্বনা দিল। 'ওদেরকে বুঝিয়ে বললেই হবে। ওদের কী আর ইঁদুর নেই?'

'গুরুত্বপূর্ণ মীটিং, এসব গল্প শোনাবার সময় পাওয়া যাবে না,' বলল বাবা। 'তারচেয়ে চুপ করে থাকাই ভাল, ওরা বুঝে নিক, এই ভাবেই চুল ছেঁটে দেয় আমার স্ত্রী।'

রেগে গেল মা। 'চার্লস, তুমি ওদের      বাবা ঠাট্টা করছে বুঝতে পেরে থেমে গিয়ে হাসল।

যাবার আগে বলে গেল বাবা, দুপুরে খেতে আসতে পারবে না। মীটিং কতক্ষণ চলে ঠিক নেই।

সন্ধের দিকে ফিরল বাবা। আস্তাবলে গাড়ি আর ঘোড়া রেখেই ঘরে এসে ঢুকল।

'এই যে, মেয়েরা! ক্যারোলিন!' হাঁক ছাড়ল বাবা দরাজ গলায়। 'বলো দেখি কী এনেছি?' বাবার একটা হাত পকেটে, ঝিকমিক করছে দু-চোখ।

'লজেন্স!' একই সঙ্গে বলে উঠল ক্যারি আর গ্রেস।

'তার চেয়েও ভাল কিছু!' বলল বাবা।

'চিঠি?' জিজ্ঞেস করল মা।

'খবরের কাগজ,' বলল মেরি। 'হয়তো "দি অ্যাডভান্স"।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল বাবা। লরা কিছু বলছে না দেখে হাতটা বের করতে শুরু করল পকেট থেকে। 'কেউ পারলে না তো? ঠিক আছে, প্রথমে মেরির হাতে দিচ্ছি।' পকেট থেকে হাতটা বেরিয়ে আসতেই সবাই দেখল, হাতের তালুতে বসে আছে নীল আর সাদা রঙের ছোট্ট একটা বেড়ালছানা।

হাতে নিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল মেরি বাচ্চাটার নরম লোম, ছোট্ট কান। বলল, 'ইশ্‌শ্‌! কী সুন্দর ছোট্ট বেড়ালছানা!'

অবাক হয়ে দেখছে ওটাকে সবাই। চোখ ফোটেনি এখনও। গোলাপী ঠোঁট ফাঁক করে নীরবে 'মিউ' উচ্চারণ করল একবার।

'বেশি ছোট,' বলল বাবা। 'এখুনি ওর মায়ের কাছ থেকে সরানো ঠিক হয়নি। কিন্তু নিয়ে নিলাম পঞ্চাশ সেন্ট দিয়ে, আর কেউ একে কিনে নেয়ার আগেই।'

'প-ঞ্চা-শ সেন্ট!' অবাক হলো লরা। 'এই বেড়ালছানার দাম?'

'হ্যাঁ। পাঁচটা ছিল। সব বিক্রি হয়ে গেছে।'

'ঠিকই করেছ, চার্লস,' বলল মা। 'এ-বাড়িতে একটা বিড়াল খুবই দরকার।'

'এত ছোট বাচ্চা…আমরা পেলে বড় করতে পারব?' জানতে চাইল মেরি।

'খুব পারব,' জবাব দিল মা। 'বার বার খাওয়াতে হবে, আর সাবধানে চোখ মুছিয়ে দিতে হবে। লরা, বাতিল কাপড়ের পোঁটলা থেকে বেছে বেছে সবচেয়ে নরম দেখে কয়েকটা গরম কাপড়ের টুকরো নিয়ে এসো তো। আর পারলে ছোট একটা বাক্সমত কিছু।'

একটা পেস্টবোর্ডের বাক্সে সুন্দর একটা নরম বিছানা পেতে আনল লরা। মা ততক্ষণে খানিকটা দুধ গরম করে ফেলেছে। বাচ্চাটাকে হাতে নিয়ে চামচ দিয়ে এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে দুধ খাওয়াল মা, তারপর শুইয়ে দিল ওর নতুন ঘরে।

দ্রুত বাড়ছে শহর। নতুন নতুন সেটলার আসছে, বাড়ি বানাচ্ছে শহরে। ভাল কাঠ-মিস্ত্রী নেই, তাই প্রচুর কাজ পেয়ে গেল বাবা। ফসল বোনা হয়ে গেছে, তাই রোজ সকালে গরু-ঘোড়াদের খাইয়ে নিজের ডিনার টিফিন-বাটিতে নিয়ে বাবা চলে যায় শহরে। ফিরে আসে সন্ধ্যায়। প্রতি সপ্তাহে পনেরো ডলার উপার্জন করছে বাবা।

সবাই খুশি। এবার মেরির কলেজে ভর্তি হওয়ার একটা ব্যবস্থা হবে। বাবার এই বাড়তি রোজগার অবশ্য খুব বেশিদিন থাকবে না, শহরে বাড়ি তৈরির হিড়িক শেষ হলেই শেষ। মেরির কলেজের খরচ চালিয়ে যেতে হলে লরাকে স্কুল-টীচার হতেই হবে, মন দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে।

ইতোমধ্যে হোমস্টেডের কুটিরে আরও একটা ঘর বাড়িয়েছে বাবা। কলকল করে বেড়ে উঠছে মাঠের ফসল। এবার একটা মাদি শুয়োর আর কয়েকটা মোরগ-মুরগি পুষতে পারলে মাংস আর কিনতে হবে না ওদের। সবজি বাগানের ফলন দেখে বোঝা যাচ্ছে, নিজেরা যত খুশি খাওয়ার পরও যথেষ্ট থাকবে দান-খয়রাত বা বিক্রির জন্য। সচ্ছলতা এখন খুব দূরের কিছু নয়।

রোজ শহর থেকে ফিরে বাবা নতুন নতুন ঘটনার গল্প শোনায়। একদিন বলল মিস্টার বোস্টের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি খবর দিয়েছেন মিসেস বোস্ট নাকি মার জন্য এক সেট মুরগির বাচ্চা তুলছেন, বাচ্চাগুলো খুঁটে খাওয়া শিখে গেলেই পাঠিয়ে দেবেন এখানে।

খবর শুনে মা তো মহা খুশি। বলল, 'আমার একবছরের কাজ এগিয়ে যাবে তা হলে। মুরগি কিনে তার ডিম থেকে বাচ্চা ফুটিয়ে বড় করা অনেক সময়ের ব্যাপার।'

একদিন বাবাকে শোনাবার মত চমৎকার একটা গল্প তৈরি হয়ে গেল ওদের হোমস্টেডে। মা বিছানা ঠিক করছে, লরা আর ক্যারি বাসন ধুচ্ছে, এমন সময়ে আর্ত চিৎকার দিয়ে উঠল বেড়ালছানাটা। চোখ ফুটে গেছে ওটার, সারা মেঝেতে দৌড়ে বেড়ায় এখন গ্রেসের পিছু পিছু রশি-বাঁধা কাগজের টুকরো ধরবার জন্য।

'গ্রেস, সাবধান!' বলল মেরি। 'কিটিকে ব্যথা দিয়ো না।'

'আমি ব্যথা দিচ্ছি না,' জবাব দিল গ্রেস।

এবার আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল কিটি।

'অ্যাই, গ্রেস!' এবার বকা দিল মা। 'কী হচ্ছে? ওর লেজে পা দিয়েছ?'

'না, মা,' জবাব দিল গ্রেস।

এবার ওটা এমনই তীক্ষ্ণ চিৎকার দিল যে ডিশ ধোয়ার কাজ ফেলে ঘুরে দাঁড়াল লরা। 'থামবে তুমি, গ্রেস? কী করছ ওটাকে?'

কাঁদো কাঁদো গলায় বলল গ্রেস, 'আমি কিচ্ছু করছি না। ওকে তো দেখছিই না কোথাও!'

খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ! কোথাও নেই ওটা। ক্যারি দেখছে চুলোর পিছনে, কাঠ রাখার বাক্সের ভিতর। গ্রেস হামাগুড়ি দিয়ে টেবিলক্লথের নীচে ঢুকে দেখছে টেবিলের তলা। মা দেখছে শো-কেসের নীচের তাক। লরা খুঁজে দেখছে বেডরুমে।

আবার একটা মরণ-চিৎকার দিতেই পেয়ে গেল ওরা ওটাকে। খোলা কপাটের আড়ালে আবছা আঁধারে বড়সড় একটা ইঁদুরকে কামড়ে ধরে আছে ছোট্ট কিটি। কায়দা মত ধরতে পারেনি, তাই ঘাড় ফিরিয়ে কামড় দিচ্ছে ওটা কিটিকে। কামড় খেলেই রাম-চিৎকার দিচ্ছে কিটি, কিন্তু তাই বলে ছাড়ছে না ইঁদুরটাকে।

ঝাড়ুটা হাতে নিল মা। 'লরা, কিটিকে তুলে নাও। আমি ইঁদুরটার ব্যবস্থা করছি।'

হাত বাড়াল ঠিকই, কিন্তু লরা বলল, 'মা, ও তো হেরে যায়নি এখনও। ওর যুদ্ধটা পণ্ড করব?'

এমনি সময় কামড় ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কিটি ইঁদুরটার ওপর, সামনের দুই পা দিয়ে ঠেসে ধরল ওটাকে। পরমুহূর্তে আবার কামড় খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, তারপর ছোট ছোট দাঁত দিয়ে ঘাড় কামড়ে ধরল ওটার। চিঁ-চিঁ করে ককিয়ে উঠেই নেতিয়ে পড়ল ইঁদুরটা।

'বাপ-রে! কী দেখাল এতটুকু বিড়ালের বাচ্চা!' বলল মা। 'বড় হলে আরও না জানি কী দেখাবে!'

জখমগুলো ধুয়ে ওকে গরম দুধ খাওয়াল মা, ক্যারি আর গ্রেস হাত বুলিয়ে দিল ওর মাথায়, তারপর ওর নরম বিছানায় শুইয়ে দিতেই ছোট্ট একটা হাই তুলে ঘুমিয়ে পড়ল কিটি।

সব শুনে বাবা বলল, 'এমন কাণ্ড জীবনে শুনিনি! এই কিটি এ-মুল্লুকের সেরা শিকারী হবে বলে মনে হচ্ছে!'

# দুই

মিস্টার ক্ল্যান্সি নতুন দোকান খুলেছেন শহরে। তাঁর শাশুড়ীও পশ্চিমে এসেছেন জামাইয়ের সঙ্গে। তিনি শার্ট সেলাই করছেন। অনেকেই মিস্টার ক্ল্যান্সির দোকান থেকে কাপড় কিনে তাঁর শাশুড়ী মিসেস হোয়াইটকে দিয়ে সেলাই করিয়ে নিচ্ছে। সেলাই মেশিন দিয়ে ঝটপট শার্ট সেলাই করে ফেলছেন মহিলা, কিন্তু এত বেশি

শার্টের অর্ডার পেয়েছেন যে বোতামের ঘর, আস্তীন, কলার—এসব সেলাই করবার সময় পাচ্ছেন না।

তাই তাঁর সাহায্যের জন্য একজন সহকারী দরকার, খবর এনেছে বাবা। ভাল সেলাই করতে পারলে সে দৈনিক পঁচিশ সেন্ট করে পাবে, সেই সঙ্গে দুপুরের খাবার। লরা নিতে পারে কাজটা।

চট করে মুখে মুখেই হিসেব করে ফেলল লরা। তার মানে, সপ্তাহে দেড় ডলার, মাসে পাঁচ ডলারের কিছু বেশি। মিসেস হোয়াইটকে যদি কাজ দিয়ে সন্তুষ্ট করা যায়, আর গোটা গ্রীষ্মকালটা যদি কাজ করার সুযোগ পাওয়া যায়, তা হলে পনেরো ডলার, বলা যায় না হয়তো বিশ ডলার রোজগার করতে পারবে ও। মেরির কলেজে যাওয়ার ব্যাপারে অনেক সাহায্য হবে এতে।

এই সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত হবে না, বুঝল ও। মা কী বলে শোনার জন্য চাইল মার মুখের দিকে।

'আমার কাছে তেমন একটা ভাল লাগছে না,' বলল মা। 'তবে কাছে পিঠেই থাকছে তোমার বাবা। হ্যাঁ, লরা, ইচ্ছে করলে তুমি যেতে পার।'

'কিন্তু, মা, এখানকার সব কাজ তোমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে···' কথাটা শেষ করতে পারল না লরা, তার আগেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল ক্যারি।

'তোমার সব কাজ আমি করে দিতে পারব, লরা। ঘর ঝাড় দেয়া, বাসন ধোয়া, বিছানা করা এসব তো পারিই, বাগানের আগাছাও পরিষ্কার করতে পারব।'

হাসিমুখে চোখের দৃষ্টি দিয়ে ওকে আদর করল মা, তারপর বলল, 'হ্যাঁ, ক্যারি আজকাল অনেক কাজ পারে। ঘরের কাজে মেরিও অবশ্য অনেক সাহায্য করে। কোনও অসুবিধা হবে না আমার, লরা।'

পরদিন সকালে চট করে পানি এনে আর এলেনের দুধ দুইয়ে দিয়েই কোন মতে নাস্তাটা সেরে বাবার সঙ্গে রওনা হয়ে গেল লরা। সাতটার আগেই পৌঁছতে হবে কাজে।

ব্যস্ত হাতে একটার পর একটা কাপড় দেখাচ্ছেন মিস্টার ক্ল্যান্সি দুজন নোংরা শার্ট পরা লোককে। আর মস্ত মোটা এক মহিলা সেলাইমেশিনের পাশে একটা কাউন্টারের ওপর বিছানো ছিট কাপড়ের ওপর সাইজ করে কাটা খবরের কাগজ আঁটছেন পিন দিয়ে।

টুপি খুলে সম্মান দেখাল বাবা মিসেস হোয়াইটকে। বলল, 'এই যে আমার মেয়ে, লরা।'

দাঁতে চেপে রাখা দুটো পিন হাতে নিয়ে লরাকে জিজ্ঞেস করলেন মহিলা, 'খুব তাড়াতাড়ি বাঁকা কাপড়ে আলগা, লম্বা ফোঁড় দিতে পার তো?'

'জ্বি, ম্যাম,' বলল লরা।

'আর শার্টের বোতামঘর তৈরি করতে?'

'পারি।'

'বেশ। ওই পেরেকে ঝুলিয়ে রাখো তোমার সানবনেট। তারপর বসে পড়ো অনেক পিছিয়ে আছি আমরা।'

মৃদু হেসে লরাকে অভয় দিয়ে চলে গেল বাবা নিজের কাজে।

কাঁপা হাতে সানবনেটটা ঝুলিয়ে রাখল লরা পেরেকে, তারপর অ্যাপ্রনটা পরে তৈরি হয়ে নিল। আঙুলে পরে নিল সেলাই করার থিম্বল্। জানালার ধারে মিসেস হোয়াইটের দেখিয়ে দেয়া চেয়ারটায় গিয়ে বসতেই টেঁকে জোড়া লাগিয়ে দেয়ার জন্য শার্টের কয়েকটা টুকরো অংশ এগিয়ে দিলেন তিনি

দ্রুতহাতে টাঁক দিল লরা ওগুলোতে। আড়চোখে ওর কাজ দেখলেন, কিন্তু কোনও কথা বললেন না মহিলা। ব্যস্তহাতে কেটে চলেছেন একের পর এক শার্টের কাপড় । একটা শার্টে টাঁক দেয়া হতেই এগিয়ে দিলেন আরেকটা।

গোটা কয়েক শার্ট মেশিনে সেলাইয়ের উপযুক্ত হতেই কাপড় কাটা বাদ দিয়ে সেলাই করতে বসলেন মিসেস হোয়াইট। হাত দিয়ে হুইলটা একটু ঘুরিয়েই পা দিয়ে তুমুল বেগে পেডাল করছেন, গুঞ্জন করছে মেশিন, লরার মনে হচ্ছে ওর মাথার ভেতরে একটা ভ্রমর ঢুকে পড়েছে।

দ্রুত হাতে কাজ করে যাচ্ছে লরা। কিছুক্ষণ একটানা কাজ করবার পর প্রথমে কাঁধ, তারপর ঘাড়ে ব্যথা শুরু হলো। এভাবে ঘাড় গুঁজে একটানা কাজ করেনি ও কখনও।

হঠাৎ থেমে গেল মেশিন। লরার টাঁক দেয়া শার্টগুলো সব সেলাই করে ফেলেছেন মিসেস হোয়াইট। লরা তখন একটা শার্টের কাজ আধাআধি শেষ করেছে। আর একটার কাজ পুরোই বাকি।

হাত বাড়িয়ে একটা শার্ট তুলে নিলেন মিসেস হোয়াইট। বললেন, 'এটা আমিই টেঁকে নিচ্ছি। অনেক পিছিয়ে আছি আমরা এখনও।'

'জ্বি, ম্যা'ম,' বলল লরা  বুঝল, আরও তাড়াতাড়ি করতে পারা উচিত ছিল ওর।

বিশাল চেহারার এক লোক রাস্তা থেকে মাথা গলাল দোকানে। 'আমার শার্টগুলো হয়ে গেছে, ক্ল্যান্সি?'

'হয়ে যাবে বিকেল নাগাদ,' জবাব দিলেন মিস্টার ক্ল্যান্সি।

লোকটা চলে যেতেই মিসেস হোয়াইটকে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্ল্যান্সি, ওর শার্টগুলো কতক্ষণে হবে। জবাবে মিসেস হোয়াইট বললেন কোনগুলো ওর শার্ট তা তিনি জানেনই না। বিশ্রী একটা গাল বকে উঠলেন মিস্টার ক্ল্যান্সি।

কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল চেয়ারে বসা লরা। হাত চলছে যত দ্রুত সম্ভব। তেড়ে এলেন মিস্টার ক্ল্যান্সি, স্তূপ করে রাখা শার্টগুলো ঘেঁটে ওই লোকটার শার্টগুলো বের করে প্রায় ছুঁড়ে দিলেন শাশুড়ীর দিকে, চোখ পাকিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, ডিনারের আগে যদি ওগুলোর কাজ শেষ না হয় তা হলে খবর আছে।

কথা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন মিসেস হোয়াইট। তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'খবরদার! তাগাদা দেবে না বলে দিচ্ছি! ঘোড়া খেদাচ্ছ, না? আমাকে দাবড়ি দিয়ে কাজ করানো তোমার বা তোমার মত আর কোনও নোংরা আইরিশম্যানের কাজ না!'

কানটা ভোঁ-ভোঁ করছে, জবাবে মিস্টার ক্ল্যান্সি কী বললেন শুনতে পেল না লরা। ওর ইচ্ছে হলো এখান থেকে ছুটে পালায়। এমনি সময়ে ডিনার খাওয়ার

জন্য ডাকলেন ওকে মিসেস হোয়াইট। দোকানের পিছনে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল ওরা, পিছু পিছু গজ-গজ করতে করতে এলেন মিস্টার ক্ল্যান্সি

গরম রান্নাঘরে গাদাগাদি করে বসল ওরা। টেবিলের ওপাশে ঠেলাঠেলি করছে মিস্টার ক্ল্যান্সির তিন মেয়ে আর এক ছেলে। মিসেস ক্ল্যান্সি খাবার সাজাচ্ছেন টেবিলে।

খেতে খেতে তারস্বরে চিৎকার করে ঝগড়া করলেন বড়রা তিনজন, এবং তারই ফাঁকে খেয়ে উঠলেন পেট পুরে। কী নিয়ে, বা ঠিক কার সঙ্গে ঝগড়া, তা মোটেই পরিষ্কার হলো না লরার কাছে।

খাওয়া শেষ করে শিস দিতে দিতে দোকানে গিয়ে ঢুকলেন মিস্টার ক্ল্যান্সি, মনে হচ্ছে পরিবারের সবার সঙ্গে বসে তৃপ্তির সাথে ডিনার খেয়ে উঠেছেন। খুশি খুশি গলায় শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'শার্টগুলোর কাজ শেষ করতে কতক্ষণ লাগবে?'

'বড় জোর দু-ঘণ্টা,' বললেন মিসেস হোয়াইট। 'আমরা দুজন মিলে ধরব এবার ওগুলো।'

অবাক হয়ে গেল লরা। কত রকম মানুষই না আছে দুনিয়ায়!

দুই ঘণ্টায় শেষ হলো চারটে শার্টের কাজ। লরার কাজ দেখে খুশি হলেন মিসেস হোয়াইট। বললেন, 'আমার চেয়ে অনেক ভাল বোতামঘর করতে পার দেখছি!'

সারাদিন একভাবে বসে কাজ করতে করতে পিঠ ব্যথা হয়ে গেল লরার। বার দুয়েক ভুলও হলো। টাক খুলে আবার সেলাই করতে হলো। সন্ধের দিকে বাবা দোকানে ঢুকতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ও। উঠে দাঁড়িয়ে কাপড়গুলো গুছিয়ে রাখল দ্রুত হাতে।

বাড়ি ফেরার পথে বাবা জিজ্ঞেস করল, 'জীবনে প্রথম টাকার বিনিময়ে কাজ করতে কেমন লাগল তোমার, আধ-বোতল? কেমন করলে সেলাই?'

'ভালই তো মনে হয়,' জবাব দিল লরা। 'মিসেস হোয়াইট আমার বোতামঘরের প্রশংসা করেছেন।'

# তিন

গোটা জুন মাসটা একের পর এক শার্ট সেলাই করে গেল লরা। প্রতি শনিবার গুনে গুনে দেড় ডলার দেন ওকে মিসেস হোয়াইট, বাড়ি ফিরে মার হাতে তুলে দেয় ও সেগুলো।

'সব টাকা আমাকে না দিয়ে কিছু তোমার রাখা উচিত, লরা,' বলল মা একদিন।

'কেন, মা? কীসের জন্যে?' হেসে জিজ্ঞেস করল লরা। 'টাকা দিয়ে আমি কী করব?'

ও জানে, প্রতিটা পয়সা জমাচ্ছে মা মেরিকে কলেজে পাঠানোর জন্য। এই সঞ্চয়ে সামান্য হলেও ওরও কিছু অবদান থাকবে, ভাবতে ভাল লাগে লরার।

কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলল না। শার্ট তৈরির অর্ডার কমে গেল। এক শনিবার ওর হাতে দেড় ডলার দিয়ে মিসেস হোয়াইট বললেন, 'কাজ কমে গেছে তো, তোমাকে আর লাগবে না। সোমবার সকালে আর দরকার নেই আসার। বুঝেছ?'

'জ্বি, ম্যা'ম,' বলল লরা। 'গুড-বাই!'

ছয় সপ্তাহে রোজগার হয়েছে নয় ডলার। ভাবতে অবাক লাগে, ছয় সপ্তাহ আগে এক ডলারই ওর কাছে অনেক টাকা মনে হতো, অথচ এখন নয় ডলারও তেমন বেশি কিছু মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, আরও কিছুদিন কাজ করতে পারলে ভাল হতো। আর দুটো সপ্তাহ কাজ করতে পারলে রোজগার হতো পুরো বারো ডলার।

বাবার কাজের জায়গায় গিয়ে পৌঁছতেই চেঁচিয়ে বলল বাবা, 'ওই দেখো, লরা, তোমার মার জন্যে কী নিয়ে যাচ্ছি আমরা আজ!'

লরা দেখল, একপাশে ছায়ায় রাখা আছে একটা ছালা-ঢাকা বাস্কেট। কাছে গিয়ে চিঁ-চিঁ আওয়াজ শুনেই বুঝে ফেলল, ওগুলো মুরগির বাচ্চা। ছালা সরিয়ে দেখল এক নজর।

'চোদ্দটা!' চোখ পাকিয়ে বলল বাবা। 'বোস্ট পৌঁছে দিয়ে গেল। বেশি ভারি না, আমরা দুজন দুদিকে ধরলে সহজেই বয়ে নিয়ে যেতে পারব।'

সিলভার লেকে ঝিলমিল করছে অস্তগামী সূর্যের আলো, মনে হচ্ছে আগুন লেগে গেছে পানিতে। বাড়ি ফেরার পথে লরা বলল, 'বাবা, মিসেস হোয়াইট বললেন, আমাকে আর দরকার নেই।'

'আচ্ছা! কাজের চাপ কমে গেছে তা হলে।'

'তোমার কাঠের কাজও বন্ধ হয়ে যাবে, বাবা?'

'তা তো যাবেই,' বলল বাবা। 'এসব কাজ সারা বছর থাকে না। তা ছাড়া, আমি শহরে পড়ে থাকলে খড় কাটবে কে?'

খানিকক্ষণ চুপচাপ হেঁটে লরা বলল, 'আমার মাত্র নয় ডলার রোজগার হলো, বাবা।'

'নয় ডলার অনেক টাকা! হাঁচি দিয়ে উড়িয়ে দেয়ার মত নয়,' বলল বাবা। 'তবে টাকার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, তোমার সাধ্যমত ভাল ভাবে কাজ করেছ কিনা, মিসেস হোয়াইটকে তোমার কাজ দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পেরেছ কিনা। তোমার কী মনে হয়, পেরেছ?'

'হ্যাঁ,' নিঃসন্দেহে বলল লরা।

'ব্যস, তা হলেই হলো। টাকাটা আসলে উপরি পাওনা।'

মুরগির বাচ্চা পেয়ে মা তো একেবারে আহ্লাদে আটখানা। মিসেস বোস্টের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। ক্যারির ওপর দায়িত্ব পড়ল বাচ্চাগুলোকে দেখেশুনে রাখার। আগামী কাল থেকে বেশ কিছুক্ষণ ছেড়ে রাখা হবে বাচ্চাগুলোকে, তখন আকাশে বাজপাখি দেখা যায় কি না লক্ষ রাখবে গ্রেস।

রাতে মুরগির বাচ্চাগুলো সব ঠিকঠাক আছে কি না দেখার জন্য মুরগির ঘরে গেল লরা। সব ঠিকই আছে দেখার পর আকাশের দিকে চোখ গেল ওর। জ্বলজ্বল করছে তারাগুলো, মৃদুমন্দ হাওয়ায় দুলছে ফসলের মাঠ। কতক্ষণ ধরে বাইরে আছে ভুলেই গেল ও। হুঁশ হলো মাকে আসতে দেখে।

'ও, তুমি এখানে!' বলে নিজেও একবার ছুঁয়ে দেখল মা বাচ্চাগুলোকে, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকাল চারপাশে। 'হুম! এটা এখন সত্যি সত্যি একটা ফার্ম মনে হচ্ছে!' জই আর গমের খেত দুলছে হাওয়ায়, সবজি বাগানে পাতাগুলোকে গাঢ় দেখাচ্ছে রাতে। শশা আর কুমড়োর লতা কলকল করে বাড়ছে। বাড়ির একটা জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে বাইরে ঘাসের ওপর।

হঠাৎ কিছু না ভেবেই জিজ্ঞেস করল লরা, 'মা, এই শরতে যদি মেরি কলেজে যেতে পারত, তা হলে কী ভাল হতো, না?'

'যাওয়া হতেও পারে,' বলল মা। 'তোমার বাবা আর আমি ভাবছি এ-নিয়ে।'

থমকে গেল লরা, তারপর বলল, 'সত্যি, মা? ওকে বলেছ?'

'না। তুমিও কিছু বোলো না এখন,' মৃদু গলায় বলল মা। 'আগে আগে আশা দিয়ে পরে আশাভঙ্গ যেন না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তবে মনে হচ্ছে, তোমার বাবা শহর থেকে যা রোজগার করেছে, আর ফসলের যা নমুনা দেখা যাচ্ছে, আমরা আশা করছি, যাওয়াটা হবে। অবশ্য শুধু গেলেই হবে না, সাতটা বছর ওর খরচ চালিয়ে নেয়ার ব্যবস্থাও করতে হবে আমাদের।'

মার কথা শুনে এই প্রথম উপলব্ধি করল লরা, মেরির কলেজে যাওয়া মানে ওর চলে যাওয়া। মেরি চলে যাওয়ার পর জীবনটা কেমন হবে ভাবেনি ও কোনদিন।

লরার থমকে যাওয়া দেখে মা বুঝতে পারল ওর মনের অবস্থা। বলল, 'হ্যাঁ, ওর অভাব খুব কষ্ট দেবে আমাদের। কিন্তু ভেবে দেখো, ওর জন্যে এটা কত বড় একটা সুযোগ!'

'জানি, মা,' বলল লরা।

খানিক চুপ করে থেকে মা বলল, 'তোমার দেয়া নয় ডলারে অনেক সাহায্য হয়েছে, লরা। এ-টাকায় মেরির জামাকাপড় হয়ে যাবে, হয়তো ভেলভেটের হ্যাটও হয়ে যাবে একটা।'

বুম্‌ম্‌!!!

প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভাঙল লরার। পাশ থেকে ফিস-ফিস করে জানতে চাইল ক্যারি, 'কীসের আওয়াজ এটা?'

'ভয় পেয়ো না,' বলল লরা। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখল, এখনও অন্ধকার। আন্দাজ করল, মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। আবার শোনা গেল আওয়াজটা। মনে হলো কেঁপে উঠল আকাশ-বাতাস।

ঘুম জড়ানো গলায় বাবা বলল, 'কামান দাগছে!'

'কেন, বাবা,' গ্রেসের চিকন গলা শোনা গেল। 'কেন কামান দাগছে? কাকে মারছে?'

বুম্‌ম্‌!

'কাউকে না। আজ চৌঠা জুলাই, তাই দাগা হচ্ছে কামান।'

বুম্‌ম্‌!

আসলে কামান নয়, কামানের আওয়াজ নকল করে বোম ফাটানো হচ্ছে, তারই আওয়াজ।

'আজ দিবসটা পালন করা হচ্ছে শহরে,' বলল বাবা। 'ঘোড়দৌড় হবে।'

ঠিক হলো, লরা আর ক্যারিকে নিয়ে বাবা যাবে শহরে। গ্রেস বেশি ছোট, অতদূর হাঁটতে পারবে না; আবার এতই বড় যে কোলে করে নেয়া যাবে না–কাজেই ওকে থাকতে হবে খামারেই। অনেক জেদ করল গ্রেস, কিন্তু মার সিদ্ধান্ত বদলাল না। সকাল হতে ওকে রেখেই বেরিয়ে পড়ল ওরা তিনজন ভাল জামাকাপড় পরে।

শহরের বাড়ির দোতলা থেকে লরা আর ক্যারি জনস্রোত দেখল রাস্তার। বাবা গেল এক চক্কোর ঘুরে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করে আসতে। দুপুরে লাঞ্চ খেয়ে সবাই যাবে ঘোড়দৌড়ের মাঠে।

নীচ থেকে বাবার ডাক শুনেই হুড়মুড় করে নেমে এল ওরা। কোত্থেকে একটা স্মোক্‌ড হেরিং নিয়ে এসেছে বাবা, আর একগাদা বাজি পটকা। মাখন-রুটির সঙ্গে হেরিং খেল ওরা, কিছুটা আবার রেখে দিল বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য। পটকাগুলো গ্রেসের জন্য নিয়ে যাবে বলে এখানেই ফুটিয়ে শেষ করল না।

খাওয়া শেষ করে চলল ওরা রেস দেখবে বলে। শহরের সব লোক এখন রেললাইন পেরিয়ে প্রেয়ারির দিকে চলেছে। মাঠে একটা বাঁশ গেড়ে ওড়ানো হয়েছে আমেরিকান পতাকা। ওখানে একজন লোক অনেকক্ষণ ধরে বক্তৃতা দিল চৌঠা জুলাইয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে। তারপর বিনামূল্যের লেমোনেড খেয়ে ওরা গেল ঘোড়দৌড় দেখতে।

চারটে ঘোড়ার দৌড়-প্রতিযোগিতা শেষ হতেই শুরু হলো বাগি-দৌড়ের প্রতিযোগিতা।

প্রথমে একজোড়া বে হাল্কা একটা বাগি টেনে এনে দাঁড়াল লাইনে। এমন ভঙ্গিতে টেনে আনল যে মনে হলো বাগিটার কোনও ওজনই নেই। এরপর একে একে আসতে থাকল আরও প্রতিযোগী। কিন্তু বাদামি রঙের একজোড়া চেনা মরগান চোখে পড়তেই ওগুলোর ওপর চোখ আটকে গেল লরার, আর কোনও ঘোড়া বা বাগি দেখতেই পেল না।

'দেখো, দেখো, ক্যারি! ওই যে সেই বাদামি মরগান!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল লরা।

'ওগুলো আলমানযো ওয়াইল্ডারের ঘোড়া,' বলল বাবা। 'কিন্তু, আশ্চর্য! কীসের সঙ্গে জোতা ওগুলো?'

বড়ভাই রয়ালের ভারি ওয়্যাগনটা নিয়ে এসেছে আলমানযো প্রতিযোগিতার জন্য। উঁচু সীটে বসে আছে আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে। মাথার হ্যাট ঠেলে দিয়েছে পিছনে ।

'একটা বাগি জোগাড় করতে পারেনি ছেলেটা!' একজন দর্শক বলে উঠল।

'এই ওয়্যাগন টেনে আর সব ঘোড়ার সঙ্গে কুলিয়ে উঠবে কী করে মরগানগুলো?'

'ওপাশের ঘোড়াটার নাম প্রিন্স,' বলল বাবা পাশে দাঁড়ানো মিস্টার বোস্টকে। 'ওটা নিয়েই ক্যাপ গারল্যান্ডের সঙ্গে ভয়ঙ্কর তুষার-ঝড়কে তুচ্ছ করে গিয়েছিল আলমানযো অভুক্ত শহরবাসীর জন্যে গম কিনে আনতে। তা নইলে না খেয়ে মরতে হতো আমাদের। আর এই পাশেরটার নাম হচ্ছে লেডি। অ্যান্টিলোপদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়েছিল একবার। দুটোরই যেমন শক্তি তেমনি অসম্ভব গতি।'

'কিন্তু অত ভারি একটা বোঝা টেনে স্যাম আওয়েনের বে-গুলোকে হারানো সম্ভব না,' বললেন মিস্টার বোস্ট। 'কারও কাছে চাইলে একটা হাল্কা বাগি কী জোগাড় করতে পারত না ও?'

'হয়তো পারত,' পাশ থেকে একজন বলে উঠল। 'কিন্তু ছেলেটা স্বাধীনচেতা কিসিমের। ধার করা বাগি নিয়ে জেতার চেয়ে নিজেরটা নিয়ে হারতেও রাজি।'

'আহা, বেচারার একটা বাগি থাকলে ভাল হতো,' বললেন মিস্টার বোস্ট।

শুরু হলো রেস। বাদামি মরগানগুলোকে ভারি বোঝা টেনে হেরে যেতে হচ্ছে বলে মনটা খারাপ হয়ে গেল লরার। সবার আগে আগে চলেছে বে-দুটো, যেন উড়ে চলেছে। বাকিগুলো রয়েছে একটু পিছনেই। সবাই একসীটের হাল্কা বাগি নিয়েছে। মস্ত গাড়িটায় অনেক উঁচুতে বসে সবার শেষে চলেছে আলমানযো ওয়াইল্ডার, যেন তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে আর সবাইকে।

'গোটা দেশের সেরা ঘোড়া ওই মরগান দুটো,' কে যেন বলছে, শুনতে পেল লরা। 'কিন্তু জিততে পারবে না। কোনও সম্ভাবনা নেই।'

'একেবারেই নেই,' বলল পাশ থেকে আরেকজন। 'বেশি ভারি পিছনের বোঝাটা।'

কিন্তু খানিক পরেই সবাইকে অবাক করে দিয়ে কদম চাল বজায় রেখেই একের পর এক বাগিকে পিছনে ফেলে সামনে এগোতে শুরু করল ভারি ওয়্যাগনটা। ফিরে আসার জন্য যখন ঘুরছে, তখন দেখা গেল তিনটে বাগি পিছনে পড়ে গেছে ওয়্যাগনের, এখন শুধু স্যাম আওয়েনের বেগুলো দৌড়াচ্ছে মরগানের আগে আগে। ধীরে ধীরে আরও কাছে চলে আসছে আলমানযোর ঘোড়াগুলো। তারপর ধরে ফেলল প্রায়।

পাশ ফিরে কালো কেশরের বাদামি মরগান দেখতে পেয়ে চমকে উঠলেন স্যাম আওয়েন। চাবুক বের করে সাঁই-সাঁই চালালেন বে-র পিছন দিকে, হাঁক ছাড়লেন ওদের আরও জোরে ছোটার জন্য। চেষ্টার ত্রুটি করল না ঘোড়াদুটো, প্রাণপণে ছুটল লাইনের দিকে। আলমানযোর চাবুক নেই, নিচু হয়ে ঝুঁকে কী যেন বলল প্রিন্স আর লেডির কানে কানে। কথা শুনে যেন পক্ষিরাজ হয়ে উঠল মরগান দুটো, অনায়াসে বেগুলোকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল কয়েক গজ, এবং এগিয়েই থাকল। জিৎ হলো আলমানযোর।

চিৎকার করে উল্লাস প্রকাশ করল মাঠের সবাই। থেমে দাঁড়াতেই ঘিরে ধরল বিজয়ীকে।

'ছেলেটা ঘোড়ার জাদুকর!' বলল বাবা।

বাড়ি ফেরার পথে ওদের সঙ্গে বেশ কিছুদূর এলেন মিস্টার বোস্ট। কথায় কথায় বাবা বলল, 'ওয়াইল্ডারদের একটা বোন আছে স্কুল-টীচার, শহরের পশ্চিমে একটা জমি ক্লেইম করেছে। আমাদের স্কুলে চাকরি পাওয়া যাবে কী না খোঁজ নিতে বলেছে আলমানযোকে। আমি স্কুল বোর্ডের বরাবরে দরখাস্ত দিতে বলে দিয়েছি, তারপর দেখব কতদূর কী করা যায়।'

লরা ভাবল, ভালই হয় তা হলে। যদি ঠিকমত লেখাপড়া করে টীচারকে খুশি করতে পারি, তা হলে হয়তো কোনও একদিন ওই সুন্দর ঘোড়াগুলোর পিছনে টীচারের পাশে বসার সুযোগ হতে পারে।

## চার

জই-খেতে ঝাঁকে ঝাঁকে কালো পাখি এসে ফসল নষ্ট করছে। এই হারে চললে গোটা মাঠে শুধু খড় থাকবে, জই থাকবে না এক দানাও। রোজ অনেকগুলো করে মেরে আনে বাবা বন্দুক দিয়ে, মজা করে খায় সবাই। একটা গুলি হলে কিছুক্ষণের জন্য পালায় ওরা। তারপর ভুলে গিয়ে আবার এসে জোটে।

মেরির কলেজে যাওয়ার ব্যাপারটা এবার সত্যিই বাস্তবায়িত হতে চলেছে। একশো ডলার রোজগার করেছে বাবা শহরে কাজ করে। মাঠে ফসল হয়েছে ভাল। সবজি বাগানের ফলনও চমৎকার। কাজেই আর দেরি না করে এবারই ওকে কলেজে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাবা-মা।

সিদ্ধান্তটা জানার পর থমকে গেছে লরা। কলেজের কথা হচ্ছে অনেকদিন থেকেই, কিন্তু তার মানে যে মেরির চলে যাওয়া, ঘুম থেকে উঠেই মেরিকে না দেখা, সেসব এত স্পষ্ট করে কখনও অনুভব করেনি। এতদিন ওটা একটা কথার কথা ছিল, অনিশ্চিত সম্ভাবনা হিসেবে ভবিষ্যতের ব্যাপার ছিল। কিন্তু এখন আর কদিন পর ও সত্যিই চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে কষ্টে বুকটা ফেটে যেতে চাইল ওর। মেরিকে ছাড়া ও থাকবে কী করে?

মেরির জন্য নতুন জামাকাপড় বানিয়ে ফেলেছে মা। ওকে সেসব পরিয়ে দেখা হয়েছে গায়ে ঠিক হচ্ছে কি না। অপূর্ব লাগছে ওকে ওসব কাপড়ে, কিন্তু ওর নিজের দেখার কোন উপায় নেই; ওর চোখের সামনে শুধু নিকষ কালো অন্ধকার।

এ-বছরও খড় তৈরিতে সাহায্য করল লরা বাবাকে। তবে গাদা তৈরিতে কোনও সাহায্য করতে পারল না, কারণ এবার সরাসরি শহরে নিয়ে গিয়ে খড় গাদা করল বাবা। তা হলে আর টানাটানি করতে হবে না এখান থেকে ওখানে। এবারও শহরে চলে যাবে ওরা শীতে। খামারের এই বাড়ি ঝড়-ঝাপটা সহ্য করার মত আরও অনেক শক্ত করে তৈরি হলে পর খানে শীত টানোর কথা ভাবা যাবে।

কালো পাখির কবল থেকে ভুট্টা-খেতও বাঁচানো গেল না। এক ঝাঁককে তাড়ালে আসে আরেক ঝাঁক। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে কাঁচা অবস্থাতেই পেড়ে ফেলা হলো ভুট্টাগুলো। একদিন ছয়টা পাখি দিয়ে চিকেন পাইয়ের মত করে ব্ল্যাক

বার্ড পাই রান্না করল মা। তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে উঠে মাথায় টুপি চড়াল বাবা, মাকে বলল, 'তুমিও চলো না, ক্যারোলিন। দুজনে মিলে পছন্দ করে মেরির ট্রাঙ্কটা কিনে আনি।'

অবাক হয়ে গেল লরা। অনেকটা ধরেই নিয়েছিল, জই আর ভুট্টা কালো পাখিতে খেয়ে নেয়ায় এবার আর মেরির কলেজে যাওয়া হবে না। জিজ্ঞেস করল, 'মেরির কলেজে যাওয়া হচ্ছে তা হলে?'

প্রশ্ন শুনে থমকে দাঁড়াল বাবা। 'কেন, লরা, কে আটকাচ্ছে যাওয়াটা?'

'কী করে যাবে? জই বা ভুট্টা–কিছুই তো পাওয়া গেল না এ-বছর।'

'তোমার যে দুশ্চিন্তা করার বয়স হয়ে গেছে তা আমি ভাবতেও পারিনি, আধ-বোতল!' বলল বাবা হাসিমুখে। 'বড় বাছুরটা আমরা বেচে দিচ্ছি।'

'না-না, ওটা বেচো না, বাবা!' বলল মেরি। কারণ ও জানে, আর এক বছরের মধ্যেই বড় হয়ে যাবে বাছুরটা। তখন দুটো গরু হয়ে যাবে ওদের, সারা বছর দুধ আর মাখন খেতে পাবে ওরা। বড় বাছুরটা বেচে দিলে পিছিয়ে যাবে বাবা দুটো বছর, যতদিন না ছোট বাছুরটা বড় হয়।

'ওটা বিক্রি করে দিলে এখনকার মত আমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, বলল বাবা। 'মনে হয়, অন্তত পনেরো ডলার পাওয়া যাবে ওটা বেচলে।'

'তোমরা এসব নিয়ে ভেবো না,' বলল মা। 'যখন যেমন অবস্থা হয়, তারই সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলতে হয়।'

'কিন্তু, মা, আমার জন্যে পুরো দুই-দুইটা বছর পিছিয়ে যাচ্ছ তোমরা।'

'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, মেরি,' বলল বাবা। 'তোমার কলেজে যাওয়াটা আর দেরি করা যায় না, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। বিচ্ছিরি একঝাঁক কালোপাখি সে সিদ্ধান্ত থেকে আমাদের টলাতে পারবে না।'

দেখতে দেখতে বিদায়ের দিন এসে গেল। কাল সকালে চলে যাচ্ছে মেরি।

সবাই ব্যস্ত হয়ে ওর জিনিসপত্র গুছিয়ে দিচ্ছে, বিদায়ের কথাটা মনে আনতে চাইছে না। কিন্তু সাপারের আগেই শেষ হয়ে গেল সবার সব ব্যস্ততা। এখন শুধু অনুভব করা।

বাবা গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে গেল বাইরে। সেলাইয়ের সরঞ্জাম নিয়ে এল মা, কিন্তু সেগুলো টেবিলের ওপর রেখে জানালা দিয়ে চেয়ে রইল বাইরের দিকে। কাঁদো কাঁদো গলায় গ্রেস বলল, 'যেয়ো না, মেরি। কেন চলে যাবে? যেয়ো না, আমাকে একটা গল্প বলো।'

ও জানে না, মেরির কোলে চড়ে উইসকনসিনের বিগ উড্‌স্ জঙ্গলে দাদু আর প্যান্থারের দৌড়ঝাঁপের গল্প শোনা আর কোনদিনই হবে না ওর। মেরি ফিরে আসতে আসতে ও বড় হয়ে যাবে।

গল্পটা শেষ হতেই আবার আবদার করতে যাচ্ছিল গ্রেস, কিন্তু বাধা দিল মা।

'না, গ্রেস, ওকে আর বিরক্ত কোরো না। সাপারে আজ কী খাবে, মেরি?' আগামীকাল থেকে এ-বাড়ির সাপারে আর থাকবে না মেরি।

'কী খাব? তুমি টেবিলে যা দাও সবই তো মজা লাগে, মা!' মেরির স্বতস্ফূর্ত

জবাব।

'গরম পড়েছে,' বলল মা। 'ভাবছি, পেঁয়াজ দেয়া পনিরের বল করলে কেমন হয়, আর ঠাণ্ডা মাখন দেয়া মটরশুঁটি। লরা, বাগান থেকে লেটুস আর কয়েকটা টমেটো এনে দেবে?'

হঠাৎ মেরি বলে উঠল, 'তোমার সঙ্গে আমিও আসি, লরা? একটু হাঁটতে পারলে হতো।'

'যাও না, কোনও তাড়াহুড়ো নেই,' বলল মা। 'সাপারের এখনও অনেক দেরি আছে।'

আস্তাবলের পাশ দিয়ে এগিয়ে ছোট্ট টিলাটায় উঠল ওরা। চমৎকার রঙের মেলা বসিয়ে ডুবছে সূর্য। মেরিকে তার বর্ণনা দিল লরা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল মেরি, তারপর বলল, 'রোজ বিকেলে এই বেড়ানোর কথা মনে পড়বে আমার।' মেরির গলাটা কাঁপছে।

'আমারও,' ঢোক গিলল লরা। তারপর বলল, 'তবে যখনই মনে পড়বে যে তুমি কলেজে আছ, তখন আর তত খারাপ লাগবে না।'

'তোমার সাহায্য ছাড়া আমার পক্ষে কলেজে যাওয়া সম্ভব হতো না,' বলল মেরি ধরা গলায়। 'আমাকে সঙ্গে নিয়ে পড়েছ তুমি, সবসময় সাহায্য করেছ আমাকে লেখাপড়ায়। তা ছাড়া মার হাতে তোমার পুরো রোজগার তুলে দিয়েছ তুমি আমার জন্যে।'

'ওহ্, ওটা তো কিছুই না। আমি খুশি হতাম যদি আরও…'

'অনেক, লরা, অনেক!' বলল মেরি।

গলাটা ধরে এল লরার। চোখ টিপে দুইফোঁটা পানি ঝরিয়ে লম্বা করে দম নিল, তারপর কোনমতে বলল, 'কলেজ তোমার ভাল লাগবে, মেরি।'

'আমারও তাই মনে হয়। তা ছাড়া এই দুর্লভ সুযোগ কজন পায়? তোমারও এতে অবদান আছে। টীচার হওয়ার আগেই তুমি যেভাবে পেরেছ সাহায্য করেছ।'

'টীচার হতে পারলে আরও পারব। কিন্তু ষোল বছর বয়স না হলে তো টীচার হওয়ার উপায় নেই।'

'তখন আমি থাকব না এখানে,' বলল মেরি। বলার ভঙ্গিতে মনে হলো বুঝি চিরকালের জন্যে চলে যাচ্ছে ও। 'আমি তো কোনদিন বাড়ির বাইরে থাকিনি। কোথায় থাকব, কেমন থাকব কে জানে!' মেরির কণ্ঠে অনিশ্চয়তা। অল্প অল্প কাঁপছে ওর শরীর।

'তুমি কিচ্ছু ভেবো না,' আশ্বাস দিল লরা। 'বাবা-মা দুজনেই যাচ্ছে তোমার সঙ্গে, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, কলেজের পরিবেশ সবকিছু নিজের চোখে দেখে সন্তুষ্ট হলে তবেই তোমাকে রেখে আসবে ওখানে। আর ভর্তি-পরীক্ষা? একটুও ভয় পেয়ো না, তুমি অনায়াসে পাস করবে।'

'না, ভয় পাব না,' বলল মেরি। 'ভয় পেলে আমার চলবে না। একা হয়ে যাব, কিন্তু সে ব্যাপারে কারও কিছু করারও নেই।'

সাঁঝ হয়ে আসছে। নেমে এলো ওরা টিলা থেকে। ফিরে চলেছে বাড়ির

দিকে।

'না, পাস করতে পারব না, সে-ভয় নেই আমার। তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও এগিয়ে নিয়েছ তুমি। প্রতিটা বইয়ের প্রতিটা অক্ষর আমার মুখস্থ। তবে খারাপ লাগছে আমার জন্য বাবা-মার এত খরচ হচ্ছে বলে। তোমার আর ক্যারির জামা-কাপড় আর বই-পত্র কেনার টাকা কোথায় পাবে, তাই ভাবছি।'

'ও নিয়ে তুমি ভাবতে যেয়ো না। যেভাবে পারে ব্যবস্থা করবে বাবা-মা। সব সময়ই তো করে এসেছে, তাই না?'

পরদিন সকালে নাস্তার পরপরই কয়েকটা কালোপাখি রোস্ট করে একটা বাক্সে পুরে নিল মা, লাঞ্চের সময় ট্রেনে খাওয়া হবে বলে। রাতেই গোসল সেরেছে বাবা, মা আর মেরি। কাপড় পরে তৈরি হতে না হতেই প্রতিবেশী বাচ্চা একটা ছেলে এল ওয়্যাগন নিয়ে ওদের রেল-ডিপোতে পৌঁছে দেবে বলে। এক সপ্তাহ পর মেরিকে রেখে বাবা-মা যখন ফিরবে, তখন ট্রাঙ্ক থাকবে না, হেঁটে চলে আসবে খামারবাড়িতে।

মেরির ট্রাঙ্ক তোলা হলো ওয়্যাগনে। গাড়িতে ওঠার আগে মা বলল, 'এই যে, ক্যারি আর গ্রেস, লক্ষ্মীমেয়ে হয়ে থেকো, লরার কথা শুনে চোলো। মুরগির বাচ্চাগুলোকে খাবার আর পানি দিতে ভুলো না, আর বাজ থেকে খুব সাবধান, দুধের বাটি ভাল করে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নেবে রোজ।'

'আচ্ছা, মা,' বলল ওরা একবাক্যে।

'গুড-বাই,' বলল মেরি। 'লরা, ক্যারি আর গ্রেস, গুডবাই।'

'গুড-বাই,' কোনও মতে বলল লরা আর ক্যারি। গ্রেস শুধু চোখ গোল করে চেয়ে রইল নিষ্পলক। ওয়্যাগন-সীটে প্রতিবেশী ছেলেটার দুপাশে বসল মা আর মেরি। বাবা বসল মেরির ট্রাঙ্কের ওপর।

'ঠিক আছে, এবার রওনা হওয়া যাক,' বলল বাবা ছেলেটাকে। ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েদের বলল, 'গুড-বাই, চললাম।'

ওয়্যাগনটা চলা শুরু করতেই মস্ত বড় একটা হাঁ করল গ্রেস, তারপর গলা ফাটিয়ে কেঁদে উঠল।

'ছি-ছি, গ্রেস! কী লজ্জা! এত বড় মেয়ের কাঁদতে আছে?' নিজের কান্না চেপে কোনমতে বলল লরা। 'তোমার লজ্জা হওয়া উচিত!' ক্যারির চেহারাও কাঁদো-কাঁদো হয়ে এসেছিল, চট্ করে সামলে নিল। গ্রেসও বারকয়েক ফুঁপিয়ে থেমে গেল।

গাড়িটা মিলিয়ে গেল দূরে। বাবা নেই, মা নেই, মেরি নেই—লরার মনে হলো কেমন যেন ফাঁকা আর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে চারপাশ।

'এসো, ঘরে যাই,' বলে পিছন ফিরে ঘরে চলে এল লরা। স্তব্ধ হয়ে আছে ঘরের ভেতরটাও।

ফুঁপিয়ে উঠল গ্রেস আবার, তারপর ডুকরে কেঁদে উঠল। ক্যারির চোখেও বড় বড় দুটো জলের ফোঁটা টলটল করছে। নাহ্, এভাবে তো চলবে না। মা ওর ওপর দায়িত্ব দিয়ে গেছে, সে-দায়িত্ব ওর পালন করা উচিত। 'শোনো, ক্যারি আর

গ্রেস,' বলল লরা, 'চলো, আমরা বাড়িটা পরিষ্কার করে ফেলি। এখনই শুরু করব আমরা। মা এসে দেখবে সবকিছু ধুয়ে-মুছে একেবারে ঝকঝকে তকতকে করে ফেলেছি আমরা। কী মজা হবে, না?'

কাজের চেয়ে অকাজই হলো বেশি, কিন্তু কেটে গেল একটা দিন। যেমন ছিল তারচেয়ে দশগুণ বেশি নোংরা হয়ে গেল ঘর-দোর। তবে যতই দিন গেল, ওদের কাজের গুণগত মান বাড়তে থাকল ততই। পঞ্চম দিনে আগের চেহারা ফিরে পেল সবকিছু, পরবর্তী দুই দিনে সত্যি সত্যিই ওরা সবকিছু মেজে-ঘষে গুছিয়ে ফেলল। তোশক, বালিশ, পর্দা, চাদর সব নতুনের মত হয়ে গেছে, কোথাও সামান্য ময়লার চিহ্ন নেই।

সপ্তম দিনে সিটি বাজিয়ে এল ট্রেন, তার অনেকক্ষণ পর বড় বিলের ধারে দেখা গেল বাবা-মাকে। এক দৌড়ে পৌঁছে গেল ওরা। দু-মিনিট একসঙ্গে কথা বলল সবাই, তারপর মেরির কলেজের খবর বলার সুযোগ পেল বাবা-মা।

মেরির কলেজটা খুবই পছন্দ হয়েছে ওদের। চমৎকার ইঁটের দালান। শীতে একটুও কষ্ট পাবে না মেরি। খাওয়া-দাওয়া চমৎকার, সহপাঠীরা চমৎকার–বিশেষ করে মেরির রুমমেটকে তো মার খুবই পছন্দ হয়েছে। টীচারদেরও ব্যবহার ভাল। প্রত্যেকটা পরীক্ষায় পাস করেছে মেরি। পলিটিকাল ইকোনমি, সাহিত্য আর হাইয়ার ম্যাথেমেটিক্স নিয়ে পড়বে ও; সেই সঙ্গে সেলাই-ফোঁড়াই, মোতির কাজ আর সঙ্গীত তো থাকছেই। মস্ত একটা অর্গান আছে কলেজে।

সব শুনে খুবই খুশি হলো লরা। মেরির অভাব ভুলে গেল ও। সুখে থাকবে মেরি, যা-যা চেয়েছিল সব পেয়েছে ও কলেজে গিয়ে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, মেরি যাতে ওর লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে, সেজন্য যা করবার সাধ্যমত সব করবে ও। ষোল বছর বয়স হলেই টীচার হওয়ার সনদপত্র আদায় করবে ও, যাতে সাত বছরের কোর্স পুরোটা সম্পূর্ণ করতে পারে মেরি।

ঘরে ঢুকে চমকে গেল মা। বলল, 'আরে! ব্যাপার কী! সবকিছু এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লাগছে কেন? লরা, তোমরা কি···আরে, পর্দাগুলো পর্যন্ত···আর জানালাগুলো সব···ব্যাপার কী!'

'আমরা এই কদিন ঘর-দোর পরিষ্কার করেছি, মা,' বলল ক্যারি। 'মেঝে ঘষা থেকে শুরু করে তোশকে খড় ভরা পর্যন্ত সবই করে রেখেছি আমরা, মা।'

দু-হাত মাথার ওপর তুলে মা বলল, 'আশ্চর্য! আশ্চর্য!' তারপর ধপ্ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। এতটা আশা করেনি মা মেয়েদের কাছে।

পরদিন তিন মেয়ের জন্য তিনটে উপহার নিয়ে বেরোলো মা শোবার ঘর থেকে।

গ্রেসের জন্য একটা ছবির বই, লরা আর ক্যারির জন্য একটা করে অটোগ্রাফ খাতা।

বুঝিয়ে দিল মা, যে বান্ধবীদের পছন্দ তাদেরকে এর একেকটা পৃষ্ঠায় একটা করে কবিতার ছত্র লিখে নিজের নাম সই করতে দেয়া যায়। চিরকাল থেকে যায় জিনিসটা।

উপহার পেয়ে খুশি হলো ওরা সবাই। খুশি হলো বাবা-মাও।

# পাঁচ

স্কুল শুরু হওয়ার প্রথম দিনেই বই, খাতা আর টিফিনবাটি নিয়ে রওনা হলো লরা আর ক্যারি শহরের পথে।

'মিস ওয়াইল্ডার কেমন টীচার কে জানে!' বলল ক্যারি। 'ভাল হলেই বাঁচা যায়। তোমার কী মনে হয়?'

'বাবার ধারণা, ভাল হবে,' বলল লরা। 'স্কুল-বোর্ডের মেম্বার হিসেবে ভাল টীচার বাছাই করার দায়িত্ব ছিল বাবার ওপর। অবশ্য মহিলা ওয়াইল্ডারদের বোন বলেও হয়তো চাকরিটা পেয়ে থাকতে পারেন। ওই অপূর্ব সুন্দর বাদামি ঘোড়াদুটোর কথা মনে আছে না তোমার?'

'ভাইয়ের সুন্দর ঘোড়া থাকলেই তো আর বোনেদের স্বভাব মিষ্টি হয়ে যায় না,' বলল ক্যারি। 'তবে আশা করছি মহিলা ভাল হবেন।'

'সার্টিফিকেট যখন আছে, তখন ধরে নেয়া যায় ভালই পড়াবেন,' মন্তব্য করল লরা।

শহরটা আগের চেয়ে অনেক বড় হয়েছে। রাস্তার দুপাশে বাড়ি-ঘর উঠেছে মেলা। একটা লিভারি স্টেবল্ হয়েছে, নতুন গ্রেইন এলিভেটর হয়েছে রেল-লাইনের ওপারে। পশ্চিমে মোড় নিয়ে দ্বিতীয় রাস্তায় পড়ল ওরা। ওখান থেকেই দেখা গেল স্কুলঘর ছাড়িয়ে প্রেয়ারির এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কয়েকটা কুটির তৈরি হয়েছে–অর্থাৎ আরও হোমস্টেডার এসেছে। একটা গম ভাঙানোর মেশিন খটাখট শব্দে চলছে রেললাইনের ধারে। নতুন একটা গির্জা তৈরি হচ্ছে–লোকজন কাজ করছে সেখানে। স্কুলের দরজার সামনে নতুন মুখের ভিড়। অন্তত বিশ জোড়া অপরিচিত চোখ তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। অস্বস্তি বোধ করছে লরা, কিন্তু সে-ভাবটা প্রকাশ পেতে দিল না। সাহস করে এগিয়ে গেল সামনে।

হঠাৎ সিঁড়ির ধাপে দেখতে পেল লরা মেরি পাওয়ার আর মিনি জনসনকে। ওকে দেখেই খুশি হয়ে চেঁচিয়ে উঠল মেরি পাওয়ার, 'এই যে, লরা ইঙ্গলস! কেমন আছো?'

মিনি জনসনের মুখটাও খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল লরাকে দেখে। খুব ভাল লাগল লরার, কৃতজ্ঞ বোধ করল ওদের প্রতি।

'আমরা আমাদের সীট বেছে নিয়েছি,' বলল মিনি। 'তুমি আমাদের পাশেরটায় বসো না, লরা?'

একসঙ্গে স্কুলে ঢুকল ওরা। দেয়ালের সঙ্গে লাগানো সবচেয়ে পিছনের ডেস্কে মেয়েদের দিকটায় মিনি আর মেরির বই রাখা। লরা বসল ওদের পাশেই দ্বিতীয় সারির শেষ ডেস্কে। ক্যারিকে অবশ্য ছোট মেয়েদের সাথে সামনের দিকে একটা ডেস্ক বেছে নিতে হলো।

ঘণ্টা হাতে নিয়ে মিস ওয়াইল্ডার এলেন। সুন্দর, আধুনিক, রুচিসম্মত পোশাক পরেছেন। ঘন কালো চুল মহিলার, চোখ দুটো ধূসর। দেখে মনে হলো সুন্দর মনের মানুষ।

'মেয়েরা, তোমরা যে-যার জায়গা পছন্দ করে নিয়েছ, তাই না?' মধুর হেসে বললেন তিনি।

'হ্যাঁ, ম্যাম,' লাজুক ভঙ্গিতে বলল মিনি। কিন্তু মেরি পাওয়ার একটু হেসে বলল, 'আমি মেরি পাওয়ার, এ হচ্ছে মিনি জনসন, আর ও লরা ইঙ্গলস। আমরা এই সীটেই বসতে চাই, আপনি অনুমতি দিলে।'

'বেশ তো, তোমরা ওই সীটেই বসতে পার,' বললেন মিস ওয়াইল্ডার প্রসন্ন ভঙ্গিতে।

এবার দরজার কাছে গিয়ে বেল বাজিয়ে সবাইকে ডাকলেন তিনি। হুড়মুড় করে ঢুকল ছাত্র-ছাত্রী, মুহূর্তে প্রায় ভর্তি হয়ে গেল ক্লাসরুম মেয়েদের দিকে মাত্র একটা ডেস্ক খালি থাকল। ছেলেদের দিকে অবশ্য পিছনের ডেস্কগুলো খালিই থাকল বড় ছেলেরা একজনও আসেনি বলে। সবাই ওরা এখন নিজ নিজ খামারে কাজে ব্যস্ত, শীতের আগে আসতে পারবে না স্কুলে।

লরা দেখল ক্যারি বসেছে ম্যামি বিয়ার্ডস্লির সঙ্গে বেশ হাসি-খুশি দেখাচ্ছে ওকে। হঠাৎ একটা নতুন মেয়ের ওপর চোখ পড়ল লরার। দুই সারি ডেস্কের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিব্রত ভঙ্গিতে ইতস্তত করছে। লরারই সমবয়সী হবে মেয়েটা, একই রকম লাজুক। হালকা-পাতলা গড়ন, ছোটখাটো চেহারা, ছোট্ট গোল মুখে বড় বড় নিরীহ দুটো চোখ, কালো কোঁকড়া চুল অস্বস্তি, ভয় আর লজ্জায় লাল হয়ে আছে মুখটা। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে লরার দিকে চাইল মেয়েটা। লরা পাশে না নিলে ওকে অন্য ডেস্কে একা বসতে হবে।

মেয়েটির দিকে চেয়ে আন্তরিক ভঙ্গিতে হাসল লরা, পাশের খালি সীটে চাপড় দিয়ে ইশারায় ডাকল ওকে। হেসে উঠল মেয়েটার চোখদুটো ডেস্কে বই রেখে বসল লরার পাশে।

মিস ওয়াইল্ডার ঘুরে ঘুরে ছাত্র-ছাত্রীদের নাম লিখে নিলেন একটা রেকর্ড বইয়ে। পাশের মেয়েটি বলল, ওর আসল নাম আইডা রাইট, কিন্তু ওকে ডাকা হয় আইডা ব্রাউন বলে—রেভারেন্ড ও মিসেস ব্রাউনের পালিতা কন্যা ও।

রেভারেন্ড ব্রাউন এ-শহরের গির্জায় পুরোহিতের দায়িত্ব নিয়ে নতুন এসেছেন। লরার বাবা-মা ব্যাপারটা পছন্দ করেনি, তারা আশা করেছিল রেভারেন্ড অ্যালডেনকে পাঠানো হবে এখানে। কিন্তু ইনি ধর-পাকড় করে আগে আগেই চলে এসেছেন। বাবা-মা ওর বাবাকে অপছন্দ করলেও মেয়েটাকে লরার খুব পছন্দ হলো।

মিস ওয়াইল্ডার তাঁর ডেস্কে রেকর্ড বইটা রেখে ক্লাসের কাজ শুরু করতে যাবেন, এমনি সময়ে খুলে গেল ক্লাসরুমের দরজা। প্রথম দিনেই কে দেরি করে এল দেখার জন্য সবাই তাকাল ওদিকে।

তাজ্জব হয়ে গেল লরা—মেয়েটা প্লাম ক্রীকের সেই অহঙ্কারী নেলী ওলসন!

লরার চেয়ে বেশ অনেকটা লম্বা হয়ে গেছে নেলী এখন, কিন্তু সেই নাক-উঁচু

ভঙ্গি, গর্বিত চেহারা, নাকের কাছে বসানো ছোট ছোট চোখ সহজে ভুলবার নয়। প্লাম ক্রীকে থাকতে বারবার 'গাঁইয়া' বলে অপমান করেছে ও লরা আর মেরিকে, মার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে, বাবার সম্পর্কে বাজে কথা বলেছে, ওদের প্রিয় বুলডগ জ্যাককে অকারণে দূর-দূর করেছে।

দেরি করে এসেছে, কিন্তু এমন ভঙ্গিতে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে যেন এমন নোংরা স্কুল আর জীবনে দেখেনি। সাজ-পোশাক ছোটবেলার মতই ঝলমলে, দামি। কোঁকড়া, সোনালী চুল মাথার পিছনে ফ্রেঞ্চ-নটে বাঁধা। মাথাটা একটু পিছনে হেলিয়ে নাকের দুপাশ দিয়ে তিরস্কারের ভঙ্গিতে দেখছে সবাইকে।

'পেছনের একটা সীট পেলে ভাল হয়,' বলল সে মিস ওয়াইল্ডারের দিকে চেয়ে, তারপর ভুরু কুঁচকে তাকাল লরার দিকে। লরার মনে হলো ও মনে মনে বলছে, 'ভাগো ওখান থেকে, আমি বসব ওই সীটে।'

নিজের সীটে আরও জাঁকিয়ে বসল লরা, তারপর চোখ সরু করে চেয়ে রইল নেলীর দিকে।

সবাই চেয়ে রয়েছে মিস ওয়াইল্ডার কী করেন দেখবে। বিব্রত ভঙ্গিতে একটু কাশলেন তিনি। তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল লরা নেলীর চোখে চোখে, যতক্ষণ না নেলী চোখ সরাল। এবার মিনি জনসনের দিকে চাইল নেলী, মাথা ঝাঁকিয়ে সেদিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ওই সীটটা হলেও চলবে।'

যদিও মিনিকে আগেই কথা দিয়েছেন তিনি, তবু মিস ওয়াইল্ডার ওকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মিনি, তোমার সীটটা কি বদল করবে?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মৃদুকণ্ঠে বলল মিনি, 'হ্যাঁ, ম্যা'ম।' ধীর ভঙ্গিতে বইপত্র গুছিয়ে নিয়ে সামনের খালি ডেস্কটায় চলে গেল ও। যেমন ছিল তেমনি বসে থাকল মেরি পাওয়ার, নেলী যে মিনির জায়গায় যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে যেন লক্ষই নেই। নেলীও ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, ওপাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে মিনির সীটে বসলে যেন হার হয়ে যাবে; আর সবাই তটস্থ হয়ে ওর সুবিধে করে না দিলে ওর মান থাকে না।

দ্বিতীয়বার নিজের অবিবেচনার পরিচয় দিলেন মিস ওয়াইল্ডার, মেরিকে বললেন, 'মেরি, তুমি এবার সরে নতুন মেয়েটাকে জায়গা করে দিলেই আমরা লেখাপড়ার কাজ শুরু করতে পারি।'

উঠে দাঁড়াল মেরি। 'আমি বরং মিনির সঙ্গে গিয়ে বসি।'

ক্লাসের সবচেয়ে ভাল সীটটায় একা বসতে পেরে হাসি ফুটল নেলীর মুখে।

রেকর্ড বইয়ে নাম লেখার সময় জানা গেল, নেলীর বাবা শহরের উত্তরে জমি ক্লেইম করেছেন, ওখানেই থাকে ওরা। তার মানে এখন নেলীকেই গাঁইয়া বলা যায়, আর যেহেতু শীতে শহরে চলে আসছে ওরা, লরাকে বলা যায় শহুরে।

হাসি-হাসি মুখ করে এবার লম্বা একটা বক্তৃতা দিলেন মিস ওয়াইল্ডার: এখন থেকে কেউ কোন দুষ্টামি করবে না, অন্যায় করবে না, স্বার্থপর হবে না, সবাই সবাইকে ভালবাসবে, এই সুখী স্কুলে কখনও কাউকে শাস্তি দেয়ার প্রয়োজনই পড়বে না। আমরা সবাই সবার বন্ধু ইত্যাদি বলে সবাইকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিলেন তিনি বক্তৃতা শেষ করে ওদেরকে পড়ায় মন দিতে বলায় হাঁপ ছেড়ে

বাঁচল যেন সবাই।

তবে সেদিন সকালে পড়াশোনা তেমন একটা হলো না, কে কোন ক্লাসের উপযুক্ত সেটা বুঝে নিতেই টিফিনের সময় হয়ে গেল। খাওয়ার পর বাকি সময়টুকু পরস্পরকে চেনা-জানার কাজে ব্যয় করল সবাই। দেখা গেল, লরার অনুমান ঠিকই ছিল: অত্যন্ত মিশুক আর নিরহঙ্কার মানুষ আইডা। বলল, 'আমি পালিতা মেয়ে। একটা হোম থেকে আমাকে সংগ্রহ করেছিল আমার পালক মা। খুব ভালবাসে আমাকে।'

'ভাল লেগেছিল বলেই তো তোমাকে নিয়েছিলেন উনি, নিশ্চয়ই খুব ফুটফুটে ছিলে–ভাল না লেগে কোনও উপায় ছিল না ওঁর,' হেসে বলল লরা।

কিন্তু সবার সব মনোযোগ নিজের দিকে টেনে রাখতে চাইল নেলী। বলল, 'আমরা তো পুবের মানুষ, এই রুক্ষ দেশ আর কর্কশ মানুষের মাঝে কতদিন যে টিকতে পারব জানি না।'

'কীসের পুব?' লরা বলে উঠল, 'পশ্চিম মিনেসোটা থেকে এসেছ তুমি, ওটা পুব হলো?'

'ও, ওখানে তো মাত্র অল্প কিছুদিনের জন্যে ছিলাম আমরা,' হাতের ঝাপটায় মিনেসোটাকে উড়িয়ে দিল নেলী। 'আসলে আমরা নিউ ইয়র্ক স্টেটের লোক।'

'সবাই আমরা পুব থেকেই এসেছি, কেউ ছিলাম না পশ্চিমে,' বলল মেরি পাওয়ার। 'চলো, বাইরে রোদে গিয়ে দাঁড়াই।'

'ওমা, কেন? কক্ষণো না!' প্রায় আঁৎকে উঠল নেলী। 'বলো কী, গায়ের রং জ্বলে যাবে তো! আমাদের ওখানে ভদ্রমহিলারা হাতের আঙুল নরম আর গায়ের চামড়া পরিষ্কার রাখে।'

বাড়ি ফিরে নেলীর সব কথা বলল লরা বাবা-মাকে। টীচারের অন্যায়ের কথা বলতে গিয়ে বকা খেল মার কাছে। বাবা বলল, 'ওলসনরা নিউ ইয়র্ক স্টেটের লোক যদি হয়ও, তাতে বড়াই করার কী আছে আমি বুঝলাম না।'

লরার মনে পড়ল বাবাও ছেলেবেলায় নিউ ইয়র্ক স্টেটে ছিল।

'কী করে জানি মিনেসোটাতে যা ছিল সব খুইয়ে ফেলেছে ওলসন। কিচ্ছু নেই ওর এখন এই ক্লেইমটা ছাড়া। শুনেছি, যতদিন ফসল না হয় ততদিন আত্মীয়-স্বজনের বদান্যতায় চলতে হচ্ছে ওকে। আমার মনে হয়, সব হারানোর ফলে বড়াই করে ক্ষতিটা পুষিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে মেয়েটা। তুমি ওর কথায় কান না দিলে আর খারাপ লাগবে না।'

ঘুমাতে গিয়ে মনে মনে বলল লরা, 'আমি ভাল হয়ে চলব। নেলীর মতো থাক না ও, আমি ভাল হয়ে চলব।'

# ছয়

গোটা শরৎকালটা ব্যস্ততার মধ্যে কাটল লরা আর ক্যারির। সকালে উঠেই ঘরের কাজ সেরে, কোনমতে নাস্তা খেয়েই স্কুলের পোশাক পরে নিয়ে টিফিন বাটি হাতে ছুটেছে স্কুলের পথে, বিকেলে বাড়ি ফিরে আবার ঘরের কাজ সেরে পড়তে বসা। দম ফেলবার ফুরসত নেই।

শনিবার কাটে ওদের শহরে চলে যাওয়ার প্রস্তুতির কাজে। লরা আর ক্যারি আলু তোলে, শালগমের ওপরের অংশ কেটে ওয়্যাগনে তোলে; গাজর, বীট আর পেঁয়াজ তোলায় সাহায্য করে বাবাকে, টম্যাটো আর গ্রাউন্ড চেরি তুলে জড়ো করে শহরে নেওয়ার জন্য।

'আমাদের যা-যা প্রয়োজন, সব নিয়ে যাব আমরা এবার শহরে। আবার তুষার-ঝড়ের খপ্পরে পড়তে চাই না,' একদিন হাসতে হাসতে বলল বাবা। 'অন্তত এই দুর্বল বাড়িতে ঝড়ের কবলে পড়া চলবে না।'

'এবার কিন্তু অত শীত পড়বে বলে মনে হয় না,' বলল লরা।

'হ্যাঁ, আমারও মনে হয় না,' বলল বাবা। 'কিন্তু তাই বলে তো আর গত বারের মত অপস্তুত অবস্থায় ধরা পড়তে পারি না। আমাদের তৈরি থাকতে হবে।'

সময় থাকতে সব সরিয়ে নিল বাবা শহরের বাড়িতে। মাকে সাহায্য করল লরা আর ক্যারি জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদার কাজে। পরদিন স্কুল-শেষে ক্লেইম পর্যন্ত হাঁটতে হলো না ওদের, বাবা-মা চলে এসেছে শহরের বাড়িতে। সবকিছু গুছিয়ে ফেলেছে মা একাই, মেয়েদের জন্য কোনও কাজ ফেলে রাখেনি।

মাঝে মাঝে মেরির অভাব কাঁটার মত খচ্-খচ্ করে লরার বুকে। কিন্তু করার কিছুই নেই। মেরি আছে এখন মনের আনন্দে। এতদিনের আশা পূরণ হয়েছে ওর: লেখাপড়া শিখছে, অর্গ্যান বাজানো শিখছে, হাতের কাজ শিখছে। টীচাররা ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আস্তে-ধীরে একটা ব্যাপার পরিষ্কার উপলব্ধি করেছে লরা। বদলে যাচ্ছে মেরি, আগের সেই মেরিকে আর কোনদিন পাবে না ও। ছুটি-ছাটায় আসবে মেরি, এক বিছানায় পাশাপাশি ঘুমাবেও হয়তো, কিন্তু এই দূরত্ব আর কমবে না। আলাদা একটা জগৎ তৈরি হচ্ছে মেরিকে ঘিরে, সেখানে লরার স্থান অতি নগণ্য।

লরা ভাবে, হয়তো মা, ক্যারি, বাবা–সবাই অনুভব করে মেরির অভাব, বুকের ভিতর হয়তো শূন্যতাও বোধ করে, কিন্তু কেউ কাউকে বলে না।

খামারের বাড়িটার জন্যও লরার মন খারাপ করে। ভোরে উঠে স্কুলের পথে হাঁটতে ওর খুব ভাল লাগত। ক্যারির জন্য অবশ্য শহরের বাড়িটাই সুবিধে হয়েছে। খুবই দুর্বল আর রোগা রয়ে গেছে ও এখনও। গত শীতে দীর্ঘদিনের অপুষ্টি ওকে নরম করে ফেলেছিল, তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনও। ওরা ওর জন্য বেছে বেছে হালকা কাজ বরাদ্দ করে, মা ওর রুচি ফেরাবার জন্য

নানান রকম মজাদার রান্নার আয়োজন করে, কিন্তু তেমনি ফ্যাকাসে আর বয়সের তুলনায় ছোটখাটো রয়ে গেছে ও। ওর বই, খাতা, টিফিন সব বইত লরা, তারপরেও এক মাইল হাঁটতে গিয়ে ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে যেত ক্যারি। শহরে থাকলে ওর হাঁটার কষ্ট দূর হবে।

স্কুল খুব ভাল লাগছে লরার। সব ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে, বিশেষ করে আইডা, মেরি পাওয়ার আর মিনির সঙ্গে তো একেবারে গলাগলি ভাব। বিরতি আর টিফিনের সময় এই কজনের জমে যায় আড্ডা।

সুন্দর রোদেলা দিনে ছেলেরা বল নিয়ে ক্যাচ ধরা খেলে সামনের মাঠে, কখনও স্কুলহাউসের দেয়ালে বল ছুঁড়ে মেরে সবাই মিলে হুড়োহুড়ি করে ধরে সেটা। লরাকে প্রায়ই সাধাসাধি করে ওরা, 'চলে এসো, লরা! এসো খেলি। এসো না!'

এই বয়সে মাঠে দৌড়-ঝাঁপ করলে মানুষ খারাপ বলে, কিন্তু লাফিয়ে উঠে বল ধরে আবার ছুঁড়ে মারতে লরার এত ভাল লাগে যে মাঝে মাঝে নেমে পড়ে ওদের সঙ্গে। খেলতে গিয়ে ধাক্কা খেলে বা পড়ে গেলে কখনও টুঁ শব্দ করে না ও কারও বিরুদ্ধে। তাই রীতিমত শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে ও ছোট ছেলেদের কাছে। একদিন শুনতে পেয়েছে লরা, ওর সম্পর্কে বন্ধুদের বলছে চার্লি, 'মেয়ে হলে কী হবে, লরার মধ্যে কোনও ন্যাকামি নেই।'

কথাটা শুনে খুব ভাল লাগল লরার। ওর দেখাদেখি মাঝে মাঝে আইডাও নেমে পড়ে মাঠে। মেরি আর মিনি না খেললেও ওদের হাসি, হাততালি আর বাহবা শুনে বোঝা যায়, ওরাও এটাকে খারাপ চোখে দেখছে না। একমাত্র নেলী ওলসন নাক উঁচু করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

নেলীকে ওরা অনেক সেধেও কিছুতেই স্কুলহাউসের বাইরে নিতে পারে না।

আইডা হাসে। 'ওর ভয়, ওর নিউ ইয়র্ক স্টেট থেকে আনা ফরসা চামড়াটা নষ্ট হয়ে যাবে!'

'আরে, না!' মাথা নাড়ে মেরি পাওয়ার। 'স্কুল থেকে বেরোয় না ও অন্য কারণে। মিস ওয়াইল্ডারের সঙ্গে খাতির করার তালে আছে ও। দেখ না, সারাক্ষণ ওঁর সঙ্গে কী সব গুজুর-গুজুর করে?'

'করুক,' বলল মিনি জনসন। 'ওকে ছাড়াই চমৎকার সময় কাটছে আমাদের।'

'মিস ওয়াইল্ডাররাও নিউ ইয়র্ক স্টেটে ছিলেন এক সময়,' বলল লরা। 'হয়তো তাই নিয়েই কথা হয় দুজনার।'

বাঁকা চোখে লরার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হানল মেরি পাওয়ার। মুখে হাসি।

এ হাসির অর্থ বুঝল না লরা।

'আমার কি মনে হয় জানো?' জানতে চাইল মিনি।

'না তো! কী?' সবাই জিজ্ঞেস করল। মেরি তখনও হাসছে।

'আমার মনে হয়, ওই সামনে দেখা যাচ্ছে নেলীর টার্গেট!'

সবাই সামনে তাকিয়ে দেখল ওয়্যাগন ট্র্যাক ধরে এগিয়ে আসছে বাদামি

রঙের মরগান দুটো। ঝকঝকে নতুন একটা বাগিকে টেনে আনছে ওরা। সামনে দিয়ে টগবগিয়ে চলে গেল ঘোড়াগুলো।

'তুমি বাউ করলে না কেন, লরা?' জানতে চাইল আইডা।

'কাকে?' অবাক হয়ে গেল লরা। 'কাকে বাউ করব?'

'কেন, আমাদের সম্মানে হ্যাট তুলল ভদ্রলোক, তুমি খেয়াল করোনি?' এবার প্রশ্ন করল মেরি।

ঘোড়া আর বাগি দেখতে এমনই মগ্ন ছিল লরা যে আর কিছুই চোখে পড়েনি ওর।

'আমি সত্যিই দুঃখিত,' বলল লরা, 'খেয়াল করলে নিশ্চয়ই বাউ করতাম। বড় বিশ্রী অভদ্রতা হয়ে গেল কিন্তু কী আশ্চর্য! কবিতার মতো ঘোড়াদুটো, তাই না?'

'তুমি দেখছ ঘোড়া, আর নেলী দেখছে ঘোড়ার মালিকটাকে!' বলল মিনি। 'ওর চাউনি দেখেই বুঝে ফেলেছি আমি। তখন বাগিটা ছিল না। এখন মনে হয় একেবারে খেপে উঠবে।'

'চৌঠা জুলাইয়ে তো কই ওঁর কোনও বাগি ছিল না!' বলল লরা।

'পুব থেকে সদ্য এসেছে এটা,' বলল মিনি। 'গম বিক্রি হতেই এটার অর্ডার দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। ফসলও নাকি দারুণ হয়েছিল এবার।' এসব খবর মিনি সংগ্রহ করেছে ওর ভাই আর্থারের মাধ্যমে।

ভেবে চিন্তে শান্ত গলায় বলল মেরি, 'তোমার কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে, মিনি। এখন থেকেই পরিকল্পনা আঁটা নেলীর পক্ষে অসম্ভব নয়।'

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল আইডা। 'ঘণ্টা পড়ে যাবে, পা চালাও সবাই।'

প্রায় দৌড়ে ফিরে এল ওরা স্কুলে। চোখ-মুখ লাল, বাইরের বাতাসে চুল উস্কোখুস্কো। ধবধবে পরিষ্কার জামা পরে ভদ্রমহিলার ভঙ্গি নিয়ে বসে আছে নেলী ক্লাসে। নাকের নীচ দিয়ে চাইল ও লরার দিকে। লরা স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকল ওর চোখে চোখে। একটা কাঁধ আর চিবুক নেড়ে অবজ্ঞা প্রকাশ করল নেলী। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'লরা ইঙ্গলস, তুমি নিজেকে যত যাই ভাবো না কেন, মিস ওয়াইল্ডার বলেছেন, স্কুল বোর্ডের মেম্বার হলে কী হবে, স্কুলের ব্যাপারে তোমার বাবার কথার তেমন কোন গুরুত্ব নেই।'

'কী বললে?' ফোঁস করে উঠল লরা।

'আমার ধারণা,' রেগে গিয়ে বলল আইডা, 'লরার বাবার মতামতের দাম অন্য আর সবার সমান তো বটেই, বরং বেশি আছে। তাই না, লরা?'

'নিশ্চয়ই!' জবাব দিল লরা।

'ঠিক,' বলল এবার মেরি পাওয়ার। 'আমি বলব, বেশিই আছে। কারণ, তাঁর দুই মেয়ে এ-স্কুলের ছাত্রী। বাকি দুজনের তো সন্তানই নেই।'

বাবার নামে বাজে কথা বলায় রাগে ফুঁসছে লরা, নিজেকে আর সামলাতে পারল না; বলে বসল, 'তোমরা অতি সাধারণ গ্রামের মানুষ, নেলী। যদি শহরের লোক হতে, যোগ্যতা থাকলে হয়তো তোমার বাবাও তখন স্কুল বোর্ডের সদস্য হতে পারতেন, তাঁরও দু-চারটে কথা বলার অধিকার থাকত।'

চড় কষাবার জন্য নেলীর হাতটা উঠে আসছে দেখতে পেল লরা, মনে মনে প্রস্তুত হয়ে গেল, নেলী মারলে পরমুহূর্তে এক চড়ে ওকে মাটিতে শুইয়ে দেবে–কিন্তু না, সামলে নিল নেলী নিজেকে, রাগে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল নিজের সীটে। ক্লাসরুমে এসে ঢুকেছেন মিস ওয়াইল্ডার।

লরাও বসে পড়ল নিজের জায়গায়। এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে যে আবছা দেখছে চোখে। লরার বাহুতে একটু চাপ দিয়ে সমর্থন জানাল ওকে আইডা।

# সাত

প্রথম দিনের সেই 'হাসি-হাসি' বক্তৃতা দেয়ার পর থেকেই ক্লাসের ছেলেরা বাঁদরামির পরিমাণ বাড়িয়ে চলেছে দিন দিন। ওরা দেখতে চায় কতদূর পর্যন্ত দুষ্টামি সহ্য করেন টীচার।

প্রথম দিকে উসখুস করেছে, তারপর স্লেট-পেন্সিল-বই-খাতা দিয়ে খুট-খাট আওয়াজ করেছে। যতক্ষণ না এসব শব্দ অসহ্য হয়ে উঠেছে, কিছুই বলেননি মিস ওয়াইল্ডার। যখন চরমে উঠেছে, তখন বানোয়াট মিষ্টি হাসি হেসে নরম গলায় ওদের বারণ করেছেন

যেখানে কড়া ধমক আশা করছে, সেখানে এই মধুর হাসির কী অর্থ বুঝতে না পেরে অবাক হয়েছে ছাত্ররা। টীচার ব্ল্যাক বোর্ডের দিকে পিছন ফিরলেই নিজেদের মধ্যে ফিসফাস, কথাবার্তা বলা শুরু করল এবার। ছোট মেয়েরা চিঠি আদান-প্রদান করছে নিজেদের মধ্যে। টীচার বারণ করলে দু-এক মিনিটের জন্য থামে, তারপর আবার যে-কার সেই। তবু মিস ওয়াইল্ডার কাউকে শাস্তি দিলেন না।

এক দুপুরে ডেস্কে রুলার ঠুকে সবাইকে চুপ করতে বলে আবার হাসিমুখে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন তিনি–বললেন, তিনি শাস্তিতে বিশ্বাস করেন না, কারণ তিনি জানেন আসলে ক্লাসের সব ছেলেমেয়ে খুবই ভাল; শাস্তি দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে নয়, তিনি শৃঙ্খলা আনবেন ভালবাসা দিয়ে। তিনি ক্লাসের সবাইকে ভালবাসেন, এবং জানেন ক্লাসের সবাইও তাঁকে খুবই ভালবাসে।

যদিও হাসিমুখে কথাগুলো বলছেন তিনি, সবাই অনুভব করল তাঁর চোখে উদ্বেগের ছায়া। হাসিটা নকল। কিন্তু নেলীর দিকে চেয়ে যখন হাসেন, সেটা হয় আন্তরিক। একমাত্র নেলীর কাছেই সহজ হতে পারেন তিনি, স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

'মহিলা কেমন যেন ভণ্ড কিসিমের,' ফিস ফিস করে বলে বসল মিনি। স্টোভের ধারে নেলীর সঙ্গে গল্প করছেন মিস ওয়াইল্ডার, ওরা চার বান্ধবী জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছেলেদের বল খেলা দেখছে।

'ঠিক তা মনে হয় না আমার,' বলল মেরি পাওয়ার। 'তোমার কী ধারণা, লরা?'

'না, ঠিক ভণ্ড বলা বোধহয় যায় না,' হিশেব করে বলল লরা। 'আসলে

বিচার-বুদ্ধির কিছুটা কমতি আছে। কিন্তু মহিলা লেখাপড়ায় ভাল, পড়ানও চমৎকার, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'ঠিক বলেছ,' স্বীকার করল মেরি। 'কিন্তু সেই সঙ্গে খানিকটা বিবেচনা থাকলে ভাল হতো। ছোট বাচ্চাদেরই সামলাতে পারেন না, ভাবছি বড় ছেলেরা এলে কী অবস্থা হবে ওঁর!'

মিনির চোখ দুটো ঝিকমিক করে উঠল, আর হেসে উঠল আইডা। টীচারের বেহাল অবস্থা কল্পনা করেই খুশি হয়ে উঠেছে ওরা। কিন্তু লরা বলল, 'স্কুলে গোলমাল হোক এটা কি আমরা চাই? আমরা তো কিছু শিখতে এসেছি এখানে।'

শহরে চলে আসার পরও ক্যারির শরীরটার তেমন কোনও উন্নতি হয়নি। পড়া মুখস্থ করে ঠিকই, কিন্তু প্রায়ই ঝাপসা হয়ে যায় স্মৃতি, পড়া ধরলে মাঝে-মধ্যে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—জবাব দিতে পারে না।

একদিন বাড়ি থেকে টিফিন খেয়ে এসে স্কুল হাউসে ঢুকেই লরা দেখল স্টোভের ধারে বসে গল্প করছে নেলী আর মিস ওয়াইল্ডার। চড়া গলায় 'স্কুল বোর্ডের আমি থোড়াই—' বলেই লরাকে দেখে থেমে গেলেন মিস ওয়াইল্ডার। বেল বাজাতে হবে বলে চট্ করে উঠে চলে গেলেন। লরার মনে হলো, মিস ওয়াইল্ডারের হয়তো স্কুল বোর্ডের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আছে, কিন্তু লরাকে দেখে মনে পড়েছে যে ওর বাবা বোর্ডের একজন সদস্য, তাই চেপে গেলেন।

সেদিনই তিনটে বানান ভুল করল ক্যারি। অবশ্য ওর পাশের মেয়েটাও ভুল করেছে। কিন্তু মিস ওয়াইল্ডার ম্যামিকে বললেন, 'যাও, নিজের সীটে গিয়ে মন দিয়ে তৈরি করো এই একই পড়া। আর ক্যারি, যাও, ব্ল্যাকবোর্ডে গিয়ে এই তিনটে শব্দের প্রতিটা পঞ্চাশবার করে লেখো।'

কথাটা তিনি এমন ভঙ্গিতে বললেন যেন শত্রুপক্ষের কাছ থেকে মস্ত বিজয় ছিনিয়ে আনতে পেরেছেন।

মেজাজ ঠিক রাখার চেষ্টা করেও বিফল হলো লরা। বেচারা ক্যারির জন্য দুঃখে ফেটে যেতে চাইছে ওর বুক। গোটা স্কুলের সবার সামনে এই শাস্তি দেয়ায় লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছে ক্যারি। মিস ওয়াইল্ডারের প্রতি ঘৃণা বোধ করল লরা। একই ভুলের জন্য একজনকে ছেড়ে দিয়ে অপরজনকে শাস্তি দেয়া কী রকমের বিচার? এটাকে নীচতা ছাড়া আর কী বলা যায়? রাগে গা জ্বলতে শুরু করল ওর। বেচারা, দুর্বল, ভীরু ক্যারির জন্য এটা মস্ত বড় আঘাত।

অসহায় বোধ করল লরা। ওদিকে কাঁপতে কাঁপতে ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ক্যারি, কোনমতে চেপে রেখেছে চোখের পানি। রোগা হাতে লিখতে শুরু করল ও, এক লাইন শেষ করে ধরছে আর এক লাইন। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা, তবু লিখে যাচ্ছে। হঠাৎ মড়ার সাদা মত হয়ে গেল ওর মুখটা, ইরেজারের পাত্রটা কোনমতে আঁকড়ে ধরে পতন ঠেকিয়ে রেখেছে।

হাত তুলল লরা, তারপর লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। মিস ওয়াইল্ডার ওর দিকে ফিরতেই অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে বলল, 'ক্যারি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে, ম্যা'ম!'

চট্ করে ক্যারির দিকে চাইলেন মিস ওয়াইল্ডার। তারপর বললেন, 'ক্যারি, তুমি বসতে পার।' সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, কিন্তু অতটা রক্তশূন্য

দেখাচ্ছে না আর ওর চেহারা। লরা বুঝল, ধকলটা সামলে নিতে পেরেছে ক্যারি এ-যাত্রা। নিজের সীটের দিকে এগোচ্ছিল, মিস ওয়াইল্ডার বললেন, 'সামনের সীটেই বসে পড়ো।' দু-পা সামনে এগিয়ে কোনমতে হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ল ও সামনের সীটে।

এবার লরার দিকে ফিরলেন মিস ওয়াইল্ডার। 'তুমি যখন চাও না ক্যারি লিখুক, তখন ওর জায়গায় তুমিই লেখো এখন বাকিটুকু।'

ঝপ্ করে নীরবতা নেমে এল গোটা ক্লাসরুমে। সবাই চেয়ে রয়েছে লরার দিকে। এত বড় মেয়ের জন্য ব্ল্যাকবোর্ডে গিয়ে লেখার শাস্তি চরম অপমানজনক। মিস ওয়াইল্ডারও চেয়ে রয়েছেন ওর দিকে। চোখে চোখে চেয়ে রইল লরা স্থিরদৃষ্টিতে।

ধীর পায়ে ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াল লরা, চক নিয়ে লিখতে শুরু করল। রাগে, অপমানে আগুন ধরে গেছে ওর মাথায়। কিন্তু একটু পরেই ও বুঝতে পারল, ওর এই অপমানে কেউ ওকে ছোট চোখে দেখছে না। বরং–

'স্স্স্স্ট্! স্স্স্স্ট্!' কে যেন ওর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে। লরা পিছন ফিরছে না দেখে এবার চাপা গলায় ডেকে উঠল, 'লরা! স্স্স্স্ট্!'

আড়চোখে লরা দেখল, চার্লি। বলছে, 'লিখো না, লরা! মানা করে দাও! আমরা তোমার সঙ্গে আছি!'

মনের ক্ষোভ অনেকটা হালকা হয়ে গেল লরার। কিন্তু ওর কারণে স্কুলে কোন ঝামেলা বেধে যাক, এটা ও কিছুতেই হতে দিতে পারে না। ভুরু কুঁচকে হাসল লরা, মাথা নেড়ে বারণ করল চার্লিকে। পিছিয়ে গেল চার্লি, হতাশ হলেও মেনে নিয়েছে লরার সিদ্ধান্ত। হঠাৎ চোখের কোণে দেখতে পেল লরা, তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন মিস ওয়াইল্ডার ওর দিকে। গোটা ব্যাপারটা খেয়াল করেছেন তিনি।

নির্বিকার ভঙ্গিতে আবার লিখতে থাকল লরা। মনে মনে ভাবল, 'অত রাগের কী আছে তোমার? দেখলেই তো, স্কুলের নিয়ম ভঙ্গ করিনি আমি। বরং ঝামেলা এড়াতেই চেয়েছি।'

স্কুল শেষ হওয়ার পর বাড়ি ফেরার পথে লরা, মিনি আর মেরি পাওয়ারের পিছু নিল চার্লি ও তার দলের আরও দুজন ছেলে–ক্ল্যারেন্স আর আলফ্রেড।

'কালকেই দেখো না আমি ওই নীচ মেয়েলোকটার কী অবস্থা করি!' জোরে জোরে লরাদেরকে শুনিয়ে বন্ধুদের বলছে ক্ল্যারেন্স। 'ওর চেয়ারে একটা বাঁকা পিন ফিট করব আমি! দেখবে কেমন লাফ দেয়!'

'আর আমি ওর রুলারটা ভেঙে রাখব আগেভাগে,' ঘোষণা দিল চার্লি। 'তা হলে আর মারতে পারবে না যদি তোমাকে ধরে ফেলে।'

চট্ করে ঘুরে ওদের দিকে এগিয়ে গেল লরা। 'প্লীজ, এসব করতে যেয়ো না তোমরা,' বলল ও।

'এই দেখো, মানা করে আবার!' বলে উঠল চার্লি। 'কেন করব না শুনি? মজা হবে, অথচ আমাদের কিচ্ছু করতে পারবে না ওই বুড়ি।'

'কোথায় মজাটা?' জানতে চাইল লরা। 'একজন মহিলাকে অপছন্দ করতে পার, কিন্তু এভাবে তাঁকে নাকাল করায় তো কোনও বাহাদুরি নেই। আমার

অনুরোধ, তোমরা এসব করতে যেয়ো না।'

'দিল সব গুবলেট করে!' চটে যাওয়ার ভান করল করল ক্ল্যারেন্স, তারপর রাজি হলো, 'আচ্ছা, যাও–তা হলে করব না।'

'ঠিক আছে, তা হলে আমরাও করব না,' বলল চার্লি আর আলফ্রেড।

নিশ্চিন্ত হলো লরা, কথা যখন দিয়েছে, কথা রাখবে ওরা।

সেই রাতে বাতির আলোয় লেখাপড়ার ফাঁকে হঠাৎ মাথা তুলে বলল লরা, 'কেন যেন ক্যারিকে আর আমাকে দেখতে পারছেন না মিস ওয়াইল্ডার।'

বোনা বন্ধ হয়ে গেল মার। 'এটা স্রেফ তোমার কল্পনা, লরা।'

খবরের কাগজের ওপর দিয়ে উঁকি দিল বাবার চোখ। 'অপছন্দ করার কোনও কারণ যেন তৈরি না হয়, সেদিকে লক্ষ রেখো, তা হলেই ঠিক থাকবে সব।'

'কোনও কারণ আমরা তৈরি করিনি, বাবা,' গাঢ় গলায় বলল লরা। 'হয়তো নেলী ওলসন ওঁকে খেপিয়ে তুলছে,' বলেই চোখ নামাল ও বইয়ে। 'ওর কথা বড় বেশি শুনছেন উনি ইদানীং।'

পরদিন আগে আগেই পৌঁছল ওরা স্কুলে। স্টোভের ধারে বসে গল্প করছিলেন মিস ওয়াইল্ডার নেলী ওলসনের সঙ্গে। 'গুড মর্নিং' বলে স্টোভের কাছে আসতে গিয়ে কয়লার টিনের ভাঙা একটা জায়গায় স্কার্ট আটকে গিয়ে হোঁচট খেল লরা, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল–'ইশ্‌শ্‌!'

'কাপড়টা কি ছিঁড়ে গেল, লরা?' শীতল কণ্ঠে বললেন মিস ওয়াইল্ডার। 'তুমি নতুন একটা টিন আনিয়ে দাও না আমাদের। তোমার বাবা যখন স্কুল বোর্ডে আছেন, তখন তুমি তো চাইলেই যা খুশি তাই পাবে।'

অবাক হয়ে টীচারের মুখের দিকে চেয়ে রইল লরা কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'আমি চাইলে কেন দেবে! আপনি চাইলে দিতে পারে।'

'ও, তাই বুঝি?' বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন মিস ওয়াইল্ডার, তারপর গল্পে মেতে গেলেন নেলীর সঙ্গে।

এমন ব্যবহারের কারণ বুঝতে পারল না লরা। নেলী একবারও তাকায়নি ওর দিকে, তবে ওর ঠোঁটেও বাঁকা হাসি দেখতে পেয়েছে লরা। বুঝতে পারল, সেদিন যে গর্ব করে ওদের সবাইকে শুনিয়েছিল নেলী–অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ওরা দেখতে পাবে বাদামি ঘোড়ার পেছনে একটা ঝকঝকে নতুন বাগিতে চেপে বেড়াতে যাচ্ছে ও, সেই স্বপ্ন সফল হতে আর বেশি দেরি নেই। মিস ওয়াইল্ডার গিলে ফেলেছেন ওর টোপ।

তাতে অবশ্য লরার কিছুই এসে যায় না। ওর একমাত্র লক্ষ্য এখন মন দিয়ে লেখাপড়া করে স্কুল-টীচার হওয়ার ছাড়পত্র সংগ্রহ করা।

রোজকার মতই গোলমাল হলো আজ ক্লাসে। সবাই ফিসফাস করছে, খুটুর-খাটুর আওয়াজ করছে–পড়া ধরলে পারছে না। রেগে যাচ্ছেন মিস ওয়াইল্ডার, হাসি আর ধরে রাখতে পারছেন না মুখে। বেচারির জন্য খারাপই লাগল লরার।

দুপুরে কিছুটা শান্ত হলো ক্লাস। ভূগোল পড়ায় মগ্ন হয়ে রয়েছে লরা, মাঝে মাঝে বই থেকে চোখ তুলে মনে মনে আওড়ে মুখস্থ করছে কী কী রপ্তানী করে ব্রাজিল। দেখল, দুই মাথা এক হয়ে আছে ক্যারি আর ম্যামি বিয়ার্ডস্লির, বানান

বই থেকে মুখস্থ করছে বানান, ঠোঁট নড়ছে নিঃশব্দে। এতই নিবিষ্ট চিত্তে ডুবে আছে পড়ায় যে খেয়ালই করছে না যে অল্প অল্প দুলছে ওরা দুজনেই, সেই সঙ্গে দুলছে বেঞ্চিটা।

লরা লক্ষ করল, মেঝের সঙ্গে যে বল্টুগুলো সীটটাকে আটকে রেখেছে, সেগুলো ঢিল হয়ে গেছে। অবশ্য বেঞ্চের দুলুনির ফলে কোনও শব্দ হচ্ছে না, তাই হয়তো কেউ খেয়াল করেনি এতদিন। ব্রাজিলের সামুদ্রিক বন্দরে ফিরে গেল ও।

হঠাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন মিস ওয়াইল্ডার, 'ক্যারি আর ম্যামি, তোমাদের আর পড়তে হবে না। বই-খাতা রেখে তোমরা দুজন সীটটাই নাড়াও আজ।'

চট্ করে মাথা তুলল লরা। দেখল, হাঁ হয়ে গেছে ক্যারির মুখ, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে টীচারের মুখের দিকে। ধীরে ধীরে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল ওর গাল দুটো। কিন্তু টীচারের নির্দেশ তো পালন করতেই হবে, তাই বই-খাতা সরিয়ে রেখে দোলাতে শুরু করল বেঞ্চটা।

বেঞ্চে এখনও কোন শব্দ নেই, তবু মিস ওয়াইল্ডার বললেন, 'পড়াশোনা করতে হলে শান্ত, নীরব পরিবেশ দরকার। কেউ যদি অন্যের পড়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চায়, এখন থেকে তাকে ওই কাজটাই করে যেতে বলব আমি, যতক্ষণ না সে ওই কাজটার ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়।'

লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চাইল ক্যারি, কিন্তু ম্যামিকে দেখে মনে হচ্ছে কাজটা করতে ভালই লাগছে তার।

'আমি যতক্ষণ থামতে না বলি, ততক্ষণ মনের সুখে ঝাঁকাতে থাকো বেঞ্চটা!' আবার সেই বিজয়ীর উল্লাস টের পেল লরা মিস ওয়াইল্ডারের কণ্ঠে। ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে ফিরলেন তিনি, যে অঙ্কটা বোঝাচ্ছিলেন ছেলেদের সেটা আবার ধরলেন মাঝপথে। টেরও পাচ্ছেন না যে কেউ শুনছে না তাঁর কথা, ছেলেরা যে-যার দুষ্টামিতে ব্যস্ত।

ব্রাজিলের পড়ায় মন দেয়ার চেষ্টা করল লরা, কিন্তু পারল না। খানিকক্ষণ সীটটা ঝাঁকিয়ে বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল ম্যামি, পাশের সারির আরেকটা সীটে গিয়ে বসল।

একা ক্যারি ঝাঁকিয়ে চলেছে বেঞ্চ। কিন্তু দুজন বসার বেঞ্চ দুর্বল একটা বাচ্চা মেয়ের পক্ষে একা একধারে বসে দোলানো কঠিন, ধীর হতে হতে থেমে গেল একসময়। মিষ্টি সুরেলা গলায় মিস ওয়াইল্ডার বললেন, 'কী হলো, ক্যারি? আমি তো থামতে বলিনি। দোলাতে থাকো।' ম্যামিকে কিছুই বললেন না তিনি। দেখলেন, আলগোছে কোথায় সরে বসেছে ম্যামি।

এইবার মেজাজটা বিগড়ে গেল লরার। মিস ওয়াইল্ডারের অবিচার আর নীচতা ওর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ম্যামি দিব্যি বসে আছে আরেক সীটে, তাকে কিচ্ছু না বলে নির্যাতন করছেন দুর্বল, ভালমানুষ ক্যারিকে। রাগে রক্ত চড়ে গেল লরার মাথায়। ঠোঁট কামড়ে ধরে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছে ও, ভাবছে, এখুনি হয়তো ক্যারিকে থামতে বলবেন টীচার।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ক্যারির মুখটা, সাধ্যমত চেষ্টা করছে ভারি বেঞ্চটা

দোলাতে। কিন্তু পারছে না। আবার থেমে আসছে দুলুনি।

'আরও জোরে! আরও জোরে ঝাঁকাও!' বললেন মিস ওয়াইল্ডার। 'তোমার তো সীট ঝাঁকাতে খুব ভাল লাগে, তাই না? ঝাঁকাও এখন!'

কখন উঠে দাঁড়িয়েছে জানে না লরা। রাগটা সামলে রাখার চেষ্টা করল না আর। বলল, 'মিস ওয়াইল্ডার, আপনি যদি চান সীটটা আরও জোরে ঝাঁকানো হোক, আমি সাহায্য করতে পারি!'

প্রস্তাবটা লুফে নিলেন মিস ওয়াইল্ডার। লরার ঔদ্ধত্যে রেগে গেছেন তিনিও, বললেন, 'বেশ তো, ঝাঁকাও না!'

লরা গিয়ে বসল ক্যারির পাশে, নিচু গলায় ওকে বলল, 'তুমি চুপচাপ বসে বিশ্রাম নাও।' তারপর মেঝেতে দুই পা ভালমত বসিয়ে নিয়ে দোলাতে শুরু করল বেঞ্চটা।

ফরাসী ঘোড়ার শক্তি আছে লরার গায়ে, কথাটা বাবা এমনি এমনি বলে না।

ঘটাং আওয়াজ তুলে মেঝেতে পড়ল পিছনের পায়া দুটো, ফিরে এসে ঘট শব্দে পড়ল সামনের পায়া। সব কটা বল্টু প্রায় খুলে এল। চমকে গেলেন মিস ওয়াইল্ডার। তারপরই শুরু হলো ঘটাং-ঘট, খটাং-খট। মনের আনন্দে দোল দিচ্ছে লরা, ক্রমে দ্রুত হচ্ছে ছন্দ, বাড়ছে আওয়াজ।

'ঘটাং-ঘট, খটাং-খট! ঘটাং-ঘট, খটাং-খট!'

কেউ পড়ায় মন দিতে পারছে না। মেয়েরা ভয় পেয়েছে—এখন না-জানি কী ঘটবে! আর ছেলেরা ভাবছে ঠিক হয়েছে, এইবার জব্দ হয়েছে টীচার!

'ঘটাং-ঘট, খটাং-খট! ঘটাং-ঘট, খটাং-খট!' কী পড়াচ্ছেন মিস ওয়াইল্ডার কেউ কিছু শুনতে পাচ্ছে না। হাসতে শুরু করল ছোটরা।

'ঘটাং-ঘট, খটাং-খট! ঘটাং-ঘট, খটাং-খট!
ঘটাং-ঘট, খটাং-খট! ঘটাং-ঘট, খটাং-খট!'

মনে হচ্ছে তুমুল বেগে ছুটছে মেইল-ট্রেন। এখন নিজের কণ্ঠস্বরও আর শুনতে পাচ্ছেন না মিস ওয়াইল্ডার। চেঁচিয়ে বললেন, এবার থার্ড রীডার ক্লাসের পড়া ধরবেন তিনি। কিন্তু শুনেও ছেলেরা না শোনার ভান করছে, দুই হাত ঘুরিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে জানতে চাইছে কী বলছেন তিনি।

অবশেষে লরার কাছে এসে দাঁড়ালেন মিস ওয়াইল্ডার। তীব্র বিদ্বেষের সঙ্গে বললেন, 'লরা আর ক্যারি! আজকের জন্যে ছুটি দেয়া হলো তোমাদের! তোমরা এখন বাড়ি যেতে পার!'

শেষবারের মত খটাং-খট আওয়াজ করে থেমে গেল মেশিন যেন স্বর্গের শান্তি নেমে এল ক্লাসে—নীরব, নিঝুম, নিস্তব্ধ।

সবাই জানে, বেত মারার চেয়েও অনেক বড় শাস্তি হচ্ছে ক্লাস থেকে তাড়িয়ে দেয়া। এর চেয়ে বড় শাস্তি আর মাত্র একটাই আছে—স্কুল থেকে বহিষ্কার করা।

একটি কথাও না বলে ক্যারির বই-খাতা গুছিয়ে তুলে নিল লরা, তারপর নিজের ডেস্ক থেকে বইগুলো তুলে নিল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছে ক্যারি। মেরি পাওয়ার আর মিনির চোখে-মুখে সহানুভূতি, কিন্তু টীচারের ভয়ে ওর দিকে তাকাতে পারছে না। আইডা তাকাল, তারপর ফিরিয়ে নিল দৃষ্টি বইয়ের

ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে নেলী ওলসন, যেন আর কোনও দিকে খেয়াল নেই; কিন্তু ঠোঁটের কোণে খেলা করছে চতুর, বাঁকা হাসি।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে আস্তে করে সেটা ভিড়িয়ে দিল লরা।

গোটা রাস্তা ফাঁকা, কেউ নেই বাইরে। দুপুর দুটোয় বাড়ি ফেরার অভিজ্ঞতা কেমন যেন উদ্ভট ঠেকল ওর কাছে।

'কী হবে এখন, লরা?' কাঁপছে ক্যারির গলা। 'কী করব আমরা এখন?'

'বাড়ি ফিরব, আর কী?' শান্ত লরার কণ্ঠ। স্কুল থেকে বেশ অনেকটা সরে এসেছে ওরা।

'বাবা-মা কী বলবে সব শুনে?'

'যখন বলবে তখনই জানতে পারব,' বলল লরা। তারপর ওকে সান্ত্বনা দিল, 'তোমাকে কিছুই বলবে না, তোমার তো কোন দোষ নেই। দোষ যা হওয়ার আমার হয়েছে। আমিই অত জোরে সীট ঝাঁকিয়েছি।' হঠাৎ হেসে উঠল ও। 'ঠিক করেছি! ভাল করেছি! দরকার হলে আবার করব!'

দরজা খুলে ঘরে ঢুকল ওরা।

ডেস্কে বসে কিছু লিখছিল বাবা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। মা দুলছিল রকিং চেয়ারে বসে, সটান দাঁড়িয়ে পড়ল ওদের দেখে। কোল থেকে উলের বল মেঝেতে পড়ে গড়াতে শুরু করল। ঝাঁপিয়ে পড়ে ওটা নিয়ে খেলতে লেগে গেল কিটি।

'কী হয়েছে' ব্যাপারটা কী?' জিজ্ঞেস করল মা। 'ক্যারি কি অসুস্থ হয়ে পড়েছে?'

'আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে স্কুল থেকে,' শান্ত গলায় বলল লরা।

ধপ্ করে বসে পড়ল মা। অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে বাবার মুখের দিকে। কয়েক মুহূর্ত ভীতিকর বিরতির পর শুধু একটা শব্দ উচ্চারণ করল বাবা, 'কেন?'

'দোষটা আসলে আমার, বাবা,' চট্ করে বলল ক্যারি। 'ম্যামি আর আমি শুরু করেছিলাম...'

'না, দোষ আমার,' বলে পুরো ঘটনাটা খুলে বলল লরা। কথা শেষ হতে আবার সেই ভীতিকর নীরবতা নামল ঘরের ভিতর।

অবশেষে রায় দিল বাবা। 'কাল সকালে স্কুলে যাবে তোমরা। এমন আচরণ করবে যেন এসব কিছুই ঘটেনি। মিস ওয়াইল্ডার ভুল করে থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি টীচার। আমি চাই না আমার মেয়েরা স্কুলে কোনরকম গোলমাল পাকাক।'

'আচ্ছা, বাবা!' বলল ওরা দুজন।

'এবার স্কুলের পোশাক খুলে বই নিয়ে পড়তে বসো,' বলল মা। 'তোমাদের বাবা যেভাবে বলেছে সেভাবে চললে দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

# আট

পরদিন সকালে লরা আর ক্যারিকে দেখে অবাক হয়ে গেল নেলী ওলসন। মনে হলো হতাশও হয়েছে। ও হয়তো ভেবেছিল, যা ঘটে গেল তার ফলে ওরা আর আসবে না স্কুলে।

আইডা ছুটে এসে লরার হাত ধরল।

মেরি পাওয়ার বলল, 'তুমি এসেছ বলে খুব ভাল লাগছে আমার।'

আইডা বলল, 'আর কারও নীচতার জন্যে ও কেন স্কুল ছাড়তে যাবে?'

'আমার লেখাপড়া শেখার পথে কাউকে বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেব না আমি,' বলল লরা।

'তোমাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করলে নিশ্চয়ই লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যেত,' হঠাৎ বলে বসল নেলী।

সরাসরি ওর চোখের দিকে চেয়ে লরা বলল, 'স্কুল থেকে বের করে দেয়ার মত কোনও অন্যায় আমি করিনি, করবও না।'

'আর করলেও তোমাকে এক্সপেল করা যাবে না,' ফোড়ন কাটল নেলী। 'তোমার বাবা যতক্ষণ স্কুল বোর্ডে আছেন।'

'দেখো, নেলী!' মুহূর্তে অগ্নিমূর্তি ধারণ করল লরা। 'আমি চাই না আমার বাবাকে নিয়ে তুমি আমার সামনে আর একটি কথাও বলো! অনেক হয়েছে! আমার বাবাকে নিয়ে তোমার অত মাথা না ঘামালেও চলবে।'

মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল নেলীর মুখটা। কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ঘণ্টা পড়ে গেল; সবাই ছুটল ক্লাসরুমের দিকে।

কোনও দোষ যেন না হয়ে যায়, সে-ব্যাপারে খুব সাবধান থাকল ক্যারি; লরাও বাইরে বাইরে খুবই ভদ্র ব্যবহার করল টীচারের সঙ্গে। কিন্তু আসলে এখনও প্রচণ্ড রাগ ও ঘৃণা অনুভব করছে সে ভিতর ভিতর। জানে, ক্যারির সঙ্গে একচোখো, নিষ্ঠুর আচরণের জন্য ও কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না তাঁকে। শোধ নেয়ার জন্য ফুঁসছে ওর ভিতরটা। বাইরেলে যাই বলুক, অন্তরে ভাল হওয়ার কোন তাগিদই বোধ করছে না ও

আজকের গোলমাল সীমা ছাড়িয়ে গেল। যে যেভাবে পারে, বই-স্লেট-জুতো ঠুকে শব্দ করছে, সেই সঙ্গে ফিসফাস কথাবার্তা তো আছেই। শুধু বড় মেয়েরা আর ক্যারি মন দিয়ে পড়ছে। যেদিকে বেশি গোলমাল সেদিকে ফিরছেন মিস ওয়াইল্ডার, অমনি অন্যদিকে বেড়ে যাচ্ছে গোলমাল। সেদিকে ফিরলে আবার হচ্ছে এদিকে। পাগল হওয়ার জোগাড় হলো তাঁর হঠাৎ বিকট এক আর্ত চিৎকার শুনে চমকে উঠল ক্লাসের সবাই।

একলাফে উঠে দাঁড়িয়েছে চার্লি। দুই হাতে চেপে ধরে আছে নিতম্ব। 'পিন!' চেঁচিয়ে উঠল ও, 'গেছি রে, বাবা! পিন ছিল আমার সীটে!' একটা হাত সামনে বাড়িয়ে বাঁকা পিন দেখাল সে টীচারকে।

ঠোঁট জোড়া চেপে বসেছে একটার ওপর আরেকটা, ভ্রূ-জোড়া কুঁচকে গিয়ে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে চেহারাটা–হাসি নেই মিস ওয়াইল্ডারের মুখে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, 'এদিকে এসো, চার্লি!'

সবার উদ্দেশে চোখ টিপল চার্লি, তারপর ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে চলল টীচারের ডেস্কের দিকে।

'হাত বাড়াও সামনে!' বলেই রুলারটা বের করার জন্য ডেস্কের ভিতর হাত ঢোকালেন। কিছুক্ষণ খুঁজে রুলার না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার রুলারটা দেখেছ কেউ?'

একটা হাতও ওপরে উঠল না। রাগে লাল হয়ে গেল মিস ওয়াইল্ডারের মুখ। চার্লিকে বললেন, 'যাও, ওই কোনায় গিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকো!'

পিছন দিকটা ডলতে ডলতে কোনায় গিয়ে দাঁড়াল চার্লি। জোরে হেসে উঠল ক্ল্যারেন্স আর আলফ্রেড। চট্ করে ওদের দিকে ফিরলেন মিস ওয়াইল্ডার, অমনি ঘাড় ফিরিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে এমনই এক ভেংচি কাটল চার্লি যে হো-হো করে হেসে উঠল ছেলের দল। আবার চার্লির দিকে ফিরলেন তিনি। কিন্তু তার আগেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে চার্লি। তিনি শুধু ওর মাথার পিছনটা দেখতে পেলেন।

পর পর তিন-চারবার এভাবে একবার এদিকে একবার ওদিকে তাকিয়ে হাতে-নাতে ধরবার চেষ্টা করলেন মিস ওয়াইল্ডার, কিন্তু প্রতিবারই বিকট মুখভঙ্গি করে সবাইকে হাসিয়ে বিদ্যুৎবেগে পিছন ফিরল চার্লি  গোটা স্কুল ফেটে পড়ছে হাসির দমকে। এমন কী বড় মেয়েরাও মুখে রুমাল চেপে না হেসে পারল না। কেবল লরা আর ক্যারি বসে রইল পাথরের মূর্তির মত।

মিস ওয়াইল্ডার ডেস্কের ওপর ঠক-ঠক আওয়াজ করলেন। রুলারটা খোয়া গেছে বলে হাতের আঙুলের গাঁট দিয়ে টোকা দিচ্ছেন। কিন্তু কাজ হচ্ছে না। কেউ শুনছে না তাঁর কথা। সারাক্ষণ চার্লির ওপর নজর রাখা সম্ভব নয়, তিনি একটু এদিক ওদিক তাকালেই ঝট করে পিছন ফিরে মুখ ভাঙাচ্ছে চার্লি, আর হো-হো করে হেসে উঠছে ছেলেমেয়েরা।

জানে, কাজটা ঠিক হচ্ছে না, তবু মনে মনে খুশি না হয়ে পারল না লরা। এমন কী ক্ল্যারেন্স যখন সীট থেকে নেমে দুই সারি ডেস্কের মাঝখান দিয়ে চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াল, মুচকি হেসে তাকে উৎসাহ জোগাল ও।

বিরতির সময় বাইরে গেল না লরা। জানে, আরও কী দুষ্টামি করা যায় তাই নিয়ে আলোচনা করবে এখন ছেলেরা, ও তাতে যোগ দিয়ে বাবার অবাধ্য হতে চায় না।

বিরতির পর অবস্থা আরও খারাপ হলো। কাগজের বল লোফালুফি শুরু করল ছেলেরা। ছোট মেয়েরা নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছে, চিঠি চালাচালি করছে। মিস ওয়াইল্ডার যখন ব্ল্যাকবোর্ডে, ক্ল্যারেন্স তার হামাগুড়ি শুরু করল, তাকে অনুসরণ করল আলফ্রেড। চার্লি ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে দিয়ে ওদের টপকে সার্কাস দেখাচ্ছে।

লরার অনুমোদনের জন্য তাকালেই ও মৃদু হেসে প্রশ্রয় দিচ্ছে ওদের।

'এত হাসি কীসের, লরা? হাসছ কেন?' ব্ল্যাকবোর্ড থেকে ঘুরে জানতে চাইলেন মিস ওয়াইল্ডার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে।

'কই, হাসছি না তো!' বই থেকে চোখ তুলে অবাক হওয়ার ভান করল লরা। সবাই চুপ, যে-যার সীটে বসা। যেন কত ব্যস্ত পড়াশোনায়।

'খেয়াল রেখো, এখানে পড়তে এসেছ, হাসাহাসি করতে নয়!' কথাটা বলে মিস ওয়াইল্ডার বোর্ডের দিকে ফিরতেই লরা আর ক্যারি ছাড়া ক্লাসের প্রায় সবাই হো-হো করে হেসে উঠল।

গোলমাল বাড়তে বাড়তে এমন এক পর্যায়ে গেল যে আধ-ঘণ্টা আগেই স্কুল ছুটি দিয়ে দিলেন মিস ওয়াইল্ডার। বাড়ি ফিরে আজও কৈফিয়ৎ দিতে হলো লরা আর ক্যারিকে।

সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেল বাবা। ওদের বলল, 'তোমরা নিজেরা ঠিক থাকবে, এসবের মধ্যে জড়াবে না কিছুতেই। বুঝেছ?'

বুঝেছে। কিন্তু পরদিন গোলমাল বাড়ল আরও। স্কুলের প্রায় সবাই খোলাখুলি ব্যঙ্গ করতে শুরু করল মিস ওয়াইল্ডারকে নিয়ে। শুধু দুইবার মুচকি হেসে দুষ্টামিকে প্রশ্রয় দিয়ে স্কুলের শৃঙ্খলার যে কতটা ক্ষতি করে বসেছে ও, বুঝতে পারছে লরা। কিন্তু তার জন্য বিন্দুমাত্র অনুশোচনা আসছে না ওর মনে মিস ওয়াইল্ডারকে কোনদিন ও ক্ষমা করতে পারবে কি না সন্দেহ।

সবাইকে মিস ওয়াইল্ডারের বিরুদ্ধে চলে যেতে দেখে নেলীও ভিড়ে গেল তাদের দলে টীচারের নামে সত্য-মিথ্যা নানান গল্প বলে প্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছে সবার কাছে। কবে ছোটবেলায় একবার মাথায় উকুন হয়েছিল ইলাইযা জেন ওয়াইল্ডারের, মা চিকন চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়ে দিয়ে বের করেছিল সবগুলো, ফলে স্কুলে পৌঁছতে দেরি করে ফেলেছিল সে এবং তার নাম দেয়া হয়েছিলঃ লেযি, লাউযি, লিযি জেন—ইত্যাদি বলে সবাইকে আনন্দ দেয়ার চেষ্টা করছে।

বড় মেয়েরা সবাই জানে নেলী দুমুখো সাপ। ওরা সিদ্ধান্ত নিল নেলীর সামনে মুখ খুলবে না।

লেখাপড়ার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেল। ছেলেরা আসে কেবল মিস ওয়াইল্ডারকে বিরক্ত করবার জন্য, দাঁতের ফাঁক দিয়ে সিটি বাজায়, বল ছোঁড়াছুঁড়ি করে খেলে, কার্টুন আঁকে, ছড়া বানায়, এমন কী সবাই মিলে একটা গানও বেঁধে ফেলল টীচারের নামে।

দুপুরে ডিনার খাওয়ার জন্য বাড়ি ফেরার পথে শুনল লরা ছেলেরা গাইছেঃ

'স্কুলে যাওয়া বেজায় মজা,
হাসতে হাসতে হচ্ছি খুন,
হাসির খোরাক কে হলেন?
লেযি, লাউযি, লিযি জেন!'

এই সঙ্গীত রচনায় লরারও কিছু অবদান আছে, কথাটা ভাবতে ঠিক খারাপ

যে লাগছে তা নয়, তবে ভয় লাগছে রচয়িতার পরিচয় প্রকাশ হয়ে যেতে পারে ভেবে।

নেলীর হয়েছে উভয়সঙ্কট। স্কুলহাউস ঘিরে ছেলেরা যে গান গাইছে সেটা যে নেলীর বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া তার কোনও ভাবে কারও জানবার কথা নয়, এটুকু বোঝার মত বুদ্ধি মিস ওয়াইল্ডারের আছে। কাজেই নেলীর এখন কারও কাছেই কোনও দাম নেই।

অবস্থা যখন চরমে পৌঁছল, তখন একদিন বিশৃঙ্খল ক্লাসরুমে ঢুকল বাবা সঙ্গে আরও দুজন স্কুল বোর্ডের সদস্যকে নিয়ে।

'গুড মর্নিং, মিস ওয়াইল্ডার,' বলল বাবা। 'স্কুলের কার্যক্রম সরেজমিনে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্কুল বোর্ড।'

'হ্যাঁ, একটা কিছু করা খুবই দরকার হয়ে পড়েছে, বললেন মিস ওয়াইল্ডার। তারপর অভিবাদন জানালেন অপর দুই সদস্যকে। 'গুড মর্নিং।'

মূর্তির মত বসে থাকা ছেলেমেয়েদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে সবার চেয়ে লম্বা ভদ্রলোক বললেন, 'শুনলাম, কিছু অসুবিধা হচ্ছে আপনার?'

'হ্যাঁ, কারণটা আপনাদের জানা দরকার,' বললেন মিস ওয়াইল্ডার। 'সমস্ত গোলমাল সৃষ্টি করছে আসলে ওই লরা ইঙ্গলস ওর ধারণা, ওর যেমন খুশি তেমনি চলবে স্কুল, যেহেতু ওর বাবা এই স্কুল বোর্ডের সদস্য। হ্যাঁ, মিস্টার ইঙ্গলস, ঠিকই বলছি আমি! ও বড়াই করে বলে বেড়ায়, ওর ইচ্ছেয় চলতে হবে স্কুলকে। ও ভাবতেও পারেনি কথাটা আমার কানে আসবে, কিন্তু এসেছে!' লরার দিকে অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করলেন তিনি।

হাঁ করে চেয়ে থাকল লরা। ভাবতেও পারেনি, মিথ্যে কথা বলবেন মিস ওয়াইল্ডার।

'কথাটা শুনে খুবই খারাপ লাগছে আমার, মিস ওয়াইল্ডার,' বলল বাবা। 'যদিও আমি ভাল করেই জানি, এরকম বড়াই করা ওর স্বভাব নয়।'

লরা হাত তুলল প্রতিবাদ করবে বলে, কিন্তু বাবা মাথা নাড়ল।

'ছেলেদের ও আস্কারা দেয়, তাদের দিয়ে ক্লাসে হট্টগোল করায়, নিয়ম-শৃঙ্খলা অমান্য করায়,' বলে চললেন মিস ওয়াইল্ডার। 'সমস্ত অবাধ্যতা, দুষ্টামি আর গণ্ডগোলের মূল হচ্ছে আসলে লরা!'

চার্লির দিকে ফিরল বাবা। বলল, 'শুনলাম বাঁকা একটা পিনের ওপর বসায় শাস্তি হয়েছে তোমার, খোকা?'

'না, স্যার!' জবাব দিল চার্লি। মুখটা এমন করে রেখেছে যেন নির্ভেজাল ভালমানুষ। 'ওর ওপর বসার জন্যে শাস্তি দেয়া হয়নি আমাকে, স্যার, দেয়া হয়েছে ওটার খোঁচায় ব্যথা পেয়ে লাফিয়ে ওঠার জন্যে।'

বোর্ডের একজন সদস্য হাসি সামলাতে গিয়ে জোরে কেশে উঠলেন। লম্বা, গম্ভীর সদস্যের গোঁফজোড়াও একটু যেন কেঁপে উঠল। বাবা নির্বিকার।

এবার শান্ত গলায়, প্রতিটি শব্দের ওপর জোর দিয়ে বাবা বলল, 'মিস ওয়াইল্ডার, আমরা চাই আপনি নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখুন যে, এই স্কুলে নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষায় আপনার যে-কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করার কাজে স্কুল বোর্ড

আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্থন দেবে।' এবার ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে কঠোর গলায় বলল, 'আর তোমাদের বলছি, তোমরা প্রত্যেকে মিস ওয়াইল্ডারের প্রতিটা নির্দেশ মান্য করবে, ভাল ও ভদ্র হয়ে চলবে, মন দিয়ে লেখাপড়া শিখবে, ভুলেও তাঁর অবাধ্য হবে না। এই স্কুলটা ভাল একটা স্কুল হিসেবে সুনাম অর্জন করুক, এটা আমরা সবাই চাই, তোমাদেরকেও তা চাইতে হবে।' গোটা স্কুল একেবারে চুপ।

বক্তব্য শেষ হলে মিস ওয়াইল্ডারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল স্কুল বোর্ড। তারপরেও নীরবতা ভঙ্গ করল না কেউ, কোনরকম উসখুস বা ফিসফাস নেই, এক মনে পড়া তৈরি করছে। অবাক ব্যাপার আজ পড়াও পারল সবাই, এক-আধটু ভুল হলেও ধরলেন না মিস ওয়াইল্ডার।

সাপারের পর লরাকে জিজ্ঞেস করল বাবা, 'কাকে কী বলেছিলে তুমি যে মিস ওয়াইল্ডারের ধারণা হলো তুমি বাবার জোরে বলীয়ান হয়ে তাঁর ওপর লাঠি ঘোরাতে চাও?'

'এরকম কোনও কথা কাউকে বলিনি আমি, এমন কী ভাবিওনি কোনদিন,' জবাব দিল লরা।

'আমি জানি তুমি বলোনি, কিন্তু এসব কথা ওঁর মাথায় ঢুকল কী করে, লরা? আর কেউ বলেছে–কে হতে পারে?'

থতমত খেয়ে গেল লরা। এই প্রশ্নের সম্মুখীন হবে তা ভাবতেও পারেনি। এতক্ষণ মনে মনে কথা সাজাচ্ছিল, কীভাবে বললে বাবা বিশ্বাস করবে যে মিস ওয়াইল্ডার একজন ডাহা মিথ্যেবাদী। আসলে যে আর কারও মাধ্যমে কথাটা তাঁর কানে যেতে পারে এটা ওর মাথায় একবারও আসেনি।

'তুমি কী কাউকে বলেছিলে যে আমি স্কুল বোর্ডে আছি?' আবার জিজ্ঞেস করল বাবা।

হঠাৎ নেলী ওলসনের সঙ্গে ঝগড়ার কথাটা মনে পড়ে গেল ওর। পুরো ঘটনাটা যেন দেখতেও পাচ্ছে পরিষ্কার।

প্রায় দৌড়ে ফিরে এল ওরা স্কুলে। চোখ-মুখ লাল, বাইরের বাতাসে চুল উস্কোখুস্কো। ধবধবে পরিষ্কার জামা পরে ভদ্রমহিলার ভঙ্গি নিয়ে বসে আছে নেলী ক্লাসে। নাকের নীচ দিয়ে চাইল নেলী লরার দিকে। লরা স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকল ওর চোখে চোখে। একটা কাঁধ আর চিবুক নেড়ে অবজ্ঞা প্রকাশ করল নেলী। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'লরা ইঙ্গলস, তুমি নিজেকে যত যাই ভাবো না কেন, মিস ওয়াইল্ডার বলেছেন, স্কুল বোর্ডের মেম্বার হলে কী হবে, স্কুলের ব্যাপারে তোমার বাবার কথার তেমন কোন গুরুত্ব নেই।'

'কী বললে?' ফোঁস করে উঠল লরা।

'আমার ধারণা,' রেগে গিয়ে বলল আইডা, 'লরার বাবার মতামতের দাম অন্য আর সবার সমান তো বটেই, বরং বেশি আছে। তাই না, লরা?'

'নিশ্চয়ই!' জবাব দিল লরা।

'ঠিক,' বলল এবার মেরি পাওয়ার। 'আমি বলব, বেশিই আছে। কারণ, তাঁর

দুই মেয়ে এ-স্কুলের ছাত্রী। বাকি দুজনের তো সন্তানই নেই।'

বাবার নামে বাজে কথা বলায় রাগে ফুঁসছে লরা, নিজেকে আর সামলাতে পারল না; বলে বসল, 'তোমরা অতি সাধারণ গ্রামের মানুষ, নেলী। যদি শহরের লোক হতে, যোগ্যতা থাকলে হয়তো তোমার বাবাও তখন স্কুল বোর্ডের সদস্য হতে পারতেন, তাঁরও দু-চারটে কথা বলার অধিকার থাকত।'

'এই তো!' বলে উঠল মা। 'ওকে রাগিয়ে দিয়েছিলে!'

'ইচ্ছে করেই বলেছি,' কথাগুলো ভাবতে গিয়ে আবার রেগে উঠেছে লরা। 'বার বার খোঁচা খেতে খেতে আমিও ওকে পাল্টা আঘাত করতে চেয়েছিলাম। তুমি তো জান, মা, প্লাম ক্রীকে থাকতে ও মেরি আর আমাকে কত ভাবে অপমান করেছে! আমাদের 'গাঁইয়া' বলে ঠোঁট উল্টেছে, তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে, বাবার সম্বন্ধে যা-তা বলেছে, এমন কী আমাদের–আমাদের জ্যাকের সঙ্গেও–' কথাটা আর শেষ করতে পারল না ও, পানি এসে গেল চোখে।

'লরা! লরা!' মাথা নাড়ল মা। 'ক্ষমা করতে শেখো, মা। ওসব তো কতদিন আগের কথা!'

'বোঝা গেল তা হলে,' বলল বাবা। 'নেলীই তোমার নামে সত্য-মিথ্যা গিয়ে লাগিয়েছে মিস ওয়াইল্ডারের কাছে, তোমার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছে তাঁকে। যাক, এ-থেকে তোমার শেখার আছে অনেক কিছু।'

মা বলল, 'তোমার অ্যালবামটা আনো তো, লরা–ছোট্ট একটা কবিতা মনে পড়েছে, লিখে দিই।'

দৌড়ে গিয়ে অ্যালবাম নিয়ে এল লরা। একটা পাতায় গোটা গোটা অক্ষরে মা লিখল

'জ্ঞানী লোক তার চলার পথে,
পাঁচটি বিষয় লক্ষ রাখে:
কার ব্যাপারে বলছে কথা,
কোনখানে আর কীভাবে,
কখন এবং কাকে ॥'

–তোমার মা
সি. এল. ইঙ্গলস.
ডি স্মেট, নভেম্বর ১৫, ১৮৮১

## নয়

শরৎকালটা পড়িয়েই মিনেসোটায় ফিরে গেলেন মিস ওয়াইল্ডার। শীতকালের জন্য শিক্ষক নির্বাচিত হলেন মিস্টার ক্লিউয়েট। শান্ত, কিন্তু দৃঢ় মানুষ মিস্টার ক্লিওয়েট। টুঁ-শব্দ নেই ক্লাসে।

বড় ছেলেরাও সবাই স্কুলে আসছে এখন। দ্রুত এগোচ্ছে সবার পড়াশোনা।

কিন্তু এ-বছর এখন পর্যন্ত বরফের দেখা নেই। বিরতির সময় ছেলেরা মাঠে বেসবল খেলে, বড় মেয়েরা এখন আর বাইরে তেমন একটা যায় না।

বিরতির সময়ও লরা ডেস্ক ছেড়ে নড়ে না, ডুবে থাকে পড়ায়। যদিও ক্লাসে সব বিষয়ে সবার চেয়ে বেশি নম্বর পায় ও, তবু ওর ভয়, যদি টীচার হতে না পারে! প্রায় পনেরো হতে চলল ওর বয়স, ষোল হলেই পরীক্ষা দিয়ে টীচিং সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে চায় ও। তা হলে মেরির কলেজের খরচ মেটানো ওদের পক্ষে সহজ হবে।

তবে ওকে বেশিক্ষণ একা থাকতে দেয় না আইডা, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যায় আড্ডায়। ওরা একে অপরের অ্যালবামে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কবিতা লিখে সই করে।

নিজের নামে কার্ড তৈরি করিয়ে বান্ধবীদের মধ্যে বিলি করার ফ্যাশন চালু হয়েছে শুনে ওরাও কার্ড ছাপাল।

লরা যেদিন নিজের কার্ডগুলো ডেলিভারি নিয়ে প্রেস থেকে বেরুলো, সেদিন এক মজার কাণ্ড ঘটে গেল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর একবার দেখছে ছাপার অক্ষরে নিজের নামটা: লরা এলিজাবেথ ইঙ্গলস, হঠাৎ ঝকঝকে একটা বাগি দাঁড়িয়ে পড়ল ওর পাশে। চোখ তুলেই বাদামি রঙের মরগান ঘোড়াদুটোকে দেখতে পেল লরা। আলমানযো ওয়াইল্ডার টুপিটা একহাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাগির পাশে। অপর হাতটা বাড়িয়ে দিল সামনে, 'স্কুলে যাচ্ছ বুঝি? আপত্তি না থাকলে উঠে পড়ো, তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যাবে।'

আলমানযোর হাত ধরে বাগিতে উঠে বসল লরা। পাশে বসে আলমানযো ছেড়ে দিল গাড়ি। বিস্ময়, লজ্জা আর আনন্দে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে লরার। সত্যিই কোনদিন এই গাড়িতে চড়ার সৌভাগ্য হবে, ভাবেনি ও আসলে। মনে মনে চাইত, ব্যস ওই পর্যন্তই। চড়ে মনে হচ্ছে স্বপ্নের মধ্যে রাজহাঁসের মত হাওয়ায় ভেসে উড়ে চলেছে ও।

'আ--আমি লরা ইঙ্গলস,' সম্বিত ফিরে পেয়ে বলল লরা। যদিও জানে, ও কে তা ভাল করেই জানা আছে ভদ্রলোকের।

'জানি আমি,' বলল আলমানযো সহজ গলায়। 'তোমার বাবার সঙ্গে আমাদের ভাল পরিচয় আছে। তা ছাড়া আমার বোন প্রায়ই তোমার কথা বলত।'

'কী অপূর্ব সুন্দর ঘোড়া!' মনের কথাটা বলে ফেলল লরা। 'কী নাম ওদের?'

'এপাশেরটা লেডি, আর ওপাশেরটা হচ্ছে প্রিন্স,' ঘোড়ার প্রশংসায় খুশি হয়ে উত্তর দিল আলমানযো।

এরপর দুজনেই চুপ। কী বলবে, কথা খুঁজে পাচ্ছে না লরা। শেষে বলল, 'প্রেস থেকে আমার নেইম কার্ড ডেলিভারি নিলাম আজ।'

'তাই বুঝি?' পকেটে হাত ভরল আলমানযো। 'আমারগুলো সাদামাঠা বিজনেস কার্ড। মিনেসোটা থেকে তৈরি করিয়েছি।' একটা কার্ড বের করে লরার হাতে দিল আলমানযো। সাদা কার্ডে কালো কালিতে লেখা আলমানযো জেমস ওয়াইল্ডার।

'নামটা উদ্ভট, তাই না?' বলল আলমানযো।

কিছু একটা বলা দরকার, কিন্তু মাথায় তেমন কিছুই খেলল না ওর, বলল, 'নতুনত্ব আছে।'

'এটা আমার ঘাড়ে এসে চেপেছে পরিবারের তরফ থেকে,' গম্ভীর সুরে বলল আলমানযো। 'আমাদের বংশে কারও না কারও এই নাম রাখতেই হয়। বহু বছর আগে ক্রুসেডের সময় আমাদের পূর্বপুরুষ কোনও এক ওয়াইল্ডারকে নাকি এই নামের এক আরব মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। তার নাম ছিল আল মানযুর। ওটাই কয়েক পুরুষে বদলে গিয়ে এই নামে দাঁড়িয়েছে।'

'নামটা শুধু অসাধারণ নয়, এর একটা ঐতিহাসিক মূল্যও আছে,' বলল লরা। তারপর আবার বলল, 'ভাল নাম।' সততার সঙ্গেই বলল ও কথাটা, কিন্তু ওই নামের কার্ডটা কী করতে হবে বুঝতে পারছে না। হাতে ধরে রেখেছে ওটা, ফেরত দেয়াটা কি অভদ্রতা হবে? কিংবা ফেরত না দেয়াটা? যদি ফেরত না নেয়, তা হলে কি ওর নিজের একটা কার্ড ওকে দেয়া উচিত?

কিন্তু কিছুই বলছে না আলমানযো, স্কুলহাউসটা কাছে এসে যাচ্ছে।

'আপ–আপনার কার্ডটা ফেরত নেবেন না?' শেষমেষ জিজ্ঞেস করল লরা।

'তুমি ওটা রাখতে পার, ইচ্ছে করলে,' জবাব এল।

'তা হলে আমার একটা কার্ড দিই আপনাকে,' বলে প্যাকেট থেকে একটা কার্ড বের করে ওর হাতে দিল লরা।

'বাহ্, সুন্দর কার্ড তো!' বলে ওটা পকেটে রেখে দিল আলমানযো।

স্কুলহাউসের দরজার সামনে থামল বাগি। বাগি থেকে নেমে টুপি খুলে হাতে নিল আলমানযো, তারপর লরাকে সাহায্য করল নামতে।

'গাড়ি চড়তে খুব ভাল লাগল, আপনাকে ধন্যবাদ!' বলল লরা।

'আমারও ভাল লাগল,' সহজ কণ্ঠে বলল আলমানযো, মুচকি হেসে যোগ করল, 'ধন্যবাদ!'

'হ্যাল্লো, ওয়াইল্ডার!' মাঠ থেকে হাঁক ছাড়ল ক্যাপ গারল্যান্ড।

ওর দিকে হাত নেড়ে রওনা হয়ে গেল গাড়ি। এদিকে ঘণ্টা বাজাতে শুরু করেছেন মিস্টার ক্লিউয়েট। চট করে ক্লাসরুমে ঢুকে পড়ল লরা।

সীটে বসতে না বসতেই পুলকিত আইডা ওর বাহু ধরে চাপ দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ইশ্‌শ্! তুমি যখন বাগি থেকে নামছ, তখন যদি ওর মুখটা দেখতে একবার!'

ওধার থেকে একগাল হাসি লরার দিকে ছুঁড়ে দিল মেরি পাওয়ার আর মিনি। নেলী শুধু পাথরের মূর্তির মত বসে থাকল অন্যদিকে চেয়ে।

শহরে নানান রকম সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গেল। বিশেষ বিশেষ দিনে স্কুল হাউসে গিয়ে জড়ো হয় শহরবাসী নারী-পুরুষ। কোনদিন গানের জলসা, কোনদিন বানান প্রতিযোগিতা, কোনদিন নাটক বা ক্যারিকেচারের আয়োজন করা হয়। সবাই মিলে নিত্যনতুন বুদ্ধি বের করে দূর করে একঘেয়েমি, উপভোগ করে একে অপরের সান্নিধ্য। লেখাপড়ার পাশাপাশি এইসব কর্মকাণ্ডে যোগ দিয়ে চমৎকার কাটে লরার সময়।

কিটি বড় হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে গোটা শহরে নাম ছড়িয়ে পড়েছে ওর। ওর প্রিয় কাজ হচ্ছে দরজার বাইরে সিঁড়ির ওপর বসে রাস্তার লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া দেখা। প্রথম প্রথম মজা দেখার জন্য কেউ কেউ ওর পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ওই একবারই, সেসব কুকুর আর জীবনে ওর সঙ্গে লাগতে আসেনি। নতুন কুকুর হলে এখনও এক-আধটা ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসে। চুপচাপ বসে থাকে কিটি, কুকুরটা কাছে এলেই 'ফ্যাঁচ' করে বিকট এক চিৎকার দিয়ে একলাফে চড়ে বসে ওর পিঠে। সামনের দুইপায়ের নখ দিয়ে ওর নাকে-মুখে চালাতে থাকে থাবার পর থাবা। পড়ি কি মরি করে দৌড় লাগায় কুকুরটা আর্ত চিৎকার করতে করতে। ওটাকে বেশ কিছুদূর দাবড়ে নেয়ার পর ওর পিঠ থেকে নেমে বিজয়িনীর ভঙ্গিতে হেলেদুলে ফিরে এসে বসে কিটি সিঁড়ির ওপর। আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন কোনও কুকুর বা তার মালিক আর দ্বিতীয়বার লাগতে আসে না ওর সঙ্গে।

মাঝে মাঝে মেরির চিঠি আসে, এখান থেকে প্রতি সপ্তাহে দীর্ঘ চিঠি যায়—বাবা থেকে শুরু করে গ্রেস পর্যন্ত সবাই লেখে ওকে।

বসন্তে ফিরে এল ওরা নিজেদের খামারে। বাবা লেগে গেছে চাষাবাদের কাজে মুরগির বাচ্চাগুলো বড় হয়ে ডিম পাড়তে শুরু করেছে। কিটি গোফার ধরে খেয়ে খেয়ে মোটা তাজা হয়েছে। প্রায়ই পরিবারের সবার খাওয়ার জন্য একগাদা গোফার মেরে এনে সাজিয়ে রাখে দরজার বাইরে। ওর অত্যাচারে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হলো অসংখ্য গোফার পরিবার।

ফসল যখন পাকল, এ বছরও এল কালো পাখি—কিন্তু সংখ্যায় অনেক কম। এদেরও বেশ কয়েকটা মারা পড়ল কিটির হাতে, কিছু মরল বাবার বন্দুকের গুলিতে। কিন্তু তার পরেও অনেক ক্ষতি করল ওরা ফসলের।

আবার এল শরৎকাল। শহরে চলে এল ওরা। স্কুলে যেতে শুরু করল আবার লরা আর ক্যারি। নতুন টীচার মিস্টার আউয়েন পড়াচ্ছেন এবছর। ইনি সেই মিস্টার স্যাম আউয়েনের ছেলে, চৌঠা জুলাইয়ের বাগি রেসে আলমানযো ওয়াইল্ডারের মরগানের কাছে যাঁর বে-গুলো পরাজিত হয়েছিল। এঁর বয়স বেশি না, কিন্তু খুবই ভাল পড়ান, আর অত্যন্ত গুরু-গম্ভীর, দায়িত্বশীল মানুষ; কয়েকদিনেই ছাত্র-ছাত্রীদের—বিশেষ করে লরার ভক্তি-শ্রদ্ধা অর্জন করে নিলেন।

ছাত্র বেড়ে যাওয়ায় একদিন মিস্টার আউয়েন বললেন স্কুলটাকে বাড়ানো

দরকার। শহরবাসীকে দিয়ে এই বাড়তি খরচ করাতে হলে আগে তাদের মুগ্ধ করতে হবে স্কুল এগজিবিশনের মাধ্যমে।

'এজন্যে তোমাদের ওপর নির্ভর করছি আমি। আমরা এমন শো দেব যে শহরবাসী এটাকে নিজ দায়িত্ব বলে মনে করবে।'

শুরু হলো প্রস্তুতি। লরা আর আইডার ওপর পড়ল গোটা মার্কিন ইতিহাস মুখস্থ বলার ভার। সারা স্কুলে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। উৎসাহ-উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়বে স্কুলহাউসটা।

এদিকে চার্চে শুরু হয়েছে রিভাইভাল মীটিং—পরপর সাতদিন চলবে একটানা। স্কুলে লেখাপড়ার পর এগজিবিশনের রিহার্সাল শেষ করে বাড়ি পৌঁছে চারটে খেয়ে প্লেট ধুয়ে আবার কিছুক্ষণ পড়ে নেয় লরা। কিন্তু মার তাগাদায় বই রেখে পোশাক পরতে হয় গির্জায় যাবে বলে।

আশেপাশের কয়েকটা কাউন্টি থেকে অনেক লোক আসছে রিভাইভাল মীটিঙে, ফলে চার্চে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। কপালগুণে কয়েকটা খালি সীট পেয়ে বসতে পারল ওরা। রেভারেন্ড ব্রাউন শুরু করলেন ১৫৪ নম্বর হিম দিয়ে। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে গলা মেলাল তাঁর সঙ্গে। তারপর দীর্ঘ প্রার্থনা। তারপর আবার হিম। চলল এইভাবে। সবশেষে কয়েকজন সামনে এগিয়ে গিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে বসল, এরা পাপ করেছে, অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চায় ঈশ্বরের।

গ্রেসকে কোলে নিয়ে বাবা বলল, 'চলো এবার, যাই।'

বাবা-মার পিছনে হাঁটছে লরা, কেউ যেন ওর কোটের আস্তীনে হাত রাখল, পরমুহূর্তে একটা গলা শুনতে পেল, 'তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই?'

লরা চেয়ে দেখল দাঁড়িয়ে রয়েছে আলমানযো ওয়াইল্ডার।

কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না লরা। এমন কী মাথা ঝাঁকাতেও ভুলে গেছে। ওর বাহু ধরে ভিড় বাঁচিয়ে ওকে বাইরে নিয়ে এল আলমানযো। চার্চ থেকে বেরিয়ে বাবা সবে বাতিটা জ্বেলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, মা বলে উঠল, 'আরে! লরা গেল কোথায়?' পিছন ফিরে আলমানযোর সঙ্গে লরাকে আসতে দেখে ছানাবড়া হয়ে গেল মার চোখ।

'চলে এসো, ক্যারোলিন,' ডাকল বাবা। চোখ বড় করে লরাকে দেখে নিয়ে পিছন ফিরল মা, কিন্তু ক্যারি আর দৃষ্টি ফেরাতে পারছে না, হাঁ করা মুখটাও বন্ধ করতে ভুলে গেছে। মা ওকে টেনে নিয়ে এগোল।

বরফ জমে সাদা হয়ে আছে রাস্তাটা। ঠাণ্ডা পড়েছে খুব। কিন্তু হাওয়া নেই। ঝিলমিল করছে পরিষ্কার আকাশে উজ্জ্বল তারাগুলো। কথা বলছে না আলমানযো, লরাও বুঝতে পারছে না কী বলবে। চুরুটের হালকা গন্ধ আসছে আলমানযোর ভারি কোট থেকে। ভালই লাগছে লরার, তবে অপরিচিত; বাবার পাইপের গন্ধের মত আপন নয়।

'ভাগ্যিস এবার তুষার-ঝড় নেই!' অবশেষে বলল লরা।

'হ্যাঁ, এবারের শীত অনেক নমনীয়,' বলল আলমানযো।

আবার চুপ। পায়ের নীচে বরফ ভাঙার মৃদু শব্দ শুধু আসছে কানে। পরিষ্কার দেখতে পেল লরা, লণ্ঠন হাতে রাস্তা পার হয়ে বাবা বাড়িতে ঢুকছে, তার পিছু

নিয়ে বাকি সবাই।

বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল লরা আর আলমানযো।

'তা হলে, শুভরাত্রি,' বলল আলমানযো। এক পা পিছিয়ে মাথা থেকে টুপি খুলল। 'কাল রাতে আবার দেখা হবে।'

'গুড নাইট,' বলেই আর দেরি করল না লরা। দরজা খুলে ঢুকে পড়ল বাড়িতে। লণ্ঠন উঁচু করে ধরে রেখেছে বাবা, মা বাতি জ্বালছে। বাবার কথার শেষটুকু শুনতে পেল ও, '–বিশ্বাস আছে আমার, আর এ তো শুধু গির্জা থেকে বাড়ি পর্যন্ত হেঁটে আসা।'

'কিন্তু মাত্র পনেরো বছর বয়স ওর!' বলল মা।

একটু শব্দ করে দরজা বন্ধ করল লরা। বাতি জ্বালা হয়ে গেছে। ফিরে চাইল বাবা। জানতে চাইল, 'রিভাইভাল মীটিংটা কেমন লাগল তোমার, লরা?'

'ভাল, তবে একটু নাটুকে,' জবাব দিল লরা। 'রেভারেন্ড অ্যালডেনের সারমন আমার অনেক বেশি ভাল লাগে।'

'ঠিক বলেছ,' সমর্থন করল বাবা। 'আমারও।'

পরদিন বেশ কয়েকবার মনে হলো ওর আলমানযো ওয়াইল্ডারের কথা। যেহেতু দুবছর যাবত উনি হোমস্টেডার, আর একুশ বছর বয়স না হলে হোমস্টেড ক্লেইম করা যায় না–ভদ্রলোকের বয়স এখন অন্তত তেইশ। এত বড় একজন মানুষ ওকে বাড়ি পৌঁছে দেবার প্রস্তাব দিচ্ছেন কেন? আসলে ও তখনও জানে না উনিশ বছর বয়সেই বয়স ভাঁড়িয়ে হোমস্টেড ক্লেইম করেছিল আলমানযো ওয়াইল্ডার।

দ্বিতীয় রাতে ধর্মোপদেশ শেষ হতেই বাবা বলল, 'চলো, যাই।'

গির্জার দরজার কাছে বেশ কয়েকজন যুবক দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারা পছন্দ মত মহিলাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার প্রস্তাব দিচ্ছে। তাদের মধ্যে আলমানযোকে দাঁড়ানো দেখে লজ্জায় লাল হয়ে গেল লরা। আজও জিজ্ঞেস করল ও, 'তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই?'

নরম গলায় বলল লরা, 'আচ্ছা।'

আজ আর বোবা হয়ে থাকতে হলো না লরাকে। কাল রাতেই ভেবে রেখেছে কী কী বিষয়ে ও আলাপ করতে পারত। পথে মিনেসোটার কথা বলল ও, বলল প্লাম ক্রীকে থাকত ওরা। আলমানযো বলল ওরা থাকত স্প্রিং ভ্যালিতে; তার আগে নিউ ইয়র্ক স্টেটে থাকত ম্যালোন শহরের কাছে এক গ্রামে। বাড়ির সামনে এসে গুড নাইট বলে ঢুকে পড়ল লরা ভিড়ানো দরজা ঠেলে।

সাতদিন চলল এইভাবে, রিভাইভাল মীটিঙের পর প্রতিদিন আলমানযো পৌঁছে দিল ওকে বাড়ির দরজা পর্যন্ত। কেন, তা লরা জানে না। সপ্তাহটা শেষ হতেই আবার লেখাপড়ায় মত্ত হয়ে গেল ও, স্কুল এগজিবিশনের ভয়ে ভুলেই গেল আলমানযোর কথা।

# দশ

ভয় পেয়েছে দু-বোনই।

ক্যারির সরু মুখটায় বড় বড় চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন। লরা যখন ওর চুলের ফিতে বেঁধে দিচ্ছে, তখনও বিড় বিড় করছে ও চিজেল ইন হ্যান্ড স্টুড দ্য স্কাল্পটার বয়। চুল বাঁধা হয়ে যেতে হাঁক ছাড়ল, 'ওমা, আরেকবার শোনো না, প্রথম থেকে বলি?'

'আর এখন শোনার সময় নেই, ক্যারি,' বলল মা। 'দেরি হয়ে গেছে এমনিতেই। চট্ করে জামা-কাপড় পরে নাও। আমি জানি, ঝরঝরে মুখস্থ হয়ে গেছে তোমার সবকিছু। স্টেজে উঠে ঘাবড়িয়ো না, তা হলেই হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, যাওয়ার পথে আর একবার না হয় শুনব। লরা, আর কত দেরি তোমার?'

'হয়ে গেছে, মা। আসছি।'

বাতি নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে ওরা যখন বাইরে বেরুলো, তখন রাস্তার উপর মনে হলো বাতাসের ধাক্কায় স্রোত বইছে তুষারের। হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে আওড়াচ্ছে লরা : ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন ১৪৯২ সালে। ইটালীর জেনোয়া নিবাসী কলম্বাস–

'আরে! ব্যাপারটা কী! চার্চে আবার বাতি জ্বেলেছে কেন?'

স্কুলহাউসে জ্বলছে অসংখ্য বাতি, এখন আবার গির্জাতেও জ্বলতে শুরু করেছে একের পর এক। কয়েকজনকে লণ্ঠন হাতে গির্জার দিকে যেতে দেখে বাবা জিজ্ঞেস করল ব্যাপার কী।

জবাব দিলেন মিস্টার ব্র্যাডলি, 'এত লোক এসেছে যে স্কুলহাউসে জায়গা হচ্ছে না। তাই সবাইকে গির্জায় যেতে বলেছে আউয়েন।'

'শুনলাম, তুমি নাকি আজ আমাদের তাক লাগিয়ে দেবে, লরা?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ব্র্যাডলি।

কী জবাব দিল বলতে পারবে না লরা। ওর মাথায় তখন রেলগাড়ির মত চলছে আমেরিকার ইতিহাস।

ঢোকার মুখে মানুষের ভিড় এত বেশি যে লরার ভয় হলো, এর ভেতর দিয়ে এগোলে চুলের কাঁটা একটাও থাকবে না জায়গা মত। কোনমতে ভেতরে ঢুকে দেখা গেল সীটগুলো প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। দুই সারির মাঝখান দিয়ে হাঁটছে মানুষ, খুঁজছে খালি সীট। মিস্টার আউয়েন স্টেজে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছেন, 'সামনের সীটগুলোতে দয়া করে কেউ বসবেন না, এগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে সংরক্ষিত। স্কুলের ছেলেমেয়েরা, তোমরা সামনে চলে এসো, এখনই শুরু হবে তোমাদের আজকের অনুষ্ঠান।'

একটু পরেই মিস্টার আউয়েন নেমে এসে লরাকে বললেন, 'আমেরিকান

প্রেসিডেন্টদের ছবিগুলো টাঙানো হচ্ছে পিছনের দেয়ালে–স্কুলহাউসে যেমন ছিল ঠিক তেমনি ভাবে, বুঝলে? আর আমার ছড়িটা রেখেছি পুলপিটের ওপর। জর্জ ওয়াশিংটন পর্যন্ত এসেই তুলে নেবে ছড়িটা, বুঝেছ? যখন যার প্রসঙ্গে বলছ, তার দিকে ছড়িটা তাক করবে, তা হলে মনে করতে সুবিধে হবে, বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ, স্যার,' বলল লরা। বুঝতে পেরেছে, ও একা নয়, ভয় পাচ্ছেন মিস্টার আউয়েনও।

লরা বসে পড়ল আইডার পাশে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ভয়ে জান উড়ে গেছে আইডার–হাসিটা নিষ্প্রভ। দেখা গেল, ক্যাপ গারল্যান্ড আর বেন প্রেসিডেন্টদের ছবিগুলো টাঙাচ্ছে জায়গামত।

'ভয় লাগছে, লরা!' নিচু গলায় বলল আইডা।

'স্টেজে উঠলে আর ভয় থাকবে না,' বলল লরা। 'ইতিহাসে আমরা দুজনেই ভাল, সবই জানা আছে আমাদের।'

'ভাগ্যিস আমার আগে তুমি বলবে!' বলল আইডা ফিসফিস করে। 'আমাকে আগে বলতে হলে ঠিক হার্টফেল করতাম।'

'সবাই তোমরা সার বেঁধে উঠে এসো স্টেজে,' ডাকলেন ওদেরকে মিস্টার আউয়েন। শুরু হলো স্কুল এগজিবিশন।

নেলী ওলসন, মেরি পাওয়ার, মিনি, লরা আর আইডা ক্যাপ, বেন আর আর্থারের সঙ্গে উঠে দাঁড়াল প্ল্যাটফর্মে, ফিরল গির্জা ভর্তি দর্শকের দিকে। লরা টের পেল, এত লোকের দৃষ্টির সামনে কিছুটা সঙ্কোচ বোধ করছে ঠিকই, কিন্তু ভয় একটুও লাগছে না।

একে একে পড়া ধরতে শুরু করলেন মিস্টার আউয়েন। ভূগোলের প্রতিটা প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পেরে সাহস বেড়ে গেল লরার। প্রচুর হাততালির পর ব্যাকরণ থেকে প্রশ্ন শুরু করলেন টীচার। এটা লরার কাছে পানির মত সোজা। নেলী আর আর্থার সামান্য ভুল করলেও বাকি সবাই চমৎকার উতরে গেল। তারপর মুখে মুখে অঙ্ক কষা। এখানে লরার কিছুটা সংশয় রয়েছে। ওকে ৩৪৭২৬৪ কে ১৬ দিয়ে ভাগ করতে বলা হলো। লরা শুরু করল ৩৪ এর মধ্যে ১৬ যায় দুবার, হাতে থাকে ২ নিজেই অবাক হয়ে গেল লরা যখন সঠিক উত্তরটা বলতে পারল সবার সামনে–তিন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার দুইশো চৌষট্টিকে ষোল দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় একুশ হাজার সাতশো চার। উত্তর যে সঠিক হয়েছে বোঝা গেল মিস্টার আউয়েন পরের জনকে প্রশ্ন করায়।

শেষে গর্বের সঙ্গে ঘোষণা দিলেন মিস্টার আউয়েন, 'ক্লাস ডিস্‌মিস্‌ড্‌!'

তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে ফিরে গেল সবাই যে-যার সীটে। এবার একজন একজন করে ছোট ছেলেমেয়েদের ডাকা হলো স্টেজে। এদের পর ডাক পড়বে লরার।

ছোটরা গড়গড় করে আবৃত্তি উগরে দিয়ে ফিরে আসছে নিজেদের সীটে, পাথরের মূর্তির মত কাঠ হয়ে বসে আছে লরা আর আইডা।

হঠাৎ শুনতে পেল লরা মিস্টার আউয়েন ডাকছেন, 'ক্যারি ইঙ্গলস।'

ফ্যাকাসে মুখে উঠে গেল ক্যারি প্ল্যাটফর্মে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পিছনে হাত

বেঁধে দৃষ্টি রাখল দর্শকদের মাথার ওপর কোন এক জায়গায়, তারপর পরিষ্কার সুরেলা কণ্ঠে শুরু করল আবৃত্তি। একটিবারও হোঁচট না খেয়ে গড় গড় করে বলে গেল ও ষোলো পংক্তির কবিতা। তারপর প্রবল হাততালির মধ্য দিয়ে হাসতে হাসতে নেমে এল।

'এবার আমরা আবিষ্কার থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত আমাদের প্রিয় এই দেশের ইতিহাস শুনব লরা ইঙ্গলস ও আইডা রাইট্সের মুখে। লরা, তুমি শুরু করো।'

প্রথম দিকে গলায় সামান্য কাঁপুনি টের পেল লরা, কিন্তু অল্পক্ষণেই দূর হয়ে গেল সেটা। জর্জ ওয়াশিংটন থেকে শুরু করে জন কুইন্সি অ্যাডাম্স্ পর্যন্ত বলে থামল লরা। গোটা গির্জা জুড়ে পিন পতন নিস্তব্ধতা। মাথা ঝুঁকিয়ে দর্শকদের অভিবাদন করে নেমে গেল লরা প্ল্যাটফর্ম থেকে। ঠিক তখনই তুমুল হর্ষধ্বনি উঠল হলরুমে। চমকে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল লরা। ও নিজের সীটে পৌঁছবার পরেও যখন হাততালি আর বাহবা থামছে না, তখন মিস্টার আউয়েন দুহাত তুলে সবাইকে থামার ইঙ্গিত করলেন।

আইডাও চমৎকার বলল, এবং প্রচুর হাততালি পেল।

হাসিমুখে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন মিস্টার আউয়েন। খুশি হয়েছেন তিনি।

'এই যে, ছোট্ট আধ-বোতল, চমৎকার বলেছ তুমি,' বাবার কাছে পৌঁছতেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল বাবা। ক্যারিকে বলল, 'তুমিও খুব ভাল আবৃত্তি করেছ, ক্যারি।'

মা বলল, 'হ্যাঁ, তোমাদের নিয়ে গর্ব হচ্ছে আমার!'

'বাপরে! ঘাড় থেকে বোঝা নেমেছে একটা!' বলল ক্যারি।

'ঠিক বলেছ,' খুলে রাখা কোট গায়ে দিতে দিতে বলল লরা। এমনি সময়ে অনুভব করল কোটের কলার ধরে কে যেন ওকে ওটা পরতে সাহায্য করছে, পরমুহূর্তে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, 'গুড ইভনিং, মিস্টার ইঙ্গলস।'

কখন যেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আলমানযো ওয়াইল্ডার।

চুপচাপ বেরিয়ে এল ওরা গির্জা থেকে, তুষার মাড়িয়ে বাড়ির দিকে হাঁটছে বাবার লণ্ঠনের পিছু পিছু। বাতাসটা নেই এখন আর, তবে খুব ঠাণ্ডা। চাঁদের আলো পড়েছে তুষারের ওপর।

'আমার বোধহয় জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব কিনা।'

'হ্যাঁ,' বলল লরা। 'তবে যাই হোক, দিচ্ছেন তো!'

'হুড়োহুড়ির মধ্যে আজ আর জিজ্ঞেস করা হয়নি,' বলে মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বলল, 'তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই?'

না হেসে পারল না লরা। হাসিতে যোগ দিল আলমানযোও।

'আচ্ছা,' অনুমতি দিল লরা। আবারও একবার ভাবল ও, ভদ্রলোক কেন করছে এটা! বাবা অনুপস্থিত থাকলে তার কোন বন্ধু, মিস্টার বোস্ট বা আর কেউ

ওকে বাড়ি পৌঁছে দিতেই পারে। কিন্তু বাবা থাকতেও কেন যে ভদ্রলোক রোজ রোজ হাঁটছে ওর সঙ্গে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না ও। তবে হাসিটা ভাল, মনে হয় জীবনটা উপভোগ করছে ভদ্রলোক, আনন্দে আছে।

হঠাৎ ভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলল আলমানযো। 'একটা কাটার বানাচ্ছি আমি।'

লরার কল্পনায় ভেসে উঠল, বাদামি ওই মরগান দুটোর পেছনে কাটারে বসে স্লেই-রাইডিং করছে ও, সাঁই-সাঁই ছুটছে ঘোড়াদুটো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবল, আমাকে কি নেবে ও?

'যদি এই তুষার থাকে তা হলে চমৎকার স্লেইং হবে এ-মরশুমে। তবে মনে হচ্ছে খুব একটা তুষার পড়বে না এ-বছর। বেশ সময় লেগে যাচ্ছে কাটারটা তৈরি করতে। দুই কোট পেইন্ট করতেও সময় লাগবে। ক্রিসমাসের আগে বোধহয় নামাতে পারব না ওটা। তোমার কি ভাল লাগবে স্লেইং করতে?'

'ঠিক জানি না,' বলল লরা। 'কখনও করিনি। তবে বুঝতে পারছি খুবই মজার হবে ব্যাপারটা।'

'বেশ, জানুয়ারির শুরুতে কোনও একদিন, এই ধরো কোনও শনিবার? কেমন লাগে চেষ্টা করে দেখতে পার। যাবে?'

'যাব!' একবাক্যে রাজি হয়ে গেল লরা। 'মনে হয় খুব ভাল লাগবে। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'ঠিক আছে। সপ্তা দুয়েকের মধ্যেই আসব আমি। অবশ্য যদি এই বরফ থাকে।' দরজার কাছে এসে পড়েছে ওরা। টুপি খুলে শুভরাত্রি জানিয়ে চলে গেল আলমানযো।

## এগারো

'মেরিকে ছাড়া একা একা পড়তে আমার একদম ভাল লাগে না!' একদিন উঠে পড়ল লরা পড়ার টেবিল ছেড়ে।

'ওকে ছাড়া এখন পর্যন্ত আমারও কেমন কেমন যেন লাগে,' বলল মা।

তবে দুজনেই জানে, মেরি কলেজে খুব ভাল আছে। অর্গ্যান বাজাতে শিখছে, সেলাই মেশিন চালাতে শিখছে, চমৎকার মোতির কাজ করছে আজকাল। ভিন্ন একটা মাত্রা যোগ হয়েছে ওর অন্ধ জীবনে। নীল আর সাদা মোতি দিয়ে সুন্দর একটা ফুলদানী বানিয়ে পাঠিয়েছে মেরি ওদের সবার জন্য বড়দিনের উপহার হিসেবে।

'আগামী গরমে ওর নতুন পোশাক লাগবে,' বলল মা। 'টাকা কোথায় পাই বুঝতে পারছি না। তা ছাড়া হাত-খরচের জন্যেও ওকে কিছু টাকা পাঠানো দরকার। আর একটা ব্রেইল স্লেট কেনা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। ওগুলো নাকি বেশ দামি।'

'আর দুমাস পরই ষোলো হয়ে যাবে আমার,' বলল লরা। 'আগামী গ্রীষ্মেই হয়তো সার্টিফিকেট পেয়ে যাব।'

'হ্যাঁ, তুমি যদি একটা টার্ম যদি পড়াতে পার তা হলে হয়তো আগামী বছর গরমের ছুটিতে মেরিকে আনানো যেতে পারে বাড়িতে,' বলল মা। 'অনেকদিন দূরে রয়েছে মেয়েটা। কিছুদিনের জন্যে এখান থেকে বেড়িয়ে যেতে পারলে ওর ভাল লাগত। কিন্তু রেলের যা ভাড়া! যাকগে, ডিম না ফুটতেই মুরগির বাচ্চা গুনতে লেগে গেছি আমরা।'

জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে ছিল ক্যারি, হঠাৎ ঘোষণা করল, 'মিস্টার বোস্ট আসছেন! সঙ্গে আরেকজন লোক।'

বলতে বলতেই এসে পড়লেন মিস্টার বোস্ট। দরজা দিয়ে ঢুকে বললেন, 'কেমন আছেন আপনারা সবাই? ইনি মিস্টার ব্রিউস্টার।'

সম্ভাষণ বিনিময়ের পর দুটো চেয়ার এগিয়ে দিয়ে মা বলল, 'মিস্টার ইঙ্গলস কাছেই কোথাও গেছেন। মিসেস বোস্টের খবর কী? সঙ্গে আনলেই পারতেন।'

'এখানে আসব জানলে ঠিকই নিয়ে আসতাম সঙ্গে,' বললেন মিস্টার বোস্ট। 'হুট করে চলে এসেছি, এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে কিছু কথা আছে আমাদের।' লরার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। তারপর ব্যাখ্যা করলেন, 'লিউ ব্রিউস্টার একজন টীচার খুঁজছেন ওঁর নতুন স্কুলের জন্য। গত রাতে স্কুল এগজিবিশন দেখে ওঁর মনে হয়েছে টীচার হিসেবে লরাকে পেলে সবচেয়ে ভাল হয়। শুনে আমি বললাম, ও যদি রাজি হয় তা হলে তোমার কপাল ভাল বলতে হবে।'

কথাটা শুনে বুকের ভেতর লাফ দিল লরার কলজেটা। ধড়াস-ধড়াস করছে এখন। কোনও মতে বলতে পারল, 'আমার তো বয়সই হয়নি এখনও!'

'শোনো, লরা,' আন্তরিক কণ্ঠে বললেন মিস্টার বোস্ট। 'কেউ যদি জিজ্ঞেস না করে তা হলে নিজের বয়সের কথা তোমার বলার দরকার কী? প্রশ্ন হচ্ছে, কাউন্টি সুপারিন্টেন্ডেন্ট যদি তোমাকে সার্টিফিকেট দেন, তা হলে তুমি এই স্কুলে পড়াবে কি না।'

হাঁ হয়ে গেল লরা। কী বলতে হবে বুঝতে না পেরে মার মুখের দিকে চাইল। মা জিজ্ঞেস করল, 'স্কুলটা কোথায়, মিস্টার ব্রিউস্টার?'

'এখান থেকে বারো মাইল দক্ষিণে,' বললেন মিস্টার ব্রিউস্টার।

লরার মনটা দমে গেল। বা-রো মা-ই-ল! এতো দূর! সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে অচেনা লোকের সঙ্গে বাস করতে হবে বাড়ি থেকে বারো মাইল দূরে! পুরো টার্ম ওখানেই থাকতে হবে। এত দূর থেকে প্রত্যেক সপ্তাহে বাড়ি আসা সম্ভব হবে না।

মিস্টার ব্রিউস্টার বলে চলেছেন, 'অল্প কয়েকটাই বাড়ি আছে ওখানে। তাই আমরা দুই মাসের বেশি স্কুল চালাতে পারব না। খাওয়া-থাকা সহ মাসে বিশ ডলার করে দেব আমরা।'

'টাকার পরিমাণ তো ঠিকই আছে বলে মনে হচ্ছে,' বলল মা।

লরা ভাবছে: দুমাসে চল্লিশ ডলার! বাপরে! কম কোথায়?

'মিস্টার ইঙ্গলস আপনার পরামর্শের খুবই দাম দেন, মিস্টার বোস্ট,' বলল মা।

'লিউ ব্রিউস্টার আর আমি পুবে থাকতেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম,' বললেন মিস্টার বোস্ট। 'আমার ধারণা, এটা লরার জন্যে ভাল একটা সুযোগ।'

'আমিও ওই স্কুলে পড়াতে পারলে খুশি হব,' বলে ফেলল লরা।

'তা হলে আমাদের এখুনি উঠতে হয়,' বললেন মিস্টার বোস্ট। উঠে দাঁড়ালেন দুজনেই। 'উইলিয়াম্‌স্ শহরেই আছে, বাড়ি রওনা হওয়ার আগেই ওকে ধরতে হলে এখুনি ছুটতে হবে আমাদের। দেখি, আজই ওকে ডেকে এনে পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করা যায় কি না।'

ঝটপট বিদায় নিয়ে ছুটলেন ওঁরা।

'কী মনে হয়, মা?' জানতে চাইল লরা। 'পাস করতে পারব আমি?'

'পারবে,' বলল মা। 'বেশি উত্তেজিত হয়ে পোড়ো না, আর মোটেই ভয় পেয়ো না। তা হলে দেখবে ব্যাপারটা কিছুই না। স্কুলের একটা পরীক্ষার মত নেবে ব্যাপারটাকে, তা হলেই দেখবে সব ঠিক আছে।'

খানিক বাদেই বিরাট-বপু এক ভদ্রলোক এলেন, উইলিয়াম্‌স্ বলে নিজের পরিচয় দিলেন। তাঁর হাসিখুশি চেহারা দেখে সমস্ত ভয় দূর হয়ে গেল লরার।

'আচ্ছা! তোমারই সার্টিফিকেট লাগবে বুঝি? পরীক্ষার কিছু আছে বলে তো মনে হয় না আমার। কাল রাতে স্কুল এগজিবিশনে ছিলাম আমি। কোনও প্রশ্নেই আটকাওনি তুমি। তবু নিয়ম রক্ষার জন্যে একটু বসা যাক, কি বলো?'

সংক্ষিপ্ত পরীক্ষার পরই কালি-কলম চাইলেন মিস্টার উইলিয়াম্‌স্, তারপর বাবার ডেস্কে বসে একটা ফরম পূরণ করলেন যত্নের সঙ্গে। কলমের নিবটা ওয়াইপারে মুছে দোয়াতের মুখ কর্ক দিয়ে ভাল করে এঁটে বন্ধ করে ফর্মটা এগিয়ে দিলেন লরার দিকে। 'এই যে, ধরো, মিস ইঙ্গলস। ব্রিউস্টার তোমাকে জানাতে বলে দিয়েছে, আগামী সোমবার খুলছে ওদের স্কুল। আবহাওয়ার অবস্থা বুঝে শনি অথবা রবিবার আসবে তোমাকে নিতে। শহর থেকে বারো মাইল দক্ষিণে স্কুলটা, জান তো?'

'জ্বি, স্যার। মিস্টার ব্রিউস্টার বলেছেন।'

'বেশ, তোমার সৌভাগ্য কামনা করি,' উঠে পড়লেন তিনি।

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, স্যার,' বলল লরা।

মার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন মিস্টার উইলিয়াম্‌স্। এতক্ষণে সার্টিফিকেটের দিকে চাইল লরা। এক বছরের জন্য থার্ড গ্রেড সার্টিফিকেট পেয়েছে ও। পঠনে পেয়েছে ৬২, হাতের লেখায় ৭৫, ইতিহাসে ৯৮, ইংরেজি গ্রামারে ৮১, অঙ্কে ৮০ আর ভূগোলে ৮৫।

বাবা যখন ঘরে ঢুকল তখনও কাগজটা হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে লরা।

'কী হলো, লরা?' জিজ্ঞেস করল বাবা, 'মনে হচ্ছে কাগজটা কামড়ে দেবে বলে ভয় পাচ্ছ?'

'স্কুল টীচার হয়ে গেছি, বাবা!' বলল লরা।

'অ্যা? বলে কী! ক্যারোলিন, কী বলছে ও?'

সব শুনে খুশি হলো বাবা, বার কয়েক মন দিয়ে পড়ল সার্টিফিকেটটা, অবাক চোখে দেখল লরাকে। বলল, 'আমার ছোট্ট আধ-বোতল মিষ্টি সাইডারটা বড় হয়ে গেল!' কথাটা খুশিখুশি ভঙ্গিতে বলতে চাইল বাবা, কিন্তু কেমন যেন ফাঁপা শোনাল গলাটা। এবার লরাও চলে যাচ্ছে দূরে!

'মেরির সব প্রয়োজন মেটানো যাবে এবার, গরমের ছুটিতে বাড়িও আসতে পারবে,' বলল লরা। 'কিন্তু, বাবা, তোমার কি মনে হয়–সত্যিই আমি স্কুলে পড়াতে পারব?'

'নিশ্চয়ই পারবে, লরা,' বলল বাবা। 'নিশ্চয়ই পারবে।'

# দীজ হ্যাপি গোল্ডেন ইয়ার্স্

## এক

রোববার বিকেলে মিস্টার ব্রিউস্টারের বাড়িতে পৌঁছে দিল বাবা লরাকে। কিন্তু জীবনে প্রথম শিক্ষকতা করতে গিয়ে মস্ত ধাক্কা খেল লরা। মিসেস ব্রিউস্টার ওকে ভাল ভাবে নিতে পারলেন না। ও কিছু জিজ্ঞেস করলে বিরক্ত হন, জবাব দেন না

বাড়ি থেকে এতদূরে কখনও থাকেনি লরা। সেই অস্বস্তি তো আছেই, যেদিন জানতে পারল বাড়ির কর্ত্রী মানসিক রোগী, গভীর রাতে মস্ত ছুরি নিয়ে মারতে ওঠেন স্বামীকে, সেদিন থেকে ভাল করে ঘুমাতেও ভয় লাগতে থাকল ওর। কিন্তু বাবা-মাকে কিছুই বলল না। তাদের দুশ্চিন্তায় না ফেলে কোন মতে দুটো মাস পার করে বেতন নিয়ে বাড়ি ফিরতে চায় ও।

প্রতি শুক্রবার ওকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া বাবার পক্ষে সম্ভব নয় বুঝে নিয়েছে ও। এদিকে চাকরির প্রথম সপ্তাহ পার হয়ে গেছে, বাড়ির জন্য কাঁদছে বুকের ভিতরটা। হঠাৎ দেখল, স্কুল ছুটির ঠিক আগেভাগে লেডি আর প্রিন্সকে নিয়ে দেবদূতের মত এসে হাজির হলো আলমানযো ওয়াইল্ডার। ছোট্ট সুন্দর কাটার তৈরি করে ফেলেছে, তাতে তুলে নিয়ে লরাকে বাড়ি পৌঁছে দিল ও, বলল রোববার বিকেলে আবার দিয়ে আসবে স্কুলে।

এইভাবে দুটো মাস প্রতি শুক্রবার লরা যখন ভাবে আজ আর আসবে না আলমানযো, ঝড় হোক বা তুষার হোক, ঠিকই গিয়ে হাজির হয়েছে ও। আসলে ছুটির দুটো দিন বাড়ি থেকে অত দূরে কাটাতে যে ওর কতটা খারাপ লাগবে, তা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল আলমানযো।

প্রথম দিকে ছাত্র-ছাত্রীরা সামান্য অবাধ্যতা করলেও দু-তিন সপ্তাহের মধ্যেই স্কুলের পরিবেশটা নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারল লরা। মন দিয়ে পড়াচ্ছে ও স্কুলে, আর অবসর সময়ে পড়ছে নিজের পড়া—আবার যখন স্কুলে যাবে তখন কারও চেয়ে পিছিয়ে থাকতে রাজি নয় ও। একদিন হঠাৎ এসে ও কেমন পড়াচ্ছে খোঁজ নিয়ে খুবই খুশি হয়ে ফিরলেন স্কুল সুপারিন্টেন্ডেন্ট।

নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছে, বাড়ি ফিরে নিজের পড়া তৈরি করছে, মিসেস ব্রিউস্টারের ছুরির ভয়ে আধ-ঘুমে কাটাচ্ছে রাত। পাঁচ দিন পর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে আলমানযোর জন্য, ও এলেই খুশি হয়ে উঠে বসছে কাটারে। বাড়ি ফিরে সে কী আনন্দ! দুটো দিন যেন হাওয়ায় ভেসে পার হয়ে যায়, তারপর আবার সেই স্কুল আর মিসেস ব্রিউস্টারের সংসার। এইভাবে একসময় কেটে গেল দুটো মাস। স্কুলের শেষ দিনে শুরুর দিকে লরার সঙ্গে বেয়াদবি করার জন্য রীতিমত ক্ষমাই চেয়ে বসল সবচেয়ে দুষ্টু ছেলেটা।

শেষদিন লরাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল আলমানযো ওয়াইল্ডার। তারপর থেকে সব কেমন যেন খালি খালি লাগতে শুরু করল লরার।

বিশেষ করে পরদিন যখন দেখল ছেলেমেয়েরা জোড়ায় জোড়ায় বরফমোড়া রাস্তায় স্লেই-রাইডিং করছে, তখন ওদের মধ্যে লেডি আর প্রিন্সকে খুঁজতে থাকল ওর চোখ। মিনি জনসনকে নিয়ে জানালার সামনে দিয়ে সাঁ করে চলে গেল ফ্রেড গিলবার্ট। তার পিছনেই অপরিচিত এক মেয়েকে নিয়ে সাঁৎ করে চলে গেল আর্থার জনসন। পরমুহূর্তে মেরি পাওয়ারকে নিয়ে তার ছোট্ট কাটারে করে চলে গেল ক্যাপ গারল্যান্ড। মহা উৎসব চলেছে যেন শহরে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল লরা, এখন যদি আসেও, ফিরিয়ে দেবে ও আলমানযোকে; জীবনে কোনদিন আর চড়বে না ওর কাটারে। কিন্তু এল না আলমানযো। যে এলই না, তাকে আর ফেরায় কী করে?

পরদিন আইডার সঙ্গে দেখা করবে বলে সানডে স্কুলে গেল লরা, কিন্তু মিসেস ব্রাউনের কাছে জানা গেল, সর্দি-জ্বরে ভুগছে ও, শুয়ে আছে বাসায়।

বিকেলে আবার শোনা গেল স্লেই বেলের আওয়াজ, হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছে ছেলেমেয়েরা জানালার পাশ দিয়ে। কারও যেন মনেই নেই ওর কথা। টেনিসনের কবিতার বইয়ে মন বসাবার চেষ্টা করল ও। কিন্তু মন কি আর বসতে চায়?

হঠাৎ মনে হলো একটা বেলের শব্দ থামল ওদের দরজার সামনে। পেপার থেকে বাবা চোখ তোলার আগেই একছুটে গিয়ে দরজা খুলল লরা। দেখল ছোট্ট কাটার নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রিন্স আর লেডি। কাটারের পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে আলমানযো।

'স্লেই রাইডিঙে যাবে, লরা?'

'যাব!' লাফিয়ে উঠল লরার বুকের ভিতরটা। 'একমিনিট, একটা কোট গায়ে দিয়েই চলে আসছি!'

কোট, হুড আর দস্তানা পরে বেরিয়ে এল লরা। সবার সঙ্গে ছুটল ওরাও।

'তোমার চোখ যে এত নীল, কখনও খেয়াল করিনি,' বলল আলমানযো।

'সাদা হুডের জন্যে দেখাচ্ছে ওরকম,' বলল লরা। তারপর হেসে উঠল আপন মনে।

'হাসির কী হলো?'

'নিজের কথা ভেবে হাসছি,' বলল লরা। 'তোমার সঙ্গে আর কখনও কোথাও যাব না ঠিক করেছিলাম। কিন্তু তুমি ডাক দিতেই ভুলে বেরিয়ে পড়েছি। এই দুদিন আসোনি কেন?'

'ভাবলাম, সবাইকে স্লেই রাইডিং করতে দেখলে তোমারও ইচ্ছে হবে। তাই দুটো দিন ডুব মেরে ছিলাম।'

একসঙ্গে হেসে উঠল দুজন। মহা আনন্দে কাটল লরার বিকেলটা।

সোমবার থেকেই আবার ক্যারির সঙ্গে স্কুলে যেতে শুরু করল লরা। সবাই খুশি হলো ওকে ফিরে পেয়ে। মিস্টার আর্ডয়েন চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ওকে স্বাগত জানালেন, 'তোমাকে আবার ক্লাসে পেয়ে খুব ভাল লাগছে, লরা। শুনলাম চমৎকার পড়িয়েছ তুমি তোমার স্কুলে। আমি জানতাম পারবে, কিন্তু তবু শুনে কী

যে ভাল লাগল!'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, স্যার,' বলল লরা। 'ফিরে আসতে পেরে আমারও খুব ভাল লাগছে।'

ভয়ে ভয়ে ছিল লরা, ক্লাসের আর সবাই না জানি কত এগিয়ে গেছে। কিন্তু দেখল, স্কুলের পর মিস্টার ব্রিউস্টারের বাড়িতে ও যতটা এগিয়ে রেখেছে পড়া, এখানেও এরা ততটুকুই এগিয়েছে, ওকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। সুখে কেটে গেল একটা সপ্তাহ।

শুক্রবার দুপুরে ডিনার খেতে বাড়ি ফিরতেই বাবা বলল, 'তোমার জন্যে একটা জিনিস আছে, লরা।' বলেই পকেট থেকে চারটে দশ ডলারের নোট বের করে দিল ওর হাতে। 'ব্রিউস্টারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সকালে। এই টাকাটা দিয়ে বলল খুব ভাল নাকি পড়িয়েছ তুমি। আগামী শীতে ওরা আবার তোমাকে নিতে চায় টীচার হিসেবে। কিন্তু আমি বলে দিলাম, বাড়ি থেকে অত দূরে আর যাবে না তুমি। শুনে দুঃখ পেল ব্রিউস্টার। যদিও তুমি কোনও অভিযোগ করনি, আমি ঠিকই টের পেয়েছি, ওখানে খুব খারাপ কেটেছে তোমার সময়—তাই সাফ মানা করে দিলাম। তুমি যে দাঁতে দাঁত চেপে কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে গেছ, সেজন্যে আমি সত্যিই খুশি হয়েছি।'

'আমিও, বাবা,' বলল লরা। 'বিনিময়ে···বাপরে বাপ···চল্লিশ ডলার! কল্পনা করা যায়?' বিস্মিত দৃষ্টিতে নোটগুলোর দিকে চাইল লরা একবার। তারপর বাড়িয়ে ধরল হাতটা বাবার দিকে। 'রেখে দাও, বাবা। মেরির জন্যে। এই টাকায় তো গরমের ছুটিতে বাড়ি আসতে পারবে মেরি, তাই না?'

'তা তো পারবেই, ওর গরমের পোশাকও হয়ে যাবে এতে,' বলে নোটগুলো ভাঁজ করে রেখে দিল বাবা পকেটে।

'এতো কষ্ট করলে, এ থেকে তুমি কিছুই রাখবে না, লরা?' বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ক্যারি।

'মেরিকে দেখতে পাব, এই আশাতেই পড়াতে গিয়েছিলাম আমি ওখানে, ক্যারি,' বলে সন্তুষ্ট চিত্তে খেতে বসল। বিড় বিড় করে বলল, 'আরও কিছু রোজগার করতে পারলে মন্দ হতো না।'

'ইচ্ছে করলেই পার,' বলল মা আচমকা। 'আজই সকালে মিসেস ম্যাক-কী বলছিলেন, কাজের খুব চাপ পড়েছে, প্রতি শনিবার যদি তুমি ওঁকে সেলাইয়ের কাজে সাহায্য করতে পারতে তা হলে তাঁর খুবই উপকার হতো। দুপরের খাবার আর পঞ্চাশ সেন্ট করে দেবেন তিনি।'

'বাহ্!' খুশি হয়ে উঠল লরা। 'মা, তুমি বলে দিয়েছ তো যে যাব?'

'বলেছি, তোমার ইচ্ছে হলে যেতেও পার,' হাসল মা।

'কখন, মা? কালকে?'

'হ্যাঁ, কাল সকাল আটটায়,' বলল মা। 'আটটা থেকে ছয়টা। যদি বেশি কাজের চাপ থাকে, আর তোমাকে ছয়টার পরেও থাকতে হয়, তা হলে সাপারও খাওয়াবেন।'

কোথাও আর কোন ফাঁক থাকল না লরার জীবনে। পাঁচ দিন স্কুল, শনিবার

মিষ্টি মহিলা মিসেস ম্যাক-কীর ঘরে সেলাই, রোববার সকালে সানডে স্কুল আর গির্জা, বিকেলে স্লেই-রাইড। তরতর করে কেটে যাচ্ছে সুদিনগুলো।

সবকিছুর চেয়ে বেশি ভাল লাগে ওর কাছে বাড়ির সকাল-সন্ধ্যা। টুক-টাক কাজ করতে করতে গল্প করা, মাঝে মাঝে এক-আধটা রসিকতা, বাতির আলোয় পড়তে বসা, তারপর বাবার বেহালা আর দরাজ গলার গান। নিজেকে মস্ত সৌভাগ্যবতী মনে হয় ওর, সুখী মনে হয়। নিজ বাড়িতে আপনজনদের সঙ্গ–এ আনন্দের বুঝি কোনও তুলনা হয় না।

বসন্ত এসে গেল। বরফ গলে যেতেই বন্ধ হয়ে গেল ওদের সাধের স্লেই-রাইড। স্কুলও ছুটি হয়ে গেল। সবাই এবার যার যার ক্লেইমে গিয়ে বাস করবে। জমিটার স্বত্ব পেতে হলে বছরে কম পক্ষে সাত মাস থাকতে হবে ওদের খামার-বাড়িতে।

একদিন মা বলল, 'মিসেস ম্যাক-কী বেশ ঝামেলায় পড়েছেন, লরা। জিজ্ঞেস করছিলেন তুমি তাঁকে সাহায্য করবে কি না।'

'সম্ভব হলে নিশ্চয়ই করব, মা,' বলল লরা। 'কীসের ঝামেলা?'

জানা গেল, শীতকালটা এত পোশাক তৈরি করেও ক্লেইমে গিয়ে চাষাবাদ করার মত রোজগার হয়নি ম্যাক-কী পরিবারের। কাঠের কারখানার চাকরিটা চালিয়ে না গেলে যন্ত্রপাতি, বীজ বা গরু-ঘোড়া কেনা সম্ভব হবে না মিস্টার ম্যাক-কীর পক্ষে। তাই ক্লেইমটা রক্ষা করার জন্য বাচ্চা নিয়ে ক্লেইমের কুটিরে গিয়ে থাকতে বলছেন স্ত্রীকে গ্রীষ্মকালটা। কিন্তু মিসেস ম্যাক-কী খোলা প্রেয়ারিতে একা থাকতে পারবেন না কিছুতেই। অসম্ভব ভয় লাগে তাঁর। বাধ্য হয়ে এখন ক্লেইমটা ছেড়ে দিতে হবে ওঁদের।

'স্বামী কাজে যাওয়ার পর মিসেস ম্যাক-কীর মনে হয়েছে তুমি যদি সঙ্গে থাকো, তা হলে আর ভয় লাগবে না ওঁর। বিনিময়ে খাওয়া-থাকা ছাড়াও সপ্তাহে এক ডলার করে দেবেন তোমাকে।'

'ক্লেইমটা কোথায়, কোনদিকে?' জিজ্ঞেস করল বাবা।

'ম্যাঞ্চেস্টার থেকে কয়েক মাইল উত্তরে,' বলল মা।

'লরার কী মত?' ওর দিকে ফিরল বাবা, 'যেতে চাও তুমি?'

'মনে হচ্ছে, যাওয়া উচিত,' বলল লরা। 'মানুষ হিসেবে মহিলা খুবই ভাল। তা ছাড়া কিছু উপার্জনও হচ্ছে যখন–'

'হ্যাঁ, ম্যাক-কীরা লোক ভাল,' বলল বাবা। 'তুমি গেলে ওদের সত্যিকার উপকার করা হবে। কাজেই, তুমি যেতে চাইলে আমি আপত্তি করব না।'

'মেরি বাড়ি আসবে, অথচ তুমি থাকবে না–কেমন হবে ব্যাপারটা?' মা বলল।

'এমন হতে পারে, মা, মিসেস ম্যাক-কীর সঙ্গে কয়েকদিন থাকলেই ওঁর ভয় কেটে যাবে,' বলল লরা। 'তখন হয়তো আমি চলে এলেও আর কোনও অসুবিধে হবে না।'

'তা ঠিক, অনেক কিছুই হতে পারে। আগে থেকে ভেবে কোন লাভ নেই। শেষ পর্যন্ত যা হয়, দেখেছি ভালই হয়।'

কথাটা সত্যিই। পরদিন মিসেস ম্যাক-কীর সঙ্গে রওনা হয়ে গেল লরা। ছোট্ট একটা কুটির, সামনের ঘরে খাট পাতা হলো মিসেস ম্যাক-কীর জন্য, পিছনেরটায় শোয়ার ব্যবস্থা হলো লরা আর ম্যাটির। রান্না হয়ে গেল সন্ধের আগেই, খেয়ে-দেয়ে ঘরের দরজা লাগিয়ে দিলেন মিসেস ম্যাক-কী। দূর থেকে ভেসে এল কয়োটের ডাক। মিসেস ম্যাক-কীর মুখ শুকিয়ে গেল, লরাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কীসের ডাক এটা! নেকড়ে বাঘের?'

'না, না,' আশ্বস্ত করল লরা তাঁকে, 'এগুলো কয়োট, মানুষের কোন ক্ষতি করে না।'

শনিবার শহরে যায় ওরা হাঁটতে হাঁটতে, মিস্টার ম্যাক-কী আসেন ডি স্মেট থেকে, তাঁকে নিয়ে হেঁটে ফিরে আসে, আবার রোববার বিকেলে তুলে দিয়ে আসে তাঁকে ডি স্মেটের ট্রেনে। তারপর থেকে আবার খাওয়া আর ঘুমানো ছাড়া ধরতে গেলে কোন কাজই থাকে না।

দেখতে দেখতে বেশ অনেকগুলো দিন কেটে গেল। গরম পড়ে গেছে। কথায় কথায় মিসেস ম্যাক-কী দুঃখ করেন লরাকে এখানে আটকে রেখে কষ্ট দিচ্ছেন বলে। লরা যতই যা বলুক না কেন, তিনি বলেন, 'ডি স্মেটে থাকলে এ-সময় কী মজা করে ওয়াইল্ডারের বাগিতে করে ঘুরে বেড়াতে পারতে।'

'আমি নেই তো কী হয়েছে,' বলল লরা, 'আমার জায়গায় আর কেউ নিশ্চয়ই ঘুরছে এখন ওই বাগিতে চড়ে।'

'ভেবো না,' বললেন মিসেস ম্যাক-কী। 'একটু বেশি বয়সের ছেলেরা সবার জন্যে এত কিছু করে না। তোমার সঙ্গেই বিয়ে হবে ওর।'

'না, না!' প্রবল আপত্তি জানাল লরা, 'আমি ওকে বিয়ে করলে তো! কাউকেই বিয়ে করব না। বাড়ি ছেড়ে কিছুতেই কোথাও যাব না আমি।'

মার চিঠি এল, মেরি আসছে। মিসেস ম্যাক-কী যদি অন্য কারও ব্যবস্থা করতে পারেন তা হলে লরা যেন অবশ্যই বাড়ি চলে আসে।

সব শুনে মিসেস ম্যাক-কী বললেন, 'নিশ্চয়ই তোমার যাওয়া উচিত। আমি আর কারও থাকার ব্যবস্থা করতে পারব।' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'আসলে আর কারও থাকার দরকার পড়বে বলেও মনে হচ্ছে না। হয় লরা, নয়তো কেউ না। আমি এ কয়মাসে বুঝে নিয়েছি, ভয়ের কিছুই নেই—আমি আর ম্যাটি নিশ্চিন্তে থাকতে পারব এখানে।'

কাজেই মিসেস ম্যাক-কী আর ম্যাটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রোববার বিকেলে মিস্টার ম্যাক-কীর সঙ্গে ট্রেনে চাপল লরা। আরও পাঁচটা মাস ওদের দুজনকে থাকতে হবে ওখানে, খাওয়া, ঘুম আর বাতাসের আওয়াজ শোনা ছাড়া কোনও কাজ নেই।

# দুই

বাড়ি ফিরতে পেরে বড় ভাল লাগল লরার।

গরুর দুধ দোয়াচ্ছে, পুরু করে মাখন লাগাচ্ছে রুটিতে, মার তৈরি পনির খাচ্ছে যত খুশি, লেটুস পাতা তুলছে, মূলো তুলছে—এসব মিসেস ম্যাক-কীর, নতুন ক্লেইমে কল্পনা করা যায় না।

ডিম দিচ্ছে মার মুরগির ঝাঁক। ক্যারিকে নিয়ে ওদের ডিম পাড়ার গোপন জায়গা খুঁজে বের করা যে কী আনন্দের, বুঝতে পারছে ও এখন বাড়ি ফিরে।

মেরি বাড়ি ফিরে আসছে, বাবা-মা দুজনেই গেল ওকে স্টেশন থেকে আনতে। ঝিলের ধারে যখন ওয়্যাগনটা দেখা গেল, তখন গ্রেসের নাচটা সত্যিই দেখার মত হলো।

'একা ট্রেনে করে আসতে তোমার কোন অসুবিধে হলো না?' জানতে চাইল ক্যারি

'একটুও না,' বলল মেরি। 'স্বাধীন ভাবে কী করে চলতে হয়, সেটা শেখানো হয় আমাদের কলেজে। এটা শিক্ষারই একটা অংশ।'

বাবা ওর ট্রাঙ্কটা ঘরে এনে রাখতেই সবার জন্য আনা উপহার বের করল মেরি। সবাই যার পর নাই খুশি। কীভাবে ব্রেইল স্লেটে লিখতে হয় দেখাল মেরি সবাইকে। মা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ল। বাবা যেই মনে করিয়ে দিল, যে মেরির খিদে লেগেছে, অমনি মা ব্যস্ত হয়ে পড়ল রান্নার আয়োজনে।

আলু ভাজা, ডিম পোচ, মাখন দেয়া পাউরুটির পর দুধ খেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল মেরি, বলল, এতো ভাল দুধ ওখানে পাওয়া যায় না। এতদিন পর মেরিকে পেয়ে সবার মনে হলো শূন্যস্থান পূরণ হয়েছে। ছুটি ফুরোলেই আবার চলে যেতে হবে ওকে, এই মুহূর্তে কেউ ভাবছে না সেকথা।

পরের বার শিক্ষকতার সেকেন্ড গ্রেড সার্টিফিকেট পেল লরা। নাচতে নাচতে ছুটল বাড়ির দিকে সবাই খুশি হলো। তারপর বাবা শোনাল এতক্ষণ চেপে রাখা খবর। তাঁদের নতুন স্কুলের জন্য লরাকে তিন মাসের জন্য চান মিস্টার পেরি, বেতন প্রতি মাসে পঁচিশ ডলার। পড়াতে হবে এপ্রিল, মে আর জুন—এই তিন মাস।

'এত টাকা!' লরার চক্ষু চড়কগাছ। 'দিনে এক ডলারেরও বেশি!'

চোখ গোল করে চিকন গলায় বলে উঠল গ্রেস, 'এবার লরা বড়লোক হয়ে যাবে!'

হা-হা করে হেসে উঠল সবাই। হাসি থামলে বাবা বলল, 'এবার আমরা ফিরে যাব আমাদের ক্লেইমে। আমার ওপর ভার পড়েছে স্কুল তৈরি করার। ওখান থেকে একদম কাছে।'

এত কাছে যে ঘাসের ওপর দিয়ে অল্প কয়েক কদম হাঁটলেই পৌঁছে যাওয়া

যায়।

প্রথম দিন একটু হতাশ হলো লরা। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মাত্র তিন। সাত বছরের ক্লাইড পেরি, আর জনসন পরিবারের দুটি ছেলেমেয়ে। কিন্তু এই তিনজন এতই মন দিয়ে লেখাপড়া করল আর এত দ্রুত উন্নতি করল যে ওর কোন দুঃখ থাকল না।

দেখতে দেখতে কেটে গেল দুটো মাস।

বাবা জানতে চাইল বেতনের টাকা দিয়ে কী করবে বলে ভাবছে লরা।

'কেন, তোমাকে আর মাকে দেব!' বলল লরা।

শুনে খুশি হলো বাবা। 'আমি কী ভাবছি বলি। আমি ভাবছি, মেরির জন্যে একটা অর্গান কিনলে কেমন হয়? কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে এসেও তা হলে চর্চা বজায় রাখতে পারবে ও। তোমরাও বাজাতে পারবে যখন খুশি। শহরের একজন একটা অর্গান বিক্রি করতে চায়। ফিরে যাচ্ছে ওরা পুবে। খুবই ভাল অর্গান। একশো ডলার হলে কেনা যায়। তুমি যদি তোমার পঁচাত্তর ডলার দাও, তা হলে তার সঙ্গে পঁচিশ ডলার ভরে আমরা কিনে ফেলতে পারি ওটা। আলাদা একটা ঘর তৈরি করে ফেলব এই বাড়ির সঙ্গে জুড়ে—তাতে রাখা যাবে অর্গানটা।'

'তা হলে তো চমৎকার হয়,' বলল লরা। 'কিন্তু কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে যে! স্কুল শেষ হলে তবেই হাতে পাব টাকাটা।'

'কিন্তু, লরা,' মা বলল, 'তোমার কিছু টাকা রেখে দেয়া উচিত জামা তৈরির জন্যে। ভাল জামা বলতে তো ওই একটাই, যেটা পরে রোজ স্কুলে যাচ্ছ।'

'জানি, মা। কিন্তু তারচেয়ে অর্গানটা হলে অনেক বেশি ভাল হয়। আমি নিশ্চয়ই শহরে সেলাইয়ের কাজ পেয়ে যাব। সেই টাকাতে পোশাক বানানো যাবে।'

'আসলেই তুমি অর্গান কেনার পেছনে তোমার টাকা খরচ করতে চাও, আধ-বোতল?' জিজ্ঞেস করল বাবা।

'নিশ্চয়ই!' বলল লরা 'মেরির ভাল লাগলে আমারও খুব ভাল লাগবে।'

'বেশ, তা হলে কিনছি,' বলল বাবা। 'কালই আমি পঁচিশ ডলার অগ্রিম দিয়ে দেব। আমার ওপর আস্থা আছে ওদের, আর কারও কাছে বেচবে না নগদ টাকা পেলেও। বাহ্, দারুণ লাগছে! ওফ্! বাড়িতে একটা আস্ত অর্গান! এক দৌড়ে আমার বেহালাটা নিয়ে এসো দেখি আধ-বোতল, অর্গান ছাড়াই খানিক সঙ্গীত হয়ে যাক!'

বেহালায় সুর বেঁধে নিয়ে দরাজ গলায় গান ধরল বাবা। একে একে অনেকগুলো গান গাইল। সাঁঝ গাঢ় হয়ে আকাশে তারা ফুটল যখন, বাবা গাইল

'সোনালী এই দিনগুলি সব যায় উড়ে,
সুখী-সুখী সোনালী এই দিন,
কালের পাখায় আলতো করে ভর দিয়ে
যায় চলে যায় সোনালী এই দিন॥'

মা জামার কথা তোলায় লরার খেয়াল হলো, সত্যিই তো, জামা-কাপড়ের

তো অবস্থা বেহাল। পরদিনই দেখা করল মিস বেলের সঙ্গে। মিস বেল বললেন কাজের চাপ খুব বেশি থাকায় বারবার লরার কথা ভেবেছেন তিনি, কিন্তু যেহেতু ও স্কুলে পড়াচ্ছে, ধরেই নিয়েছেন ওর পক্ষে তাঁকে সাহায্য করা সম্ভব হবে না।

'শনিবার তো আমার ছুটি থাকে,' বলল লরা। 'জুলাইয়ের পয়লা থেকে আপনার দরকার থাকলে রোজই আসতে পারব।'

সেলাইয়ের উপার্জন দিয়ে জুলাই আসার আগেই দশ গজ বাদামি রঙের পপলিন কিনে ফেলল লরা। বাড়িতে মা সেলাই করে কাপড়টা, বাবা মনের সুখে শিস দেয় আর ঘর তৈরি করে অর্গান রাখার জন্য।

এক সন্ধ্যায় সেলাই সেরে বাড়ি ফিরে লরা দেখল ঘর তোলার কাজ শেষ করে বাবা অর্গানটা নিয়ে এসে উত্তর দিকের দেয়াল ঘেঁষে সাজিয়ে রেখেছে। সামনে রাখা ওয়ালনাট কাঠের ছোট্ট একটা টুল।

'হ্যাঁ, এটাকে এখন কুটির না বলে চমৎকার একটা বাড়ি বলা যায়, খুশি মনে ঘোষণা দিল মা।

লরার জামা তৈরি হয়ে গেল। ওর জন্য চমৎকার একটা টুপি বানিয়ে দিয়েছেন মিস বেল। ঠিক হলো, আগামী রোববার নতুন জামা পরে গির্জায় যাবে লরা।

সবাই নতুন পোশাকের খুব প্রশংসা করল। বাসায় ফিরেও ওটা খুলতে ইচ্ছে করছে না লরার। মার অনুমতি নিয়ে পরে থাকল নতুন জামা। ডিনারের সময় মস্ত একটা অ্যাপ্রন জড়িয়ে নিল যাতে নষ্ট না হয় পোশাক।

খাওয়ার পর বাসন-পেয়ালা ধুয়ে-মুছে ফুরফুর করে ঘুরে বেড়াল লরা বাড়িময়। বাইরে বেরিয়ে দেখল আকাশটা গভীর নীল, বাতাসে কীসের যেন ফিসফাস গোপন ইঙ্গিত। শহরের দিকে চোখ যেতেই দেখল লরা, চকচকে, নতুন একটা বাগি পিয়ারসনের লিভারি বার্নের কাছে মোড় ঘুরে এই দিকে আসছে। একটু কাছে আসতে ঘোড়া দুটোকে চেনা চেনা লাগল ওর, পরমুহূর্তে লাফিয়ে উঠল কলজেটা, আলমানযো আসছে! ওর পাশে এসে থামল বাগি, নেমে এসে আলমানযো বলল, 'বেড়াতে যাবে, লরা?'

'যাব,' বলল লরা। 'এক মিনিটে তৈরি হয়ে আসছি আমি।'

লরা উঠে বসলে দক্ষিণে ছুটল বাগি দূরের লেক হেনরি আর লেক থম্পসনের দিকে।

'নতুন বাগিটা কেমন?' জানতে চাইল আলমানযো, 'তোমার পছন্দ হয়েছে?'

এত দামি আর নরম গদির বিলাসবহুল বাগিতে আগে চড়েনি কখনও লরা। বলল, 'সুন্দর বাগি, অপূর্ব!'

লেক হেনরি আর লেক থম্পসনের মাঝের সরু পথটার কাছে চলে এল ওরা। ধীরে চলছে গাড়ি। নিজের সম্পর্কে বলছে আলমানযো। বলছে ওর আশি একর গম আর ত্রিশ একর জই খেতের কথা।

'আমি দুটো জমি ক্লেইম করেছি: একটা ফসলের জন্যে, আর একটা গাছের জন্যে–দুই জায়গাতেই খুব খাটতে হয় আমাকে। তার ওপর এই বাগিটা কেনার

টাকা জোগাড় করতে ক্যাপ গারল্যান্ডের সঙ্গে জোট বেঁধে বাড়ি-ঘর তৈরির জন্যে কাঠ সাপ্লাই দিয়েছি যেখানে যার দরকার।'

'আগের বাগিটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল লরা।

'ওটা বেচে দিয়ে এই ঘোড়া দুটো নিয়েছিলাম গত শরৎকালে। এগুলোকে বাগে আনতেই পেরিয়ে গেছে শীত। বসন্তে তো আর কাটার চলে না, তাই একটা বাগি কেনা খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল। আগেরটা থাকলে তো কত আগেই তোমার সঙ্গে দেখা করতাম।'

লেক হেনরি ছাড়িয়ে আরও অনেক উত্তরে চলে গেল ওরা। প্রেয়ারির খোলা প্রান্তরে একটা-দুটো কুটির দেখা যাচ্ছে। কোনটার পাশে আস্তাবলও আছে, কাছেই চষা জমি।

'অনেক লোক এসে পড়েছে এই অঞ্চলে,' সিলভার লেকের তীর ঘেঁষে পশ্চিম দিকে রওনা দিয়ে বলল আলমানযো। 'বড়জোর চল্লিশ মাইল পথ চলেছি আমরা, অথচ এরই মধ্যে ছয়-ছয়টা বাড়ি দেখতে পেয়েছি।

সূর্য যখন ডুবছে, তখন বাড়ির দরজায় পৌছল বাগি। নীচে নামতে সাহায্য করল ওকে আলমানযো, মাথা থেকে টুপিটা নামিয়ে বলল, 'স্লেই রাইডের মত বাগি রাইডও কি তোমার ভাল লাগল? লাগলে আবার আসব আমি আগামী রোববার।'

'খুব ভাল লাগল,' বলল লরা। বলেই লজ্জা পেয়ে চট করে ঢুকে গেল দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতর।

# তিন

প্রতি রোববার বিকেলে আসে আলমানযো, বাগিতে তুলে বেড়াতে নিয়ে যায় লরাকে।

ইতোমধ্যে আরও কয়েকটি যুবক প্রস্তাব দিয়েছে ওকে, তারাও ওকে নিয়ে বেড়াতে যেতে চায়। কিন্তু লরা নানান ছুতো দেখিয়ে এড়িয়ে গেছে।

আলমানযোর সঙ্গ ওর ভাল লাগে। সাহসী একজন সহজ, সিধে মানুষ, কোন রকম ভাণ-ভণিতা বা মিথ্যাচার নেই। সরস, ভদ্রলোক।

বিভিন্ন বিষয়ে গল্প করে ওরা। লরার লেখাপড়া, স্কুল, শিক্ষকতা, মা-বাবা-বোনদের কথা, ওর প্রিয় বান্ধবীদের কথা। চুপচাপ মানুষ ও, কিন্তু আলমানযোর সামনে সহজেই মন খুলতে পারে। তেমনি আলমানযোও বলে ওকে ওর ছেলেবেলার কথা, বাবা-মা, ভাই-বোনদের কথা, চাষাবাদের কথা, ফসল আর গাছের জমি ক্লেইমের কথা।

চলতে চলতে আপন মনে গুনগুন করে গেয়ে ওঠে লরা কোনও গানের কলি, কান পেতে শোনে আলমানযো, বলে, 'তোমার গলাটা ভারি মিষ্টি।'

একদিন ওদের সঙ্গে জুটে গেল নেলী ওলসন। সারাটা বিকেল কাউকে একটি

কথা বলার সুযোগ না দিয়ে এত বেশি কথা বলল যে মাথা ধরে গেল লরার। পরদিন আলমানযোকে সোজাসাপ্টা বলে দিল লরা, সঙ্গে নেলী থাকলে ও আর যাবে না বেড়াতে।

আবার একদিন নিজেই আইডাকে আগামীবার সঙ্গে নেয়ার জন্য অনুরোধ করল আলমানযোকে।

আইডার সেদিন এলমার নামে এক প্রতিবেশী যুবকের সঙ্গে হাঁটতে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু লরার নাম শুনে তাকে বুঝিয়ে বলে চলে এলো। খুব মজা হলো সেই বিকেলে। অনেকের অনেক খবর জানা গেল আইডার কাছে।

'মেরি পাওয়ার আজকাল মিশছে ব্যাঙ্কের এক কেরানীর সঙ্গে,' বলল আইডা।

'কিন্তু ক্যাপ? ক্যাপ গারল্যান্ডের কী খবর?'

জবাব দিল আলমানযো, 'শহরের পশ্চিম এলাকার একটা মেয়ের সঙ্গে ঘুরছে ও আজকাল।'

'ইশ্! সবাই কেমন ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল!' দুঃখ করল লরা, 'এই না সেদিন কত মজা করলাম আমরা স্লেই রাইডিং করতে করতে!'

'সেটা ছিল শীতকাল,' হেসে বলল আইডা। 'বসন্তে এখন প্রজাপতির মত উড়ছে সবাই এদিক ওদিক।'

হাসল লরাও। গেয়ে উঠল

'ডাকো, আমি আসব ছুটে।
গুরুজন যতই করুক মানা,
তুমি ডাকো, আমি আসব ছুটে॥'

'সত্যিই আসবে?' জিজ্ঞেস করল আলমানযো।

'অবশ্যই না!' বলল লরা। 'ওটা তো শুধুই একটা ভাব, একটা গান–জীবন নয়।'

লরার বাড়িই আগে পড়ল। ও নেমে বলল, 'আইডা, চমৎকার কাটল সময়টা। সামনের রোববার আসবে না তুমি?'

লজ্জা পেল আইডা। বলল, 'আসতে পারলে আমারও ভাল লাগত, লরা। কিন্তু, মানে, এলমারের সঙ্গে হাঁটব বলে কথা দিয়েছি যে।'

'ঠিক আছে, প্রজাপতি, অত লজ্জা পেতে হবে না!' বলল লরা।

হেসে উঠল সবাই।

কিছুদিন পরই দুটো বিশাল বুনো ঘোড়া কিনল আলমানযো, জানতে চাইল ওদুটোকে পোষ মানাবার সময় লরা সঙ্গে থাকবে কি না–ব্যাপারটা বিপজ্জনকও হতে পারে। একবাক্যে রাজি হয়ে গেল লরা। দেখতে চায় কীভাবে ওদের বশ করে আলমানযো। যদি ওদের রাশ ধরার সুযোগ হয় তা হলে তো আরও ভাল।

শুনে মা ভয়ে মরে গেল। কিন্তু বাবা বলল, 'ভেবো না, ক্যারোলিন,

ওয়াইল্ডার থাকছে সাথে। ও হচ্ছে ঘোড়ার জাদুকর।'

প্রত্যেক রোববার আগের মতই বেড়াতে গেল লরা আলমানযোর সঙ্গে।

তারপর একসঙ্গে ভর্তি হলো মিস্টার ক্লিউয়েটের গানের স্কুলে। ইতিমধ্যে অনেকটা শান্ত হয়ে গেছে বুনো ঘোড়াদুটো। এখন লরা রাশ ধরলেও কোনও গোলমাল করে না।

'কী ভাবছ?' একরাতে অনেকক্ষণ আলমানযোকে চুপ করে থাকতে দেখে জানতে চাইল লরা।

'ভাবছি...' থেমে গেল আলমানযো। হঠাৎ লরার হাতটা তুলে নিল হাতে। 'তোমার হাতটা এত্তো ছোট!' আবার কিছুক্ষণ চুপ। তারপর বলে ফেলল, 'আমি ভাবছিলাম একটা এনগেজমেন্ট রিং পেলে কেমন লাগবে তোমার।'

'কে দিচ্ছে তার ওপর নির্ভর করবে সেটা,' বলল লরা।

'যদি আমি দিই?'

'তা হলে নির্ভর করবে কেমন আংটি দাও তার ওপর!'

পরের রোববার একটু দেরি করে এল আলমানযো। দেরির জন্য ক্ষমা চাইল।

'তাতে কী,' বলল লরা। 'একটু কম ঘুরলেই হবে।'

'কিন্তু আজ লেক হেনরীতে যাব যে আমরা। বুনো আঙুর পেড়ে খাওয়ার এই শেষ সুযোগ। এখনই জমে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ওগুলো।'

জোড়া লেকের মাঝের সরু রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে থোকা থোকা পাকা আঙুর পাড়ল ওরা। ওগুলো খেতে খেতে দুই লেকের ঢেউ দেখল। মৃদু ছলাৎ-ছলাৎ শব্দে ছোট ছোট ঢেউ ভাঙছে তীরে এসে, বিকেলের পড়ন্ত রোদে চকচক করছে ঢেউয়ের গা।

পশ্চিমের গোটা আকাশ নানান রঙে রাঙিয়ে অস্ত গেল সূর্য।

ঝিরঝির বইছে মৃদু হাওয়া।

ফেরার পথে একহাতে রাশ ধরে অপর হাতে লরার হাতটা তুলে নিল আলমানযো। লরা অনুভব করল, ঠাণ্ডা কী যেন ঢুকছে ওর অনামিকায়। আলমানযো বলল, 'তুমিই বলেছ, কেমন আংটি দিই তার ওপর নির্ভর করবে। বলো দেখি কেমন লাগছে এখন!'

পূর্ণিমার চাঁদের প্রথম আলোয় হাতটা তুলে তাকাল লরা। সুন্দর একটা সোনার আংটি, কয়েকটা পাথর তাতে ঝিকমিক করছে চাঁদের আলোয়। একটা গার্নেট পাথরের দুপাশে দুটো মুক্তা।

'খুব সুন্দর!' বলল লরা।

'তা হলে থাক ওটা তোমার হাতেই,' বলল আলমানযো। 'আগামী গ্রীষ্মে আমার গাছের ক্লেইমে ছোট্ট একটা বাড়ি বানাব আমি। ছোট্ট বাড়ি। তোমার অসুবিধে হবে, লরা?'

'চিরকাল ছোট বাড়িতেই থেকেছি আমি,' বলল লরা। 'ছোট বাড়িই পছন্দ আমার।'

বাড়ির কাছাকাছি এসে লরা শুনল, বেহালা বাজিয়ে গান গাইছে বাবা।

পরিচিত গান। প্রায়ই মাকে গেয়ে শোনায় গানটা।

'সুন্দর এক দুর্গ গড়েছি আমি
অনেক দূরে স্বপ্নের এক দেশে,
এসো, প্রিয়া, এসো আমার ঘরে
প্রেম যেখানে রইবে চিরন্তন ॥'

## চার

জ্বালা হয়েছে আংটিটা নিয়ে। ঝিকমিক করছে সারাক্ষণ।

গতরাতে বাসায় ফিরেই ধরা পড়েছে বাবা-মার চোখে। বাবা শুধু মাথা ঝাঁকিয়েছে। মা বলেছে, 'যা করছ ভাল মত বুঝে করছ তো, লরা? মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে, মালিকের চেয়ে ঘোড়াগুলোই তোমার বেশি প্রিয়।'

'একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটা পাওয়া যে মুশকিল, মা!' মাথা নিচু করে বলেছে লরা।

মিষ্টি করে হেসেছে মা, বাবা কেশে গলা পরিষ্কার করেছে।

কিন্তু পরদিন স্কুলে যাওয়ার পথে বারবার আংটিটা লুকিয়ে ফেলার ইচ্ছেটাকে দমন করতে হয়েছে ওর। কিন্তু এসব কথা তো আর লুকিয়ে রাখার নয়, তাই খুলতে গিয়েও খোলেনি।

আইডার পাশে বসে আছে, এমন সময় হঠাৎ কী যেন ঝিক্ করে চমকে উঠল। তাকিয়ে দেখে সোনার একটা রিং ঝিকমিক করছে আইডার হাতে।

লরা চাইতেই লজ্জায় লাল হয়ে গেল আইডা। এলমার কিনা জিজ্ঞেস করায় মাথা ঝাঁকাল আইডা। এইবার ডেস্কের নীচে বাম হাত এনে নিজের আংটি দেখাল ওকে লরা।

বিরতির সময় ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মেরি, ফ্লোরেন্স আর মিনি। আংটিদুটোর ভূয়সী প্রশংসার পর মেরি বলল, 'দুঃখ লাগছে ভাবতে যে তোমাদের দুজনকে হারাচ্ছি আমরা। নিশ্চয়ই স্কুল ছেড়ে দেবে এবার?'

'না-না!' বলল আইডা। 'অন্তত এবারের শীত পর্যন্ত আছি আমি স্কুলে।'

'আমিও,' বলল লরা। 'আরেকটা সার্টিফিকেট দরকার আমার।'

'আগামী গ্রীষ্মে তুমি স্কুলে কাজ নেবে?' জিজ্ঞেস করল নতুন মেয়ে ফ্লোরেন্স।

'যদি ভাল কোনও স্কুল পাই,' বলল লরা।

'সার্টিফিকেট পেলে আমার জন্যে আমাদের ডিস্ট্রিক্টে স্কুল পাওয়া কোন সমস্যাই না,' বলল ফ্লোরেন্স। 'কিন্তু আসল ভয় আমার পরীক্ষাটাই। মনে হয়, আমি পাস করতে পারব না।'

'আরে না, ঠিকই পাস করবে তুমি,' বলল লরা। 'ঘাবড়ে না গিয়ে যা জানো সেটা ঠাণ্ডা মাথায় লিখে দিতে পারলেই, ব্যস!'

মেরি পাওয়ার বলল, 'আইডাও কি টীচার হবে?'

'না-না!' হাসল আইডা। 'আমার টীচার হওয়ার শখ নেই। ঘর-সংসারই আমার লাইন। তা নইলে কারও কাছ থেকে আংটি আদায় করি?'

একসঙ্গে হেসে উঠল সবাই। মিনি জিজ্ঞেস করল, 'আর লরা? তুমি আদায় করেছ কেন? তুমি কি ঘর-সংসার চাও না?'

'নিশ্চয়ই চাই, জোরের সঙ্গে বলল লরা। 'কিন্তু তার আগে ঘরটা বানাতে হবে তো আলমানযোকে।'

ঘণ্টা বেজে গেল সবাই ক্লাসে গিয়ে ঢুকল আবার।

বাসায় ফিরতেই বাবা জিজ্ঞেস করল আলমানযোর সঙ্গে দেখা হয়েছে কি না। ও মাথা নাড়তে বলল, 'আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ওদের দুভাইকে কী এক জরুরী ব্যাপারে নাকি মিনেসোটায় যেতে হচ্ছে রোববার। ও বলল স্কুলের পর তোমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবে। যদি না পারে তা হলে যেন খবরটা আমি জানিয়ে রাখি।'

মনটা খারাপ হয়ে গেল লরার। রোববার মজা করে বেড়ানোর দিনগুলো হঠাৎ করে এভাবে শেষ হয়ে যাবে, ভাবতেও পারেনি। শুকনো মুখে বলল, 'তুষার শুরু হওয়ার আগেই মিনেসোটায় পৌঁছে যেতে পারলে তো ভালই।'

'আর হ্যাঁ, ওর বাগি আর লেডিকে রেখে যাচ্ছে আমাদের এখানে, বলেছে তুমি যেন যখন ইচ্ছে যত খুশি চালাও।'

'ইশ্‌শ্‌, লরা! আমাকে নেবে তোমার সাথে?' চনমন করে উঠল ক্যারি।

'আমাকেও, লরা, আমাকেও! আচ্ছা?' চেঁচিয়ে উঠল গ্রেস।

লরা কথা দিল ওদের। কিন্তু মনটা ফাঁকা হয়ে গেছে ওর। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, রোববারের বাগি ড্রাইভের জন্য গোটা সপ্তাহ জুড়ে কী অধীর প্রতীক্ষায় থাকে ও।

রোববার সকালে লেডিকে বাগিসহ বাবার আস্তাবলে রেখে লরার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রয়ালের সঙ্গে চলে গেল আলমানযো। ক্যারি সারাক্ষণ ঘুরছে লরার পিছন পিছন। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি খুব একা একা লাগবে, লরা?'

'নাহ্, একা লাগবে কেন?' অস্বীকার করল লরা। 'ডিনারের পর আমরা বাগি নিয়ে বেড়াতে যাব।'

ঘরে এসেই স্টোভের ধারে গেল বাবা। 'দিন দিন আগুনটা প্রিয় হয়ে উঠছে,' বলে একটা চেয়ার টেনে বসল। 'ভাবছি, এবারের শীতে শহরে না গিয়ে এখানেই থেকে গেলে কেমন হয়। শহরের বাড়িটা ভাড়া দিলে বেশ কিছু টাকা আসবে। সে টাকায় এই বাড়িটা আরও মজবুত করা, টার-পেপার লাগানো, এমন কী পেইন্ট করার পরও আরও টাকা হাতে থাকবে। তুমি কী বলো, ক্যারোলিন?'

'তা হলে তো ভালই হয়, চার্লস,' রাজি হয়ে গেল মা।

'তা ছাড়া আমাদের এত গরু-ঘোড়া-শুয়োর-মুরগি নিয়ে শহরে গিয়ে ওঠা, তাদের জন্য খাবার বয়ে নিয়ে যাওয়া—এসব চাট্টিখানি কথা না। অথচ এই বাড়িটা বাইরে থেকে ভালমত কাঠ মেরে নিলে, আর ভেতর থেকে মোটা বিল্ডিং-পেপার লাগিয়ে নিলে শীত ঘেঁষতে পারবে না কাছে। কয়লার হীটারটা বসবার ঘরে

রাখলে, আর প্রচুর পরিমাণে কয়লা কিনে রাখলে কোনও অসুবিধায় পড়ব না। তলকুঠুরিতে তোমার বাগানের তরি-তরকারী, মাঠ থেকে তুলে আনা কুমড়ো আর লাউ ঠেসে রাখা যাবে। আবহাওয়া খুব খারাপ হলে প্রয়োজনে একনাগাড়ে আট-দশ দিন শহরে না গেলেও আমরা খিদে বা শীতে কষ্ট পাব না। তোমার কী মনে হয়, ক্যারোলিন?'

'কথাটা ঠিক,' বলল মা। 'তবে একটাই অসুবিধে, শীতের মধ্যে স্কুলে যেতে মেয়েদের কষ্ট হবে। যে-কোনও সময় তুষার-ঝড়ও শুরু হতে পারে।'

'আমি ওদের ববস্লেডে করে আনা-নেয়া করতে পারব,' বলল বাবা। 'মাত্র একমাইলের পথ, দশ মিনিটে পৌঁছে যাবে।'

'ঠিক আছে,' রাজি হয়ে গেল মা, 'তুমি যদি ওই বাড়ি ভাড়া দিয়ে এখানে থাকতে চাও, আমিও খুশি হয়েই থাকব। বাড়ি বদলানোর ঝক্কি-ঝামেলা তো আর কম না।'

শীতকালটা থেকে গেল ওরা খামার-বাড়িতেই। যখন তুষার পড়তে শুরু করল, ওয়্যাগন বক্সটা বসিয়ে নিল বাবা ববস্লেডের রানারের ওপর। স্কুলে যেতে-আসতে আর কোন অসুবিধেই থাকল না। এ-বছর থেকে গ্রেসও যাচ্ছে স্কুলে।

প্রায়ই চিঠি আসে আলমানযোর। নিরাপদেই মিনেসোটায় বাবার ওখানে পৌঁছে গেছে ওরা দুভাই। আগামী বসন্তে ফিরে আসবে।

# পাঁচ

বড়দিনের আগের দিন সকাল দশটা থেকে শুরু হয়ে গেল তুষারপাত। শহরের গির্জায় তৈরি করা হয়েছে ক্রিসমাস ট্রী। গ্রেসের বড় ইচ্ছা শহরে যাবে। বার বার জানালায় গিয়ে দেখছে বাইরের অবস্থা। কিন্তু সাপারের পর তুফান শুরু হতেই হাল ছেড়ে দিল। অতটুকু মেয়েও পরিষ্কার বোঝে, এর মধ্য দিয়ে শহরে যাওয়া একেবারেই সম্ভব নয়।

মা আর লরা মিলে একগাদা পপকর্নের মোয়া বানিয়ে ফেলল, ক্যারি আর গ্রেস মিলে ক্যান্ডি ভরছে পুরনো মশারির কাটা টুকরোর মধ্যে।

লরার মনে পড়ল মিস্টার এডওয়ার্ডসের কথা। ইন্ডিয়ানদের এলাকায় ছিল তখন ওরা। ভদ্রলোক বাচ্চা দুটো মেয়ের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য কয়েকটা ক্যান্ডি আনতে আশি মাইল হেঁটেছিলেন ঘোর বৃষ্টির মধ্যে। মন থেকে দোয়া করল লরা, আজ এই মুহূর্তে যেখানেই থাকুন না কেন, যেন সেই বাচ্চাদের সমান আনন্দে থাকেন মেরির কথা মনে পড়ল ওর, মনে পড়ল আলমানযোর কথা। প্রথম দিকে ঘন ঘন চিঠি এসেছে ওর, তারপর থেকে একটু দেরি করে—কিন্তু নিয়মিত, তবে গত তিন সপ্তাহে একটা চিঠিও লেখেনি ও। নিশ্চয়ই বাড়ির লোকজন, পুরনো বন্ধু, বান্ধবী, সবাইকে নিয়ে ফুর্তিতে আছে। বসন্তকাল আসতে এখনও চারমাস বাকি। হয়তো ওকে ভুলে যাবে, হয়তো এখনই ভাবছে হুট করে

আংটিটা দিয়ে বসা ঠিক হয়নি।

ঠক-ঠক আওয়াজ হলো দরজায়। বাবা হাঁক ছাড়ল, 'চলে এসো, ভেতরে চলে এসো।'

লরা খুলে দিল দরজা। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তুষার-মোড়া একটা মূর্তি—আলমানযো ওয়াইল্ডার! হাঁ করে চেয়ে রইল লরা ওর মুখের দিকে।

'ভেতরে চলে এসো, দরজা লাগিয়ে দাও!' হাঁক ছাড়ল বাবা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ঢুকছে দরজা দিয়ে। 'তোমার ঘোড়াগুলোর কী অবস্থা?'

'প্রিন্সকে নিয়ে এসেছি আমি,' বলল আলমানযো। 'আস্তাবলে লেডির পাশে রেখে এসেছি ওকে।' তুষার ঝেড়ে কোট আর হ্যাট ঝুলিয়ে দিল ও দরজার পাশে দেয়ালে বসানো মহিষের শিঙে। মা উঠে দাঁড়াল ওকে অভ্যর্থনা জানাতে।

ক্যারি আর গ্রেসের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে লরা। এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না এই ঝড়-তুফান তুচ্ছ করে এতদূর থেকে ছুটে এসেছে আলমানযো।

ওভারকোটের পকেট থেকে একটা পেপারব্যাগ বের করে এগিয়ে দিল আলমানযো, 'কিছু কমলা এনেছি। লরার জন্যও আলাদা একটা প্যাকেট আছে। কিন্তু ব্যাপার কী, লরা কী কথা বলবে না আমার সঙ্গে?'

'তুমি এসেছো, তাই তো বিশ্বাস করতে পারছি না, কথা কী বলব! তোমার না শীত গেলে তারপর ফেরার কথা?'

'অতদিন অতদূরে থাকতে ইচ্ছে করল না, তাই চলে এলাম। এই যে, ধরো তোমার বড়দিনের উপহার।'

বাবাকে কিছু কয়লা নিয়ে আসতে বলল মা। ক্যারি আর গ্রেসকে ডাকল পপকর্নের মোয়া প্লেটে সাজিয়ে আনার জন্য। লরা বুঝল, সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে গেল মা ওদেরকে একটু একা থাকতে দেয়ার জন্য।

মোড়ক খুলতে সাদা একটা বাক্স বের হলো, বাক্সটা খুলতে বেরলো একটা সুন্দর সোনার ব্রুচ।

'অপূর্ব!' মুগ্ধকণ্ঠে বলল লরা। 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে!'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল আলমানযো। ঘরে কেউ নেই দেখে নিয়ে বলল, 'মুখেই ধন্যবাদ দাও, কিন্তু অন্যভাবে।' দুহাতে আলিঙ্গন করল ও লরাকে। আলতো করে চুমো খেল লরা ওর ঠোঁটে, ফিসফিস করে বলল, 'তুমি ফিরে এসেছ বলে খুব ভাল লাগছে!'

কয়লা নিয়ে ফিরে এল বাবা, ক্যারি পপকর্নের মোয়া ভরা গামলা এনে রাখল টেবিলে, গ্রেস সবার হাতে ধরিয়ে দিল একটা করে ক্যান্ডির ব্যাগ। সেসব খেতে খেতে কোনপথে কীভাবে এল ও মিনেসোটা থেকে সে-গল্প শোনাল আলমানযো। বুড়ো ঘড়ি যখন গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বারোটা বাজার ঘণ্টা দিতে শুরু করল, তখন হুঁশ হলো সবার—কত সময় পেরিয়ে গেছে।

'মেরি ক্রিসমাস!' বলল মা।

সবাই উত্তর দিল, 'মেরি ক্রিসমাস!'

কোট আর হ্যাট তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল আলমানযো। একটু পর ঝুনঝুন আওয়াজ তুলে চলে গেল আলমানযোর বাগি।

*

টীচারদের পরীক্ষা হবে স্কুলে, তাই স্কুল ছুটি। বাবার সঙ্গে লরা চলেছে একা।

ওকে নামিয়ে দিয়ে বাবা জিজ্ঞেস করল ভয় লাগছে কি না।

'না, পাস ঠিকই করব। মনের মত স্কুল পাব কি না, সেটাই চিন্তা।'

'পেরিদের স্কুলে আবার কাজ নিতে পার।'

'উঁহুঁ, আর একটু বড় স্কুলের কথা ভাবছি, একটু বেশি বেতনের।'

'বেশ তো, আগে পাস করে নাও, তারপর দেখা যাবে।'

ক্লাসে ঢুকে ঘরভর্তি অপরিচিত লোকজন দেখে বোকা হয়ে গেল লরা। বয়স্ক সব পেশাদার টীচার পরীক্ষা দিতে এসেছে। ফ্লোরেন্স ছাড়া আর-কাউকে চেনে না ও। হাত স্পর্শ করতেই চমকে উঠল ফ্লোরেন্স, বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে আছে ওর হাত, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ঠোঁটজোড়া। ওর অবস্থা দেখে ভয়-ভয় ভাবটা সম্পূর্ণ কেটে গেল লরার।

'ভয় পেয়েছি, লরা!' নিচু, কাঁপা গলায় বলল ফ্লোরেন্স। 'বুড়ো-বুড়ো টীচার এসেছে পরীক্ষা দিতে—নিশ্চয়ই অসম্ভব কঠিন হবে পরীক্ষা। আমি পারব না।'

'আরে দূর! আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ওরাও ভয় পাচ্ছে,' ওকে সান্ত্বনা দিল লরা। 'দুশ্চিন্তা কোরো না, আর মোটেও ভয় পেয়ো না, দেখবে ঠিকই পাস করেছ। আজ পর্যন্ত সব পরীক্ষায় তুমি পাস করেছ, এটাতে ফেল করতে যাবে কোন্ দুঃখে? মনটা শক্ত করো।'

কিন্তু প্রশ্নপত্র দেখে বুঝল লরা, ঠিকই বলেছিল ফ্লোরেন্স—খুব কঠিন প্রশ্ন এসেছে। উত্তর দিতে গিয়ে রীতিমত ঘাম ছুটে গেল ওর। দুপুরের দিকে মনে হতে লাগল, এবার আর সার্টিফিকেট জুটবে না ওর কপালে। কিন্তু লেগে থাকল ও, এবং শেষ পর্যন্ত সব প্রশ্নের উত্তর লিখে জমা দিল খাতা।

বাড়ি ফেরার পথে বাবার প্রশ্নের উত্তরে ও বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না, বাবা। যতটা আশা করেছিলাম তারচেয়ে অনেক কঠিন ছিল প্রশ্ন। আমার সাধ্যমত লিখেছি।'

'ব্যস, ব্যস, তা হলেই যথেষ্ট,' বলল বাবা, 'সাধ্যের চেয়ে ভাল করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।'

এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেল, তবু পরীক্ষার ফল বের হচ্ছে না। ভাল বা মন্দ কোন খবর না পেয়ে অস্থির লাগছে লরার। ফ্লোরেন্সের ধারণা, সবচেয়ে বুড়ো একজন কি দুইজন টীচার পাস করবে, বাদ বাকি সবাই ফেল।

দশ দিন পর চিঠির মাধ্যমে ফলাফল এল—সেকেন্ড গ্রেড সার্টিফিকেট পেয়েছে ও। এইবার, ভাবল ও, ভাল একটা স্কুল খুঁজতে হবে।

পরদিন ক্লাসে ঢুকে প্রথমেই লরার কাছে চলে এল ফ্লোরেন্স।

'তুমি পাস করেছ, লরা?' জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ, সেকেন্ড গ্রেড সার্টিফিকেট দিয়েছে আমাকে,' জবাব দিল লরা। 'তুমি?'

'আমি পাস করতে পারিনি,' শান্ত কণ্ঠে বলল ফ্লোরেন্স। 'কাজেই আমাদের স্কুলে আমি আর পড়াতেও পারছি না। কিন্তু তোমাকে কিছু বলার আছে আমার। তুমি আমাকে সাহস যুগিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করেছ, লরা। তুমি যদি আমাদের

স্কুলে পড়াও তা হলে আমি খুশি হব। বাবা বলেছে, তুমি চাইলেই কাজটা পেতে পার। তিন মাসের স্কুল, শুরু হবে পয়লা এপ্রিল থেকে, বেতন মাসে ত্রিশ ডলার।'

'আমি তো এরকম বেতনেই কাজ খুঁজছিলাম,' বলল লরা রুদ্ধশ্বাসে।

'বাবা বলেছে, তুমি আগ্রহী হলে তার সঙ্গে দেখা করতে পার, স্কুল বোর্ড চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবে।'

'ঠিক আছে, কাল বিকেলে আমি দেখা করব তাঁর সঙ্গে,' বলল লরা। 'আর তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ফ্লোরেন্স।'

'আমার সঙ্গে তুমি ভাল ব্যবহার করেছ, লরা। বিনিময়ে তোমার জন্যে কিছু করতে পারলে আমি সত্যিই খুশি হবো।'

প্রথম মাসের বেতন পেয়ে মাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের জন্য জামা-কাপড় কিনল লরা। মাকেও কিছু কেনার জন্য অনেক সাধাসাধি করল, কিন্তু মা কিছুতেই নিল না। বলল, 'আমার কোনও চাহিদা নেই, লরা। কিছুরই অভাব রাখেনি তোমার বাবা।'

ফুলারের হার্ডওয়্যার স্টোরের সামনে দাঁড়ানো বাবার ওয়্যাগন। কাছে আসতে দেখা গেল ঘোড়ার কম্বল দিয়ে বড়সড় কী যেন ঢাকা রয়েছে ওয়্যাগন বক্সে। জিনিসটা কী জানা গেল না, কারণ ওরা পৌঁছতেই তড়িঘড়ি করে গাড়ি ছেড়ে দিল বাবা।

'ওখানে কী, চার্লস?' জিজ্ঞেস করল মা।

'এখন তো দেখাতে পারছি না, ক্যারোলিন,' মুচকি হেসে বলল বাবা। 'বাড়ি গিয়ে দেখো।'

বাড়ি পৌঁছে একেবারে দরজার পাশে রাখল বাবা ওয়্যাগন। বলল, 'তোমাদের প্যাকেট যা আছে নিয়ে ঢুকে পড়ো বাড়িতে, কিন্তু খবরদার, আমার কম্বল তুলে দেখবে না কেউ! আমি ঘোড়াদুটোকে রেখেই চলে আসছি।'

ঘোড়া খুলে নিয়ে আস্তাবলের দিকে চলে গেল বাবা।

'কী হতে পারে জিনিসটা!' আন্দাজ করার চেষ্টা করে বিফল হলো মা। লরার দিকে চাইতে ও হাত উল্টাল, ও-ও বুঝতে পারছে না। অপেক্ষায় থাকল ওরা। যত শীঘ্রি সম্ভব ফিরে এল বাবা। এসেই ঘোমটা সরানোর ভঙ্গিতে কম্বল সরাল। ঝকঝকে নতুন একটা সেলাই মেশিন দাঁড়িয়ে রয়েছে ওয়্যাগন বক্সে।

'আরি সর্বনাশ! চার্লস!' ফুঁপিয়ে উঠল মা।

'হ্যাঁ, ক্যারোলিন, এটা তোমার!' বলল বাবা। 'মেরি আসছে, লরা যাচ্ছে—অনেক সেলাইয়ের কাজ রয়েছে তোমার সামনে। ভাবলাম, মেশিন হলে খুব সুবিধে হবে তোমার।'

'কিন্তু কী করে!' মেশিনের পায়ে হাত বুলাচ্ছে মা।

'একটা গরু তো আমাদের বেচতেই হতো, ক্যারোলিন,' বলল বাবা। 'আগামী শীতে এত গরুর জায়গা হবে না আস্তাবলে। এবার সবাই ধরো দেখি, জিনিসটা ঘরে নিয়ে ঢাকনা খুলে দেখা যাক দেখতে কেমন।'

লরার মনে পড়ল, অনেকদিন আগে সেলাই মেশিনের কথায় চোখ দুটো

চকচক করে উঠেছিল মার। ওর মনে হয়েছিল, মা ভাবছে, একটা মেশিন হলে বড় ভাল হতো। বাবা ভোলেনি সেকথা।

# ছয়

দেখতে দেখতে বিয়ের দিন এসে গেল।

আগামী কাল, বৃহস্পতিবার, ওরা রেভারেন্ড ব্রাউনের বাড়ি গিয়ে অনাড়ম্বর ভাবে বিয়েটা সেরে ফেলবে। এখন বিরাট আয়োজন করে বিয়ের অনুষ্ঠান করা আলমানযোর পক্ষে সম্ভব নয়, লরাও চায় না বাবার ওপর এত খরচের ভার চাপাতে।

বাবার অনুরোধে বুধবার ওর ওয়্যাগন নিয়ে আলমানযো এল লরার মালপত্র নতুন বাড়িতে নিয়ে রাখার জন্য। জামা-কাপড় তো আছেই, টুকিটাকি বহু কিছু তুলে দিল মা নতুন কেনা একটা ট্রাঙ্কে। পুরনো কাপড়ের পুতুল শার্লোটিকে সঙ্গে দিতে ভুলল না। বিছানার চাদর, বালিশের গেলাফ, তোয়ালে–কিছুই বাদ গেল না। ট্রাঙ্ক ভর্তি হয়ে গেলে একটা পরিষ্কার কাপড় বিছিয়ে তার ওপর লরার লেপ, রাজহাঁসের পালক ভরা দুটো মোটাসোটা বালিশ আর একটা টেবিল ক্লথ রেখে চার কোনা গিঠ দিয়ে দিল।

লরার ট্রাঙ্ক আর লেপ-বালিশের গাঁটরি ওয়্যাগনে তুলে দিয়ে বাবা বলল, 'দাঁড়াও, এখুনি আসছি।' বাড়ির ওপাশে খুঁটিতে বাঁধা লরার প্রিয় গরুটা টেনে এনে বেঁধে দিল বাবা ওয়্যাগনের সঙ্গে।

বাবাকে ধন্যবাদ দিয়ে রাশ তুলে নিল আলমানযো হাতে, তারপর পিছন ফিরে লরাকে বলল, 'কাল ঠিক দশটায় আসছি।'

'আমি তৈরি থাকব,' বলল লরা চেঁচিয়ে। তখনও উপলব্ধি করতে পারেনি চিরতরে ছেড়ে যাচ্ছে ও বাপের বাড়ি। আলমানযোর সঙ্গে খানিক ঘুরে বেড়িয়ে এখানে ফিরে আসবে না ও আর।

লরার সঙ্গে দেবার জন্য মস্ত একটা কেক তৈরি করল মা। হেসে বলল, 'বিয়ের অনুষ্ঠান নাই হলো, বিয়ের কেক খেতে অসুবিধে কী?'

সাপারের পর বাবাকে বেহালাটা এনে দিল লরা। 'বাবা, একটু বাজাও না!'

যত্নের সাথে সুর বাঁধল ওতে বাবা, ছড়টায় রজন ঘষে নিল, তারপর কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'কী সুর শুনবে, লরা?'

'প্রথমে মেরির পছন্দের গান,' বলল লরা, 'তারপর পুরনো সব সুর, একের পর এক, যতক্ষণ পার।'

দরজার চৌকাঠে বসল লরা, একটু ভেতরে বাবা-মা বসেছে প্রেয়ারির দিকে মুখ করে। 'হাইল্যান্ড মেরি' বাজাল বাবা প্রথমে। তারপর সূর্যটা ডুবে গেলে বাজাতে থাকল একের পর এক পুরনো দিনের গান, সেই ছোটবেলা থেকে যেগুলো শুনে আসছে লরা।

অস্তরাগ যখন কালচে হয়ে এল, একটা-দুটো করে তারা ফুটছে আকাশে, তখন মার গায়ে আলতো করে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ক্যারি আর গ্রেস।

উইসকনসিনের বিগ উড্সে থাকতে যে সুর শুনেছিল লরা, ক্যানসাসে ক্যাম্পফায়ারের ধারে বসে যে সুর শুনেছিল, ভার্ডিগ্রিস রিভারের ধারে যে সুর শুনেছিল, যে সুর শুনেছিল প্লাম ক্রীকের ধারে, সিলভার লেকের ধারে–সব আবার বাজিয়ে শোনাল বাবা।

সবশেষে মিষ্টি একটা প্রেমের গান গাইল বাবা বেহালার সঙ্গে, শুনে চোখে পানি চলে এল লরার।

পরদিন নিজহাতে ওকে সাজিয়ে দিল মা। গাল টিপে দিয়ে বলল, 'ভারি সুন্দর লাগছে তো!'

ক্যারি একটা লেস দেয়া রুমাল গুঁজে দিল ওর হাতে। 'তোমার জন্যে বানিয়েছি, লরা।'

গোল হয়ে গেছে গ্রেসের দুচোখ, হাঁ করে গিলছে সবার সব কথা।

আলমানযো আসতেই উঠে বসল লরা বাগিতে ওর পাশে। রওনা হয়ে গেল গাড়ি, দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল সবাই।

তৈরিই ছিলেন রেভারেন্ড ব্রাউন, ওরা পৌঁছতেই পড়িয়ে দিলেন বিয়ে। আইডা চুমু খেল লরাকে, হাতে গুঁজে দিল ছোট্ট একটা প্যাকেট।

শহর থেকে ঘুরে বাবার খামার-বাড়িতে ফিরে এল ওরা স্বামী-স্ত্রী। এখানে ওদের জন্য ডিনার তৈরি। খেতে বসেই বুঝে ফেলল লরা, চিরতরে বিদায় হয়ে যাচ্ছে ও এ-বাড়ি থেকে। মার এত যত্নের রান্না বিস্বাদ লাগল ওর মুখে, বিয়ের কেক মনে হলো কাঠের গুঁড়ো। খাওয়া শেষ হলেও টেবিল ছেড়ে উঠছে না কেউ, জানে, এরপরেই বিদায়ের পালা।

বাগিটা দরজার সামনে এনে রাখল আলমানযো। একসাথে অনেক স্মৃতি ভিড় করে এল লরার মনে। বনেটটা মাথায় পরে নিল ও। বিদায় নিল সবার কাছে।

গাড়িতে উঠতে সাহায্য করবে বলে এগোতে যাচ্ছিল আলমানযো, বাবা ধরল লরার হাত। বলল, 'এরপর থেকে তুমি নেবে সমস্ত ভার; এবারের মত আমাকে সাহায্য করতে দাও। এসো, আধ-বোতল!' গাড়িতে তুলে দিল বাবা লরাকে।

সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা বাস্কেট এগিয়ে দিল মা। 'তোমাদের সাপারের জন্যে সামান্য কিছু,' মার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। 'শীঘ্রি বেড়াতে এসো, লরা!'

চলে গেল লরা নিজের সংসারে।

## তারপর?

প্রথম চারটি বছর মহানন্দে কাটল লরার। বড় ছেলেটা মারা গেল, তারপর মেয়ে রোজ এল কোলে। কিন্তু প্রচণ্ড খরায় মাঠের ফসল নষ্ট হতে থাকল বছরের পর বছর। সাত বছরে ক্রমে ধার দেনায় ডুবে দুটো ক্লেইমই হারাল আলমানযো। এদিকে ডিপথেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে ও এখন।

দুর্ভাগ্য পিছু নিয়েছে ওদের। একদিন হঠাৎ করেই আগুন লেগে পুড়ে গেল

ওদের বাড়িটা।

অগত্যা শহরে এসে কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে যৎসামান্য পার্জন করে কায়-ক্লেশে দিন কাটাতে হলো ওদের কিছুদিন। বহুকষ্টে একশো ডল জমিয়ে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য রওনা হয়ে গেল ওরা সুদূর মিসৌরির পথে।

ওখানেই ম্যান্সফিল্ড শহরের কাছে জমি কিনে নিজ হাতে মনের ম ... বাড়ি বানাল আলমানযো, বিশ একরের আপেল-বাগান সহ চমৎকার একটা খামার গড়ে তুলল।

এতদিনে এসে গেল প্রাচুর্য। সুখে কাটতে থাকল ওদের দীর্ঘ জীবন। ওই বাড়িতেই ১৯৪৯ সালে বিরানব্বই বছর বয়সে আলমানযো, আর ১৯৫৭ সালে নব্বই বছর বয়সে মারা যান লরা ইঙ্গল্‌স্ ওয়াইল্ডার।

তোমরা কেউ যদি ম্যান্সফিল্ডে যাও, দেখবে এখনও দাঁড়িয়ে আছে ওদের ওই বাড়িটা। সেই বাড়িতে সযত্নে রাখা আছে বাবার সেই প্রিয় বেহালাটা, মেরি ... অর্গ্যান, লরার চমৎকার সেলাইয়ের বাক্স—আর, সম্ভবত, পুরনো কাপড় দিয়ে তৈরি লরার ছোটবেলার সেই আদরের পুতুল শার্লোটও।

***